শিক্ষার নূতন দিগন্ত

[ত্রৈবার্ষিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক-সংস্করণ]

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহরিসাধন গোস্বামী, এম. এ. (বাংলা), এম. এ.
(শিক্ষা), বি. টি., ডি. ফিল.
'শিক্ষা ও সমাজ', 'মনস্তত্ত্বের ভূমিকা', 'Naya Siksha', 'যুগের অভিব্যক্তি
ও শিক্ষা', 'মাধ্যমিক শিক্ষাব পুনর্গঠন', 'শিক্ষাসাধনায় পূর্বসূরী' প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণেতা

প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৩ নং কলেজ রো • কলিকাতা - ৯

প্রকাশক :
শ্রীসুশীলকুমার বসু
প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড
৩, কলেজ রো, কলিকাতা ৯

মূল্য : দশ টাকা মাত্র।

প্রথম খণ্ড :
মুদ্রাকর :
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ নাথ
বাসন্তী আর্ট প্রেস
৬।১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

দ্বিতীয় খণ্ড :
মুদ্রাকর :
শ্রীপিয়ারী রঞ্জন সাহ
দেশবাণী মুদ্রণিক
১৪ সি, ডি. এল. রায় ষ্ট্রিট, কলিকাতা-৬

লেখক পরিচিতি

সম্প্রতিকালে বাংলা দেশে শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডক্টর হরিসাধন গোস্বামী সুপরিচিত হয়েছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম শিক্ষাতত্ত্ব বিষয়ে মৌলিক গবেষণা ক'রে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল—'An Enquiry into the Fundamentals of Educational Philosophy in the East and the West'। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ডক্টর এল. এ. রীড্, পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর শ্রীইন্দ্রসেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক শ্রীকমলাকান্ত মুখার্জি তাঁর গবেষণার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ডক্টর গোস্বামী শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধাবলী সর্বভারতীয় পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং ভারত সরকারের প্রকাশিত পত্রিকাসমূহে তার রচনাবলীর সারমর্ম ও পরিশিষ্ট সংযোজিত হয়েছে।

তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টা, পরিশ্রম ও উদ্যোগের ফলে মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়াতে একটি ডিগ্রীকলেজ স্থাপিত হয়েছে, তা শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই জানেন। তাছাড়া, তিনি অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নানাভাবে সংযুক্ত।

ডক্টর গোস্বামীর প্রচেষ্টায় শিক্ষ-সাহিত্যিকরা কয়েকবার সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনে মিলিত হয়েছিলেন।

তিনি একজন জননেতা, সংগঠক, দার্শনিক-সাহিত্যিক, কবি, শিক্ষাবিদ্ ও সুবক্তা হিসেবে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন।

ভূমিকা

শিক্ষা ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার আগ্রহ সম্প্রতি তীব্রমাত্রায় প্রকাশিত হচ্ছে, এটা সুখের কথা। আমাদের দেশে জাতীয় সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ শিক্ষার সংস্কার সম্পর্কে নানাভাবে ওয়াকিবহাল হচ্ছেন। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা-সংগঠন পর্ব যে-ভাবে শুরু হয়েছে, তাতে আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন অধিকমাত্রায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীতে (Three-year Degree Course) শিক্ষাতত্ত্ব (Education) নামে যে পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করেছেন তার ফলে দেশের তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে আগ্রহ লক্ষণীয় ভাবে দেখা দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি (Teachers' Training Colleges) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার কার্য আরো সম্প্রসারিত ক'রে তুলছেন। স্নাতকোত্তর শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা (Post Graduate Teachers' Training), বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ (Teachers' Training in Basic Education), স্নাতক শিক্ষক-শিক্ষণ (Graduate Teachers' Training), প্রাক্-স্নাতক শিক্ষক-শিক্ষণ (Under-Graduate Teachers' Training) প্রভৃতির মাধ্যমে এবং নানাপ্রকার সেমিনার ও স্বল্পমেয়াদী শিক্ষণ পরিকল্পনার সহায়তায় সমগ্র দেশে শিক্ষক শিক্ষণের আয়োজন চলেছে। প্রয়োজন অনুপাতে এই ব্যবস্থাপনা স্বল্প হ'লেও ইতিমধ্যে শিক্ষা সম্পর্কে যে আন্দোলন দেশে গ'ড়ে উঠছে তা উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে প্রকাশ ক'রছে।

ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীতে শিক্ষাতত্ত্ব (Education) পাঠক্রম চালু হওয়ার ফলে তরুণ স্নাতকদের পক্ষে ভবিষ্যতে শিক্ষক হিসেবে পেশা গ্রহণের পূর্বপাঠ লাভে খুব সুবিধা হয়েছে। স্নাতকদের এক বিপুল অংশ ভবিষ্যতে শিক্ষক বৃত্তি অবলম্বন ক'রে থাকেন। তাঁরা পূর্বাহ্ণে বৃত্তিগত ধারণা (Pre-vocational bias) গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে। সুখের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে এই জাতীয় ব্যবস্থাপনা প্রথম গ্রহণ ক'রে সারা দেশের শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। আমরা আশা ক'রবো অদূর ভবিষ্যতে নিম্নবুনিয়াদী,

প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সুবিধার জন্যও সরকার, সংশ্লিষ্ট বোর্ড ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ উচ্চতর ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষা বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্যসূচী প্রবর্তন ক'রে আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজ করবেন। কলিকাতা ও অন্যান্য অনেক মফঃস্বল কলেজে ইতিমধ্যে ত্রৈবার্ষিক শ্রেণীতে শিক্ষা (Education) বিষয় খোলা হয়েছে। অন্যান্য কলেজগুলিও অচিরে শিক্ষা বিষয় খোলার ব্যবস্থা ক'রে দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ সহকারে কাজে এগিয়ে আসবেন, এ আশা পোষণ আমরা করতে পারি। যুগের সঙ্গে সমতা রেখে তাঁরাও অগ্রণী হ'য়ে উঠুন, এই কামনা করি।

"শিক্ষার নতুন দিগন্ত" একত্রে এবং পৃথক ভাবে প্রকাশিত হোলো। শিক্ষা-নীতি (Principles of Education), শিক্ষা মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) এবং আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা সমস্যা (Current Thoughts on Indian Education) একত্রে সন্নিবেশিত হোলো। আর দ্বিতীয় খণ্ডে পৃথকভাবে সংযোজিত হোলো আধুনিক ভারতীয় শিক্ষা সমস্যা। ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর প্রথম পর্বের (Part I) শিক্ষার্থীরা এবং বি. টি. (B. T.), বি এড. শিক্ষার্থীরা একত্র শিক্ষাসংক্রান্ত পাঠ্যসূচী সম্পর্কে প্রচুর আলোচনার সুযোগ এই গ্রন্থে পাবেন। ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীর দ্বিতীয় পর্বের (Part II) পাঠ্যসূচী অনুসরণ ক'রে দ্বিতীয় খণ্ড লেখা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষণ শিক্ষার্থীরা ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকারাও তাই এই গ্রন্থে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান পেয়ে কিছুটা উপকৃত হ'তে পারবেন ব'লে আমাদের ধারণা।

ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করবার সময় আমি অনুভব করেছি যে, শিক্ষানীতি ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে একত্র সমাবেশে একটি আলোচনামূলক গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই, নানা নূতন নূতন তত্ত্ব ও তথ্যের সমাবেশে দেশের ও বিদেশের শিক্ষাচিন্তাকে একত্র ক'রে এই গ্রন্থটি রচনার জন্য আমি প্রয়াসী হই। আমার স্নেহের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের অনুরোধে এই কার্যে ব্রতী হ'লে পর তাঁরাও আমাকে আমার বক্তৃতার সারলিপি সরবরাহ ক'রে, গ্রন্থখানি সম্পাদনে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। সেজন্য তাঁদের আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

শিক্ষানীতি, মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার ধারা সম্পর্কে এই দুই খণ্ডে যা আলোচনা করা হয়েছে, তা যতদূর সম্ভব প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য ভাষায় করবার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষানীতি ও শিক্ষাবিজ্ঞান বর্তমানে খুব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে। শিক্ষা সম্পর্কে চরম কথা ব'লবার দিন তাই এখনো আসেনি। এ সম্বন্ধে আলোচনা আজ এতই বহুবিস্তৃত যে, সবকিছুই সীমিত

পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। যে সমস্ত তত্ত্ব ও তথ্য সত্য হিসেবে গৃহীত এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, আমরা সেগুলি এই গ্রন্থদ্বয়ে ধারাবাহিক ভাবে যতদূর সম্ভব সংযত ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। আলোচনার ধারায় আমরা বহুল প্রচলিত শিক্ষানীতি ও শিক্ষাবিজ্ঞানের অনেক মূল্যবান আলোচনা গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভিন্ন মনীষীর মতবাদ ও উদ্ধৃতি non-technical ভাবে প্রয়োগ করা হ'য়েছে। যে সমস্ত সূত্র থেকে প্রাথমিক তত্ত্ব ও তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে, সেই সব সূত্রের জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী। এই গ্রন্থদ্বয়ে অনেক ক্ষেত্রে ইংরেজি উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে ইচ্ছাকৃত ভাবে। শিক্ষাতত্ত্ব একটি technical বিষয়। আলোচনার ধারা অব্যাহত রাখবার জন্য এবং মূল সূত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য এরূপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এর দ্বারা যে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইংরেজি উদ্ধৃতি ও ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পাঠ অনুধাবনের পক্ষে এবং উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্য করবে। ইংরেজি প্রতিশব্দ ও উদ্ধৃতি ব্যবহার শিক্ষার্থীরা কদাচ নিয়মেরও ব্যতিক্রম হয় না।

"শিক্ষার নূতন দিগন্ত" যদি শিক্ষার কোনো এক দিগন্ত উন্মোচনে সার্থক হয় এবং "বাংলা সাহিত্যের" একটি সাধারণ সংযোজন হিসেবে গণ্য হয়, তবে মনে করবো যে, সংকীর্ণ পাঠ্যসূচী নির্দিষ্ট পরিসর ছাড়াও এর সাহায্যে পাঠক-পাঠিকারা কিছুটা উপকৃত হতে পারবেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজস্ব মতামতও প্রকাশ করা হয়েছে, যা বিতর্কের বিষয় হলেও প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থখানি প্রকাশের জন্য যারা অপ্রত্যক্ষ ভাবে নানারূপ অনুপ্রেরণা দান ক'রে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীশচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (খড়্গপুর কলেজ), অধ্যাপক শ্রীতারাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীঅশোক কুমার ভূঞ্যা, অধ্যাপক শ্রীমহাবীর মাজী, অধ্যাপক শ্রীসত্যেন ষড়ঙ্গী, অধ্যাপক শ্রীভূপতিচরণ দত্ত (পাঁশকুড়া কলেজ), অধ্যাপক শ্রীসতীনাথ চক্রবর্তী (বিষড়া কলেজ), অধ্যাপিকা নীলিমা রায়চৌধুরী (সিটি কলেজ), অধ্যাপিকা লীনা রায় (শিক্ষায়তন কলেজ), অধ্যাপক শ্রীবজ্রত বসু (নন্দিগ্রাম কলেজ), অধ্যাপক শ্রীহরিরাখাল বিশ্বাস (গোবরডাঙ্গা বি. টি. কলেজ), অধ্যাপক শ্রীপরিমল বিশ্বাস (বেলুড় বি. টি. কলেজ), অধ্যাপক শ্রীঅমল মিত্র, অধ্যাপিকা শীলা দত্ত (এম. বি. বি. কলেজ, ত্রিপুরা), অধ্যাপিকা রেবা ঘোষ (সাউথ ক্যালকাটা উইমেন্স কলেজ), অধ্যাপিকা কৃষ্ণা দত্ত (হুগলী বি. টি. কলেজ), অধ্যাপিকা সবিতা চ্যাটার্জী (শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ) প্রভৃতির নাম স্মরণযোগ্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগের রীডার ও প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুত কে. কে. মুখার্জি মহোদয় শিক্ষাগুরু হিসেবে বিভিন্ন সময় শিক্ষামূলক সাহিত্য রচনার কাজে যে উপদেশ, অনুপ্রেরণা ও পরামর্শ দিয়েছেন তা শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশেষ ভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি অনুগ্রহ ক'রে গ্রন্থটির একটি প্রস্তাবনা লিখে দিয়ে গ্রন্থটির গৌরববৃদ্ধি করেছেন, সেজন্য আমি চিরঋণী। তাঁর উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ উৎসর্গ ক'রে আমি ধন্য ও কৃত-কৃতার্থ।

গ্রন্থটির প্রুফ সংশোধনে সাহায্য করেছেন শ্রীপঞ্চানন রায়। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। গ্রন্থটির মুদ্রণসজ্জা, বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক রীতি প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে শিল্পী শ্রীপ্রভাত কুমার কর্মকার অক্লান্ত ভাবে সাহায্য ক'রে আমাদের ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন। বাসন্তী আর্ট প্রেস ও দেশবাণী মুদ্রণিকার কর্তৃপক্ষকেও এই প্রসঙ্গে জানাই আমার অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

আমার স্নেহের ভ্রাতা শ্রীমান মুরলীমোহন গোস্বামী, বি. এ.-বি. টি. ও শ্রীমান কিশোরীরঞ্জন গোস্বামী, বি. এ. নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা ক'রে এই গ্রন্থ রচনার প্রচেষ্টায় সহায়তা করায় তাদের প্রতি আন্তরিক আশীর্বাদ জানাই।

পরিশেষে গ্রন্থটির প্রকাশনায় যে যত্ন, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেডের শ্রীসুশীলকুমার বসু, শ্রীফণীভূষণ বসু ও শ্রীঅধীরকুমার বসু, সেজন্য তাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। তাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থদ্বয় প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভব হোতো না।

মধুনিকেতন
পোঃ পাঁশকুড়া আর. এস.
মেদিনীপুর

শ্রীহরিসাধন গোস্বামী

উৎসর্গ

যাঁর পাদপীঠে অবস্থান ক'রে দীর্ঘদিন শিক্ষাতত্ত্বের পাঠ গ্রহণ করেছি,
সেই পরম শ্রদ্ধাস্পদ ছাত্রবৎসল ও হৃদয়বান শিক্ষাগুরু
শ্রীযুত কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীচরণে এই
গ্রন্থ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত নিবেদিত হোলো।

লেখক

প্রস্তাবনা

আমাদের প্রীতিভাজন ছাত্র শ্রীমান ডক্টর হরিসাধন গোস্বামী, এম. এ. (বাংলা), এম. এ. (শিক্ষাতত্ত্ব), বি. টি., ডি. ফিল. সম্প্রতিকালে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা ক'রে সুপরিচিত হ'য়েছেন। তাঁর লেখা 'শিক্ষার নূতন দিগন্ত' দু'খণ্ডে পৃথকভাবে এবং একত্রিতভাবে প্রকাশিত হ'চ্ছে দেখে পরম প্রীতিলাভ করেছি। গ্রন্থখানির নামকরণ অনবদ্য ও সুন্দর হ'য়েছে। অপূর্বভাবে সার্থক এই নামকরণের অন্তরালে তার মৌলিক স্বচ্ছ ও হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পাঠকবর্গের মনে গভীরভাবে স্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম। আলোচ্য গ্রন্থখানি শিক্ষাতত্ত্বের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী ও বুনিয়াদী শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থিসহ সাধারণ পাঠক-পাঠিকা ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের নিশ্চিত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হ'বে। শিক্ষার্থিগণের জন্য বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হ'লেও অধ্যাপক ডক্টর গোস্বামী এই গ্রন্থে প্রচুর ভাব ও ভাবনার সুযোগ রেখেছেন। শিক্ষার্থিগণ যে এই গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে নূতন নূতন চিন্তার খোরাক পেয়ে শিক্ষা সম্পর্কে এক নূতন দিক্-উন্মোচনে ও দৃষ্টিশক্তি অর্জনে সক্ষম হবেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অত্যাবশ্যক শিক্ষানীতির সর্বাধুনিক চিন্তাধারার যে পরিচয় এই গ্রন্থে তিনি মেলে ধ'রেছেন তা শিক্ষাজগতের এক সুদূরপ্রসারী দিগন্তকে উদ্ভাসিত ক'রেছে। আলোচনার ধারা যেভাবে সহজ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বিভিন্ন তথ্যাবলীর সমন্বয়ে প্রকাশিত হ'য়েছে, তা'তে ডক্টর গোস্বামীর এই অভিনব প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত না ক'রে পারি না।

'শিক্ষার নূতন দিগন্ত' গ্রন্থে ডক্টর গোস্বামী প্রথমপর্বে শিক্ষানীতি (Educational Principles) আলোচনা ক'রেছেন। শিক্ষার সংকীর্ণ ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, পাঠ্যসূচী ও সহ-পাঠ্যসূচী নির্ধারণের নীতি প্রভৃতি অত্যাবশ্যক দিকগুলি সমানভাবে সাধারণ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার উপযোগী ক'রে অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান (Educational Psycology) সংক্রান্ত বিভিন্ন সূত্রাবলী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। মনোবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিকগুলি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমত সহজ সরল ভাষায় ও সংযত পরিসরে পরিবেশিত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের

বেশ উপকারে লাগবে। তৃতীয় পর্বে ভারতের আধুনিক শিক্ষাসংক্রান্ত পরিস্থিতি (Current Thoughts on Indian Education) সংযোজিত হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় তিনি সর্বাধুনিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন। সংযত ভাষায় তথ্যের অপূর্ব পরিবেশনে কোনো জায়গায় অস্পষ্টতা নেই। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষভাগে সারমর্ম, প্রশ্নাবলী ও রেফারেন্স সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির আঙ্গিক সমুন্নত হয়েছে। 'শিক্ষার নূতন দিগন্ত' গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

কে. কে মুখার্জি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাতত্ত্বের
রীডার এবং টিচার্স ট্রেনিং বিভাগ ও
পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষ

প্রথম পর্ব

মনোবিজ্ঞান

(Psychology)

সময় অনেক ছবি আঁকে—তার মনে যে কল্পনা বেশি দেখা দেয়, বাস্তব থেকে উপাদান আহরণ ক'রে সে সেগুলির সুষ্ঠু অভিনয় ক'রে আপনার কল্পনা-বিলাসের চরিতার্থতা পেতে চায়। এ সময় সে মনে মনে আনন্দ পায়, ভয়ে জড়োসড়ো হয়, বীরত্ব দেখিয়ে আনন্দ পেতে চায়, স্নেহের জন্য লোভী বা কাঙাল হয়, কান্নার মধ্য দিয়ে অভীপ্সিত জিনিস পেতে চায় এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ভালবাসা পেতে চায়। এ স্তরে শিশুদের মধ্যে কোনো যৌন চেতনা থাকে কি না এ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিকরা অনুসন্ধান ক'রে দেখেছেন যে, এ সময় শিশুদের যৌন চেতনা আত্মমুখী। এ অবস্থাকে বলা হয় আত্মরতি বা Narcissism। এ সময় তার মনে আত্মরতি বা আত্মভালবাসার লক্ষণ পুরোমাত্রায় দেখা দেয়। মনস্তাত্ত্বিকরা একে বলেছেন autoerotic। জলে প্রতিবিম্ব দেখে মানুষ যেমন নিজের ছবিটিকে ভালোবেসে আঁকড়ে ধরতে চায়, তেমনি এ বয়সে শিশু তার আপন দেহকে ভালোবেসে তাই নিয়ে সুখে থাকতে চায়। শিশু নিজের দেহকে ভালোবাসতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মাতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মাতার প্রতি এই ভালোবাসার আকর্ষণকে মনস্তাত্ত্বিকরা বলে থাকেন Oedipus Complex। পিতার প্রতি বিমুখতা বা ঘৃণা অনেক সময় মায়ের প্রতি বিশেষ অনুরক্তির জন্য হয়। ফ্রয়েড এ কথা বলেছেন। বালকদের মধ্যে যেমন Oedipus Complex থাকে, বালিকাদের মধ্যে তেমনি থাকে Electra Complex। এ বোধ থেকে বালিকারা পিতার প্রতি অনুরক্ত হয়। ফ্রয়েডের এই তত্ত্বে অবশ্য সকলে আস্থা পোষণ করেন না।

শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ একভাবে একটানা গতিতে সব সময় হয় না। শিশুর শরীর ও মনের দ্রুত উন্নতি হয় প্রথম তিন বৎসর যাবৎ; তারপর সে উন্নতি কিছুকাল সংহত থাকে। আবার ছয় বৎসর থেকে তার মধ্যে বৃদ্ধির গতিবেগ দেখা যায়, এবং তারপর সেই গতিবেগ স্তব্ধ হ'য়ে মন্দীভূত হ'তে থাকে।

শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি থাকে মাত্র—তার কয়েকটি মূল প্রক্ষোভ—যেমন, কান্না, ভয়, ক্ষুধা ছাড়া অন্য কিছু থাকে না। সে ক্রমশ প্রত্যক্ষজ্ঞান আয়ত্ত করতে থাকে। বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করতে গিয়ে সে বাস্তবের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আরম্ভ করে এবং তার মধ্যে চিন্তাশক্তি ও ভাব জাগ্রত হ'তে থাকে। তারপর তার মধ্যে দেখা দেয় অনুকরণ-স্পৃহা। কল্পনাপ্রবণতা, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি মানসিক গুণগুলি তার ক্রমশ বিকশিত হয়। প্রথম জীবনে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয় নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিসরের মধ্যে। এ সময় শিশুর শিক্ষা ইন্দ্রিয়জ আবেদনকে কেন্দ্র ক'রেই হ'তে

পারে। শারীরিক শক্তির বিকাশ সাধনের জন্য শিশুকে এই বয়সে নানাপ্রকার অঙ্গ সঞ্চালন পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

(খ) বাল্যকাল (Late Childhood):

শৈশব অতিক্রম ক'রে যাওয়ার পরে শিশু যখন আর একধাপ এগিয়ে যায়, তখন তার চেতনা ও বোধশক্তির উন্মেষ হয়। সে ক্রমশ নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে শেখে। সঙ্গীদের মধ্যে মেলামেশা করে সে চায় আত্ম-সম্প্রসারণ। এই বোধ থেকে পরবর্তী কালে আত্মত্যাগের স্পৃহা জাগে। দলপ্রীতি এসময় এত বেশি দেখা যায় যে, দলের স্বার্থে সে অনেক সময় অন্যায় কার্যকেও বড়ো আদর্শ বলে মনে করে। বালকদের মন এই বয়সে বহির্মুখী হয় এবং এর ফলে তাদের মনে নানাপ্রকার কৌতূহল দেখা যায়। এই কৌতুকপ্রবণতা মন্দ জিনিস নয়। শিক্ষক ও অভিভাবকের কর্তব্য হবে শিশুর এই কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য তার মনের খোরাক যোগানো। শিক্ষার দিক দিয়ে এই স্তর অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় শিশুর মনে যে ভাব, নৈতিক ও সামাজিক অনুভূতি, অভ্যাস প্রভৃতি গড়ে ওঠে তার ফল খুব সুদূরপ্রসারী হয়। শিশুদের মনে এসময় অনেক প্রকার কল্পনা-প্রবণতা (make-believe) দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে এই সময় একদিকে আত্ম-সম্প্রসারণের প্রবণতা দেখা দেয়, আবার অন্যদিকে আত্ম-অপমানকে ভুলে যাওয়ার জন্য অবস্থা ও ঘটনা সৃষ্টির কাজে কল্পনাপ্রবণতাকে ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই স্তরে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা জন্মে। ফলে খেলাধূলা, সামাজিক মেলামেশার ব্যাপারে শিশু খুব সক্রিয় ও সচল হয়ে পড়ে, অনুকরণ করবার আশ্চর্য ক্ষমতা এই সময় দেখা দেয়। তাছাড়া, নিজের মন দিয়ে গড়া আশ্চর্য খুশির অভিনয় করতে সে ভালোবাসে। বুদ্ধিশক্তি, ইচ্ছাশক্তি, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি এই সময় প্রখর হয়। এই সময়ের শিক্ষা খেলাধূলার মধ্য দিয়ে হওয়া উচিত ব'লে মন্তেসরী, ফ্রোয়েবেল প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা বলেছেন।

বাল্যকালের বৈশিষ্ট্য

(গ) কৈশোরকাল (Adolescence):

কৈশোরকাল উপস্থিত হবার পূর্বে শিশুর শরীর ও মনের এক অপূর্ব পরিবর্তন হ'তে থাকে। এই সময় শরীর দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে, মানসিক গঠনেরও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই সময় চিত্রকল্পের প্রতি প্রবণতা দেখা দেয়, বিবেচনা শক্তি বেশ প্রবল হয়ে উঠে। কিশোরকাল উপস্থিত হবার পূর্বে শিশু খুব বেশি আত্মসচেতন হয়। বাহিরের জগতের সঙ্গে

কৈশোরের ধর্ম

সে মেলমেশা করে, যৌন প্রবৃত্তি, সামাজিক মেলামেশা প্রভৃতির দিকে সে মনোযোগী হয়। এই সময় শিশুর মন যেভাবে থাকে তাতে খেলাধূলা ও কাজের মধ্য দিয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া সমীচীন। এসময় তার মন যতদূর সম্ভব কলুষমুক্ত থাকে। কৈশোর দেখা দেওয়ার পূর্বেই শিশু অনেকটা আত্মসচেতন ও আত্মনির্ভর হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তার মধ্যে জগতের সঙ্গে নূতন করে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তখন তার মধ্যে আসে আর একটি স্তর-পরিবর্তন। কৈশোরকাল সকলের একই বয়সে দেখা দেবে এমন কোনো মানে নেই। এসময় বালকেরা শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। কিন্তু বালিকাদের শারীরিক গঠনের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। এসময় তারা খেলার সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসে এবং এজন্য নানাপ্রকার কল্পনাপ্রবণ খেলাধূলা ক'রে তারা আনন্দ পায়। ধীরে ধীরে তারা বিমূর্ত বিষয় সম্পর্কে সচেতন হয় এবং বিচারবুদ্ধি নিয়ে কাজ করতে শেখে। এই স্তর অতিক্রম কববার পর বালক-বালিকাদের মধ্যে আসে নূতন পরিবতন। এই পযায়কে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেছেন—বয়ঃসন্ধিকাল। আমরা এইবার এই বয়ঃসন্ধিকালের বিশেষত্ব আলোচনা করবো।

বয়ঃসন্ধি উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কিশোররা বাল্যাবস্থার অনেক অতীত স্মৃতি পুনবাবৃত্তি ক'রে আনন্দ পায়। এই সময় তাদের দেহে ও মনে আসে নূতন জোয়ার, নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনা। জীবনের স্বাদ অনুভব করবার জন্য এক অপূর্ব চঞ্চলতা দেখা দেয় এই বয়সে। স্টান্‌লি হল (Stanely Hall) এই পর্যায়কে "storm and stress" বা ঝটিকাক্ষুব্ধ সময় ব'লে বর্ণনা করেছেন। এসময় মানুষের জীবনে আসে দুর্নিবার জোয়ার—"a tide in the affairs of men", যার ফলে তারা যেন একটাকিছু নূতনের জন্য উন্মুখ হয়ে পড়ে অনিবার্য ভাবে। শরীর ও মনের যে অদ্ভুত পরিবর্তন ও বিকাশ এই পর্যায়ে হয়, তার ফলে তারা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা পেতে চায়। এসময় কারো কারো মনে সকলকিছু পুরাতন মূল্যকে অস্বীকার করবার প্রবণতা দেখা দেয়। এই স্তরটিকে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর বলা হয়।' এই স্তর বালক ও বালিকাদের ঠিক একই বয়সে আরম্ভ হবে এমন কথা নেই। সাধারণতঃ বালকদের মধ্যে ১৩।১৪ বৎসর বয়সে এবং বালিকাদের মধ্যে ১১।১২।১৩ বৎসর বয়সে দেখা দেয়। এই বয়সে তারা পৃথিবীকে নূতন করে জানতে উন্মুখ হয়। তাদের মধ্যে আসে দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা। শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে এবয়সে মাংসপেশী শক্তি অর্জন করে, বক্ষস্থল বিস্তৃত হয়, হৃদয় আরো শক্ত হয়। শরীরের ওজন, দেহের উচ্চতা ও গঠন প্রভৃতি অনেকখানি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

বয়ঃসন্ধির বৈশিষ্ট্য

হজমশক্তি এসময় অনেকখানি বেড়ে যায়। এসময় খাদ্যদ্রব্যের অভাব শারীরিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। যৌনপ্রেরণা এসময় অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে ওঠে, তার ফলে তারা বাহিরের জগতের অস্তিত্ব, সামাজিক নিয়ম প্রভৃতি সম্পর্কে খুব চঞ্চল হয়ে পড়ে। এসময় তাদের হর্মোন থেকে যে রস নির্গত হয় তার ফলে তাদের শরীর ও মনের মধ্যে নানাপ্রকার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়। কখনো কখনো গলার আওয়াজ চাপা হয়, কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে লাজুকে ধরনের মনোভাব হয়। এসময় প্রশ্রয় পেলে তার ফল খারাপ হয়—এমন কি অনেক সময় ব্যবহারজনিত নানা সমস্যা দেখা দেয়। এসময় নানাপ্রকারের মনোভাব ও ভাব (mood) দেখা দেয়। কখনো কখনো সেই ভাব তারা চেপে রাখতে চায়। এসময় 'পলায়নপ্রবৃত্তি' (escapism) দেখা দেয়। অনেক সময় অভিভাবককে না বলে তারা এখানে-ওখানে পালিয়ে যায়; কখনো কখনো খুব ছেলেমানুষি খেলাধূলায় তারা অভ্যস্ত হ'য়ে পড়ে। এই সময় তারা রোমাঞ্চকর, কল্পনাপ্রবণ হয় বলে উপন্যাস, রোমাঞ্চকর কাহিনী, ভূতের গল্প প্রভৃতির দিকে আকৃষ্ট হয় এবং এর দ্বারা তারা জগৎকে এক নূতনভাবে ব্যাখ্যা ক'রে তার পরিচয় পেতে চায়। এসময় তারা দিবাস্বপ্ন (day-dream) দেখে। বীরপূজার আদর্শ (Hero-worship) তারা গ্রহণ করে। অনেক সময় কোনো মহাপুরুষের জীবন অনুসরণে অভ্যস্ত হয়। কখনো কখনো সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গলাভের মনোভাব তাদের পেয়ে বসে। তাদের মধ্যে আত্মপ্রসারণ, আত্মসংকোচন, আত্মপ্রতারণা, আত্মাভিমান প্রভৃতি নানা-প্রকারের ভালমন্দ গুণের মিশ্র অনুভূতি (mixed feeling) প্রবল হয়ে উঠে। অনেক সময় অস্বাভাবিক প্রশ্নজাল তারা সৃষ্টি করে, নিজের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সকলকিছু ব্যাখ্যা করে এবং বিতর্ক করে জয়লাভ করার আশা পোষণ করে। আত্মবিশ্বাস এ বয়সে এত বেশি প্রকট হয় যে, সে যেন পৃথিবীকে জয় করে নিতে চায়। এসময় তারা সঙ্গপ্রিয় হয়। যৌন আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হওয়ার ফলে অপর পক্ষের দিকে তারা আকৃষ্ট হয়।

বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। এই স্তর সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্, অভিভাবক প্রভৃতি সকলেরই বিশেষ অবহিত হওয়া প্রয়োজন। বয়ঃসন্ধিকালের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যথার্থ সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে। এই স্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা যাতে অবদমিত না হয় সেজন্য বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। এদের মধ্যে যে প্রবল ভাবধারা জেগে উঠে তাকে সমাজ-সম্মত পথে উদ্‌গতিসাধন (sublimation) করে তোলা প্রয়োজন। এজন্য এসময় নীতি হওয়া উচিত—"Keep the adolescent

বয়ঃসন্ধিকালের শিক্ষা

busy ; never allow him to have nothing to do"। এদের মনকে কোন-না-কোন কাজের মধ্যে আটকে রাখা দরকার ; নতুবা এরা বিপথগামী হ'য়ে যেতে পারে। খুববেশি হুমকী, চোখরাঙানি ইত্যাদি এ স্তরের শিক্ষায় কার্যকরী হয় না। এ সময় শিক্ষার্থীকে দিতে হবে অফুরন্ত স্বাধীনতা, আনন্দ ও বিশ্রামমুখীন কাজ। এস্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আসে সংগঠনস্পৃহা, আত্মসম্প্রসারণ প্রবৃত্তি, সংগ্রহলিপ্সা প্রভৃতি গুণাবলী। শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এসব বৃত্তির অনুশীলনের ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার স্পৃহা জাগিয়ে তুলে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের অফুরন্ত শক্তি-সামর্থ্যকে দিতে হবে সমাজসম্মত গতি। চরিত্রের মূল কাঠামো এই স্তরে গড়ে ওঠে। তাই দেখতে হবে শিক্ষার্থীদের শরীর, মন ও আত্মার বিকাশ কিসে সুন্দরভাবে গড়ে উঠে। রুশো বলেছেন—"A young man's worst enemy is himself. Therefore watch carefully over the young man." কিন্তু দেখতে হবে এই পরিচালন-ব্যবস্থা যেন শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা ও আনন্দকে ব্যাহত না করে। এই স্তরের শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সুস্থ ও সামাজিক যৌনবিজ্ঞানের ধারণা এমনভাবে এনে দিতে হবে যাতে করে নিজেদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে সুন্দর ধারণা তাদের মনে স্থান পায়। অনেক সময় সহ-শিক্ষা সুস্থ ফলদান করে। এসময় মানুষের প্রাণে আসে নিজেকে পরার্থে নিয়োজিত করবার উদগ্র বাসনা। তাই, শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই স্তরে এক উচ্চ আদর্শের মান গড়ে তুলতে হবে। যে সব বিষয় সংস্কৃতিমূলক ও চিন্তাশক্তির উদ্বোধক, সেগুলি এই স্তরের শিক্ষার বিষয়সূচী হওয়া সমীচীন। শরীর, মন ও আত্মাকে সুসংগঠিত করে তোলার জন্য এসময় কাজের মধ্য দিয়ে নানাভাবে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যৎ সু-নাগরিক হওয়ার শিক্ষাও এসময় দিতে হবে। শিল্প, কলা, সাহিত্য, সৌন্দর্যমূলক অনুষ্ঠান, বীরপূজা, সহযোগিতামূলক কর্ম, ধর্মশিক্ষা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এস্তরের শিক্ষাকে অধিকতর আকর্ষণীয় ও ফলপ্রদ করে তোলাই হবে শিক্ষকের অতি অবশ্য কর্তব্য। এই স্তরের শিক্ষার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে তার প্রভাব শিক্ষার্থীর মনে চিরজীবন স্থায়ী হয়ে যায়। এজন্য বয়ঃসন্ধিকাল যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলাও তেমনি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তর অতিক্রম করেই মানুষ বয়স্ক অবস্থায় এক পরিণতি লাভ করে মাত্র।

সার সংক্ষেপ

শিশুর বিভিন্ন পর্যায়ের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ কেমন ভাবে গড়ে ওঠে এ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এজন্য আমরা মানুষের বিকাশকে কয়েকটি পর্যায় ভাগ করেছি;

যেমন—(১) শৈশবকাল, (২) বাল্যকাল, (৩) কিশোর কাল ও বয়ঃ সন্ধিকাল, (৪) বয়স্ক অবস্থা। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মানুষ বয়ঃসন্ধিকালের অবস্থার পরিণামে গড়ে ওঠে। আমরা আর্নেস্ট জোন্স, স্টানলি হল, রস প্রভৃতির স্তরভাগ আলোচনা করেছি এবং নিজেদের সুবিধা অনুসারে মানুষের জীবনকে বিভক্ত করে তার বিশেষত্ব দেখিয়েছি। কিন্তু, মানুষের বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থাপনা করতে হলেও সামগ্রিক শিক্ষার আদর্শ আমাদের মনে রাখতে হবে। আমরা দেখেছি বয়ঃসন্ধিকাল মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় মানুষের মধ্যে নানা প্রবৃত্তি, আশা, আনন্দ, ভাবপ্রবণতা, যৌনস্পৃহা প্রভৃতি প্রবলভাবে দেখা দেয়। এই সবের অনিবার্য আকর্ষণ থেকে বিরত করা সঠিক শিক্ষানীতি নয়। এসব মনোভাবকে সমাজসম্মত পথে উদ্গতিসাধন করে তোলাই হবে শিক্ষার প্রকৃত কাজ।

Questions

1. Discuss the different stages of human life and suggest the type of education needed for each stage.
2. What is adolescence? Discuss the characteristics of adolescence. What should be the nature of education at this stage?
3. 'Adolescence is a period of storm and stress'—Discuss the problems of adolescence.

References :

1. K. K. Mookerjee—New Education and its Aspects.
2. Raymont—Principles of Education.
3. Percy Nunn—Education : its Data and First Principles.
4. Ross—Groundwork of Educational Psychology.
5. রথীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—শিক্ষা
6. রথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—শিক্ষার মনস্তত্ত্ব

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

স্মৃতি

Memory

স্মৃতি কি ? (What is memory ?) :

মানুষের মনের একটা ক্ষমতা আছে—তাহোলো সংরক্ষণশীল ক্ষমতা। মানুষ এই ক্ষমতার বলে অভিজ্ঞতাকে মনে সঞ্চয় ক'রে রাখতে পারে। মানুষের জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই একেবারে নষ্ট হয়ে যায় না। অভিজ্ঞতার ফলকে আমরা যে মনে সঞ্চয় করে রাখতে পারি, একেই পার্সিনান (Percy Nunn) বলেছেন mneme বা নিমি। আমরা বাস্তব থেকে যে প্রভাব আহরণ করি, তা গ্রামোফনের মতো মস্তিষ্কের স্নায়-উপাদানে একটা দাগ এঁকে দেয়।

স্মৃতির মধ্য দিয়ে কি জাতীয় কার্য প্রকাশিত হয়

অভিজ্ঞতার ফল আমাদের মনের ভাণ্ডারে জমা হয়ে যায়। এমন কি কারো কারো মতে আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতির চিহ্ন মনের অবচেতন স্তরে রয়ে যায়। আমরা ঘটনার সম্বন্ধ অনুযায়ী সেই সব নির্জ্ঞান মানসিক ছাপ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি। যখন আমরা এই নির্জ্ঞান অভিজ্ঞতার ফলকে সজ্ঞান মনের পর্দায় এনে তার সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি ও সচেতন হতে পারি তখন তাকে স্মৃতি (memory) বলে। তাই স্মৃতির মধ্যে আমরা তিন জাতীয় কার্যের অস্তিত্ব দেখি ; যেমন—(১) কোনো অভিজ্ঞতা আহরণ, (২) অভিজ্ঞতার ফলকে মনের মধ্যে সঞ্চিত করে রাখা এবং (৩) সেই ফলকে চেতনার কেন্দ্রস্থলে আনয়ন করা। প্রকৃতপক্ষে আমাদের মনে যে জিনিসটি থেকে যায়—তা অভিজ্ঞতা নয়, অভিজ্ঞতার ফল। ইংরাজীতে একে বলা হয় engrams। তারা বিচ্ছিন্ন থাকে না, তারা একত্রে একটি engram-complex বা ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে। এই জাতীয় ভাব-মণ্ডল গঠনে আমরা দেখি যে, যে-সব ঘটনা পরপর সামীপ্য রেখে গড়ে উঠে তারা একটা ভাব-মণ্ডল গড়ে তোলে। তেমনি সাদৃশ্যমূলক ঘটনার ক্ষেত্রেও একটি ভাব-মণ্ডলী সৃষ্টি হয়। মানসিক ভাণ্ডারে যে সব অভিজ্ঞতার ফলগুলি জমা হয় এবং ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে তারা আমাদের মধ্যে একটি বিশেষ ধরনের মানসিক প্রবৃত্তি (disposition) গড়ে তোলে এবং তা আমাদের চিন্তাবৃত্তিকে প্রভাবান্বিত করে তোলে। আমাদের অভিজ্ঞতার ফলগুলি সর্বদা চেতনার স্তরে সঞ্চিত থাকে না। আমাদের নির্জ্ঞান মনে গচ্ছিত থেকে তা আমাদের চিন্তা ও ব্যবহারকে প্রভাবান্বিত করে তোলে।

স্মৃতির প্রকার (Kinds of Memory) :

স্মৃতিকে সাধারণত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—শাব্দিক স্মৃতি (rote memory) এবং যৌক্তিক স্মৃতি (rational memory)। যখন কোনো বিষয় পড়ে বা শুনে আক্ষরিক প্রতিশব্দ অনুযায়ী (verbatim) মনে রাখা যায় তখন তা শাব্দিক স্মৃতি (rote memory) হয়। এই আক্ষরিক স্মৃতিকে আমরা অর্থবোধক হিসেবে না-ও পেতে পারি। এই প্রকার মনে রাখার শক্তি সহজাত হোতে পারে কিংবা স্নায়ুঘটিত হোতে পারে। শাব্দিক স্মৃতির ক্ষমতাকে চেষ্টা করে কিছুতেই বাড়ানো যায় না। অল্পবয়সে এই শাব্দিক স্মৃতিশক্তি বেশি থাকে। ১৫।১৬ বৎসর পর্যন্ত এই শক্তি প্রবল থাকে কিন্তু তারপর তা হ্রাস পায়। পঁচিশ বৎসরের পর এই জাতীয় স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়ে যায়। তবে চর্চার ফলে অবশ্য এর ব্যতিক্রমও যে হয় না, তা নয়। অক্ষরসহ মনে না থাকলেও যখন ভাব মনে থাকে এবং তার অর্থবোধ মনে থাকে তখন তা যৌক্তিক স্মৃতি (rational memory) হয়। এই জাতীয় স্মৃতির ক্ষেত্রে ভাব বা ধারণা শুধু মনে থাকে। বার্গস (Bergson) অভ্যাস স্মৃতি (habit memory) এবং সত্যিকারের স্মৃতি (true memory) —এই দুই পর্যায়ে স্মৃতিশক্তির ভাগ করেছেন। অভ্যাস স্মৃতি তাঁর মতে যান্ত্রিক ধরনের হয়। শাব্দিক স্মৃতি ও অভ্যাস স্মৃতি একই জিনিস। সত্যিকারের স্মৃতি আমাদের মনের সত্যিকার প্রতিচ্ছবিকে প্রকাশ করে। এই স্মৃতির সঙ্গে যৌক্তিক স্মৃতির মিল আছে।

শাব্দিক স্মৃতি ও যৌক্তিক স্মৃতি

অভ্যাস ও স্মৃতি (Habit and Memory) :

যখন আমাদের মনের মধ্যে একই প্রকার প্রতিবেদনা বারংবার সৃষ্টি করা হয়, তখন তার ফলে পূর্বার্জিত কাজ সহজ হয়ে গিয়ে তা মনে রাখার পক্ষে সুবিধা হয়। আমাদের স্নায়ুপথে বারংবার একই প্রকার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার ফলে তা সম্ভব হয়। একে বলে অভ্যাস (habit)। অভ্যাসের সঙ্গে স্মৃতির একটা সম্পর্ক আছে। স্মৃতির ক্ষেত্রে মনে রাখার ব্যাপারটা যান্ত্রিক না হয়ে আত্মসচেতনমুখী হয়। এর মধ্যে আমরা কিভাবে অনুভব করি এবং প্রতিবেদনা করি সে সম্পর্কে একটা সজ্ঞান ভাব মনে থাকে। অনুষঙ্গ (association) মারফত আমাদের একটি অনুভূতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়। একটি অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতার সঙ্গে আর একটি অনুভূতিমূলক অভিজ্ঞতার এই গাঁটছড়া সম্পর্কের ফলে স্মৃতির কার্য ভালোভাবে

অভ্যাসের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্ক

অনুষঙ্গ হোলো একটা সূত্র বিশেষ। তা আমাদের মনে রাখার ক্ষেত্রে এবং পুনঃস্মরণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

অর্থবোধহীন শাব্দিক স্মৃতির দোষত্রুটি অনেক। তাই, এই জাতীয় অভ্যাস স্মৃতিকে অনেকে সমালোচনা করে থাকেন। মুখস্থবিদ্যা ছাড়া এ জাতীয় স্মৃতিতে যুক্তির কোনো স্থান না থাকায় জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে তা সহায়ক হয় না। এজাতীয় স্মৃতির ক্ষেত্রে অনেক সময় সাধারণ বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। আবৃত্তি করলেও অর্থ বোঝার কোন সুযোগ এতে থাকে না। শিশুদের ক্ষেত্রে শাব্দিক অভ্যাস-স্মৃতি প্রবল হয়। অর্থবোধহীন এই শাব্দিক স্মৃতি চর্চার নীতি শিক্ষাবিদেরা বর্জন করতে বলেন।

স্মৃতি সত্যিকারের কি জিনিস এ সম্পর্কে স্পীয়ারম্যানের সংজ্ঞা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন—"Cognitive events by occuring establish dispositions which facilitate their recurrence." আমরা পূর্বে বলেছি যে, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার একটা নিমিক (mnemic) ভিত্তি আছে। স্মৃতি এই নিমিক থেকে আরো সংকীর্ণ জিনিস। স্মৃতি হোলো পুরাতন অভিজ্ঞতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এক নূতন অভিজ্ঞতা। প্রত্যভিজ্ঞা (recognition) হোলো নিমির প্রথম প্রকাশ। একেই বল, হয় স্মৃতি। অর্থবোধহীন কোনোকিছু স্মরণ করা বা পুনঃস্মরণ করাকে বলে পুনঃস্মৃতি (recall)। একটা কবিতা অর্থপূর্ণ বলে তাকে প্রথমবার পাঠ করে মুখস্থ করা হোলো। তারপর মনে নেই। দ্বিতীয়বারে তা অস্পষ্টভাবে মনে আছে দেখা গেল। যখন সমস্ত কবিতা আবার স্মরণ করা হোলো, তখন আর বিশেষ কিছু কষ্ট হোলো না, স্বাভাবিক ভাবে তা পুনঃস্মরণ করা গেল। এই সব থেকে মনস্তাত্ত্বিকরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, স্মৃতি হোলো একটা জটিল মানসিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি আমাদের স্বভাবগঠনেও সাহায্য করে। সেই স্বভাবকে সাহায্য করে মনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় (retention) ও পুনঃস্মরণ (recall) এই দুইটি ক্ষমতা।

স্মৃতি হোলো পুরাতন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নূতন অভিজ্ঞতা

স্মৃতিশক্তি ও শিক্ষণশক্তি (Memory and Learning):

একটি বিষয় কয়েকবার পড়বার পর মনে রাখার ক্ষমতার নাম শিক্ষণশক্তি। কিন্তু কোন বিষয় পড়ে তা পুনরাবৃত্তি করার শক্তিকে বলে স্মৃতিশক্তি। শিক্ষাশক্তি ও স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, কম পড়ে পুনরাবৃত্তি করায় শাব্দিক স্মৃতির প্রাবল্য দেখা যায়। যৌক্তিক শিক্ষা যার প্রবল, সে কম পড়ে ভাব বর্ণনা করে যেতে পারে।

শিক্ষণ শক্তি ও স্মৃতিশক্তির পার্থক্য

শাব্দিক স্মৃতি যার প্রবল, সে কতকগুলি অর্থবোধহীন শব্দ কম বার আয়ত্ত ক'রে পুনবাবৃত্তি করতে পারে। বেশি সময় ব্যবধানে যে সম্যক মর্ম বর্ণনা করতে পারে ও গ্রহণ ক'বে বলতে পাবে তাব যৌক্তিক স্মৃতি প্রবল আছে বলতে হবে।

স্মৃতিশক্তি কি চর্চা করে বাড়ানো যায়? (Can memory-power be increased ?) :

জেমস্ (James) বলেছেন যে, স্মৃতিশক্তিব একটা সংবক্ষণ ক্ষমতা (Conservative power) আছে, তাকে কখনো বাড়ানো যায না। স্মৃতিব এই সংবক্ষণ ক্ষমতা নির্ভব কবে স্নাযুব উৎকর্ষ ও তাব উপাদানেব উপব। স্মৃতিব সংবক্ষণ ক্ষমতা তাই নির্ভব করে স্নাযুতন্ত্রেব বৈশিষ্ট্যেব উপব এবং এই ক্ষমতা প্রকৃতিদত্ত, তাই একে আয়ত্তেব মধ্যে আনা সম্ভব নয। প্রকৃতি এই সংবক্ষণ ক্ষমতা বেঁধে দেয বলে তাকে কোনোপ্রকাব চর্চাব দ্বাবা বাড়িযে তোলা যায না। জেমস এই ধবনেব যে মত পোষণ কবেছেন তাব দ্বারা বোঝা যায় যে, স্মৃতিকে কোনক্রমে বাড়ানো যায না। কিন্তু সত্যই কি স্মৃতিশক্তিকে বাড়ানো যায না? ম্যাকডুগাল, স্মিথ প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকবা স্মৃতি-শক্তিকে চর্চাব সাহায্যে বাড়ানো যায় বলে দেখিয়েছেন। এঁবা স্মৃতিশক্তিকে বাড়ানোব জন্য যেসমস্ত পবোক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ কবতে বলেন তা হোলো:

চর্চাব সাহায্যে এবং আবো কতকগুলি কৌশলেব সাহায্যে স্মৃতিশক্তিকে বাড়ানো যায

(১) একটি ঘটনাব সঙ্গে আব একটি ঘটনাব অনুষঙ্গ (association) স্থাপনেব মধ্য দিয়ে স্মৃতিশক্তি বাড়ানো যায।

(২) মনে বাখাব জিনিসকে যদি ঐক্যীভূত কবে তোলা যায এবং শ্রেণীবিভাগ কবে এক একটি পৃথক পৃথক উপাদানে ভাগ কবে সেগুলিব মধ্যে ভাবসংহতি গড়ে তোলা যায় তবে মনে বাখাব সুবিধা হয।

(৩) শাব্দিক স্মৃতিব ক্ষেত্রে অর্থবোধ থাকে না ব'লে সেই প্রকাব স্মৃতি কোনো কাজেব নয। যে সব অতীত বিষয়ের ভাব অর্থবোধক হয় সেগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ (association) গঠন কবলে মনে বাখার সুবিধা হয়।

(৪) কোনো জিনিস যদি অর্থবোধক না হয়, তবে তার মধ্যে যদি গতি ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেওয়া হয় তবে তা মনে রাখার পক্ষে সুবিধা হয়।

(৫) শিখবার আগ্রহ বা প্রবণতা যদি খুব তীব্র হয় তবে তা মনে রাখার পক্ষে স্থায়ী ফলদান করে। এজন্য যে-কোনো বিষয় শিক্ষা করতে হলে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীর বিশেষ আগ্রহ ও আন্তরিকতার পরিচয় থাকা চাই।

(৬) প্রতিরূপ (image) মনের মধ্যে যতবেশি গড়ে উঠ্‌তে পারে এবং তা যতই স্পষ্ট হয় ততই স্মৃতিচর্চা সার্থক হয়।

(৭) শিক্ষণকার্যের মধ্যে যদি কিছু কিছু বিরতি হয় তবে স্মৃতির কার্যের মধ্যে ভাবের ঘনতা বৃদ্ধি পায়। একে বলে consolidation।

(৮) মধ্যে মধ্যে অধীত বিষয়ের চর্চা প্রয়োজন—তাহলে মনের মধ্যে অভ্যাসের বন্ধন আরো দৃঢ় হয়ে গিয়ে তা স্মৃতির কার্যকে সফল করে তুলবে।

এবিনঘস্‌ ও লুব পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, যে বিষয় দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করা গেছে তা স্মরণে অসুবিধা হয় না। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রচেষ্টায় প্রয়োজন অধিকতর আগ্রহের ও জোরের। এবিনঘস্‌ এই প্রসঙ্গে যে পরীক্ষা করেছেন তা হোলো: প্রথমত তিনি ১২, ২৪, ৩৬টি অর্থহীন শব্দ ও বায়রনের "ডন জোয়ানের" অনুচ্ছেদ শিক্ষা করতে দিলেন শিক্ষার্থীদের। পরবর্তী ছয়দিন ক্রমাগত সমান সময় ধরে সেগুলি আয়ত্ত করতে দেওয়া হোলো। তারপর তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রত্যেক সময়ে কতবার প্রচেষ্টা লেগেছে সঠিকভাবে মনে রাখতে এবং প্রথম যে সময় লেগেছিল তার চেয়ে কত সময়ের পার্থক্য হয়েছে।

	দিন					
	১	২	৩	৪	৫	৬
১২ কতবার আবৃত্তি লেগেছে ……… প্রথম দিনের চেয়ে কতভাগ প্রচেষ্টা বাঁচলো …..	১৬·৫	১১ ৩৩	৭৫ ৫৫	৫ ৭০	৩ ৮২	২·৫ ৮৫
২৪ কতবার আবৃত্তি লেগেছে ……. প্রথমদিনের চেয়ে কতভাগ প্রচেষ্টা বাঁচলো	৪৪	২২·৫ ৪৯	১২·৫ ৭২	৭·৫ ৮৩	৪·৫ ৯০	৩·৫ ৯২
৩৬ কতবার আবৃত্তি লেগেছে …… প্রথম দিনের চেয়ে কতভাগ প্রচেষ্টা বাঁচলো	৫৫	২৩ ৫৮	১১ ৮০	৭·৫ ৮৬	৪·৫ ৯২	৩·৫ ৯৪
১ অনুচ্ছেদ ডন জোয়ান পাঠ কতবার আবৃত্তি লেগেছে ……. প্রথম দিনের চেয়ে কতভাগ প্রচেষ্টা বাঁচলো	৭·৭৫	৩·৭৫ ৫২	১·৭৫ ৭৭	·৫ ৯৪	০ ১০০	০ ১০০

এবিনঘসের পরীক্ষা ও ফলাফল

পরীক্ষার ফলাফল

প্রত্যেক পর্যায়ে কত শব্দ ছিল তার সংখ্যা

পরবর্তী দিনে কতবার আবৃত্তি করা দরকার হয়েছে; তার শতকরা হিসাবে মাপ করে দেখা হোলো প্রথম দিনের প্রচেষ্টার সঙ্গে কত পার্থক্য।

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যতই দিন যাচ্ছে ততই বারংবার আবৃত্তির

প্রচেষ্টা কমে যাচ্ছে এবং মনে রাখা দ্রুত হচ্ছে। যতই চর্চা বাড়ছে ততই দেখা যাচ্ছে বেশী মনে রাখা যাচ্ছে। যতই সময় যাচ্ছে এবং প্রচেষ্টার চর্চা হচ্ছে ততই দ্রুত মনে রাখা যাচ্ছে। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এবিনঘস্ আরেকটি জিনিস লক্ষ্য করেছেন তা হোলো এই যে, distributed learning এবং concentrated learning এর মধ্যে distributed learning এর সুবিধা বেশি। তিনি দেখিয়েছেন যে, একটা জিনিস আয়ত্ত করতে যে জায়গায় ৬৮ বার প্রচেষ্টা লেগেছে, তা তার পরের দিন পুনঃস্মরণের প্রচেষ্টায় মাত্র ৭ বার চর্চা করে মনে রাখা গেছে। প্রচেষ্টা যতই বিস্তৃত হবে সময় ততই সংকুচিত হয়ে যাবে মনে রাখার ক্ষেত্রে।

শিক্ষণের মধ্য দিয়ে সংযোগ (Association in Learning Process):

শিক্ষণের মধ্য দিয়ে কি ধরনের সংযোগ লাভ হয় এ সম্পর্কে এবিনঘস্ অনুসন্ধান করে দেখেছেন। অভিনিবেশ ও অনুরাগ যে ক্ষেত্রে বেশি জাগে সে ক্ষেত্রে সংযোগসাধন বেশি হয় বলে মনে রাখার সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে এবিনঘসের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন—"As a result of the repetition of the syllable series, certain associations are established between each member and all those that follow it. These connections are revealed by the fact that the syllable pairs so bound together are recalled to mind more easily and with the overcramming of less friction than similar pairs which have not been previously united." যতই কোনো জিনিস মনে রাখার জন্য বারংবার আয়ত্ত করা যায়, ততই সংযোগ স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়ে ওঠে।

বারংবার চর্চায় সংযোগসাধন হয়

স্মরণ রাখার কয়েকটি কৌশল (Laws of Remembering):

আমরা পূর্বে স্মৃতিশক্তিকে বাড়িয়ে তোলার জন্য কয়েকটি উপায় আলোচনা করেছি। নিম্নে আমরা স্মরণ রাখার আরো কয়েকটি কৌশল ও প্রণালী সম্পর্কে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করা হবে, সেই বিষয়ে আলোচনা করবো।

(১) যে বিষয় মনে যতো বেশি প্রবল প্রভাব বিস্তার করতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মনের উপর প্রভাব কার্যকরী হোলে অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়। এজন্য দেশভ্রমণ, প্রত্যক্ষভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা প্রভৃতি আমাদের দীর্ঘদিন মনে থাকে।

(২) যে বিষয়ে আমরা যতো স্পষ্টভাবে গ্রহণ করতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের ততো বেশি মনে থাকে। এজন্য মন যখন সক্রিয় ও সতেজ থাকে তখন অল্প আয়াসে শিক্ষালাভ করা যায়। শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তির সময় কোনো বিষয় জানবার চেষ্টা করলে তা মনকে খুব বেশি স্পর্শ করে না। কিন্তু যদি বিশ্রামকালে কোন জিনিস শিক্ষা করা যায়, তা মনের মধ্যে দীর্ঘ সংযোগসূত্র স্থাপন করতে পারে।

(৩) যে বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আহরণ হয় তা যদি আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হয়, তবে তার রেখা মনে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

(৪) যে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ খুব গভীর হয়, সে বিষয় আমরা দীর্ঘদিন মনে রাখতে পারি।

(৫) আমরা সাধারণত বেদনাদায়ক জিনিস ভুলে যেতে চাই। আনন্দপূর্ণ কোনো অভিজ্ঞতা মনে স্থায়িভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যে বিষয়ে আমাদের অনুরাগ ও ঝোঁক বেশি হয়, সেই বিষয় আমাদের মনে থাকে বেশি করে।

(৬) যে বিষয় বা বিষয়াবলীর অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করে, তা কোনো-না-কোনো অনুষঙ্গ সূত্র ধরে আমাদের স্মরণে এসে যায়। এজন্য বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন হয়।

(৭) বারংবার আবৃত্তি করলে তা অভ্যাসের আকারে দানা বেঁধে ওঠে।

(৮) যে বিষয় আবৃত্তি বা অভিনয় করে অর্জন করা হয়, তা চমকপ্রদ হয় এবং তা চমকপ্রদ হয় বলে তার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৯) যে জিনিস আমরা কল্পনার সাহায্যে শিক্ষা করি তা খুব ফলপ্রদ হয়। এতে শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে আসে নূতনত্ব, গতিবেগ ও ছন্দ-বৈচিত্র্য।

(১০) ওয়াটসন্ দেখিয়েছেন যে, শিক্ষণীয় বিষয় যদি আমরা ভাষার মাধ্যমে বর্ণনা করি বা লিখি, তবে তা মনে রাখার পক্ষে ভালো হয়।

(১১) আধুনিক শিক্ষানীতিতে কর্মমূলক শিক্ষার কথা বলা হয়। যে শিক্ষা কর্মের মধ্য দিয়ে হাতে-নাতে অর্জিত হয়, তা প্রচুর বাস্তব অভিজ্ঞতা এনে দেয় বলে এজাতীয় শিক্ষা আমাদের দীর্ঘদিন মনে থাকে।

(১২) যে বিষয় বা অভিজ্ঞতা আমরা ভাবার্থ করে বা বিচার-বিবেচনা করে মনে রাখার চেষ্টা করি, তা যৌক্তিক স্মৃতির আকারে দীর্ঘদিন মনে স্থায়ী হয়।

(১৩) অর্থবোধ না থাকলে কোন জিনিস মনে থাকে না বেশিদিন। তাই শিক্ষণীয় বিষয় যতদূর সম্ভব অর্থবোধ-গ্রাহ্য হওয়া সমীচীন।

(১৪) ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের-পক্ষে সরব পঠন খুব কার্যকরী হয়। একটু বয়স্ক বা উচুমানের শিক্ষার্থীদের পক্ষে নীরব-পাঠ খুব সাহায্যকারী হয়।

(১৫) মনে রাখার সুবিধার জন্য অধীত বিষয়কে বিভিন্ন অংশে ভাগ না ক'রে সামগ্রিকভাবে শিক্ষা করলে তা স্পষ্ট মনে থাকে। এ রকম ক্ষেত্রে সময় ও প্রচেষ্টা অনেক কম লাগে। যখন কোন দীর্ঘ বিষয় অধ্যয়ন করা হয়, তখন তাকে বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ না ক'রে সামগ্রিক ভাবে অধ্যয়ন করলে মনে রাখার সুবিধা হয়। Part learning-এর চেয়ে whole learning আমাদের মনের উপর এক সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি এঁকে দিতে সাহায্য করে। অর্থহীন শব্দাবলী, কবিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে whole learning খুব সার্থক হয়। Part learning-এ বিভিন্ন শিক্ষণীয় অংশকে কৃত্রিমভাবে জোড়াতালি দিতে হয়। কিন্তু whole learning এ একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা নিয়ে মনে রাখা যায়। অনেক সময় অধীত বিষয় খুব জটিল ও দীর্ঘ হলে whole learning ও part learning-এর মিলিত প্রয়োগ সার্থক হয়।

(১৬) যখন আমরা অনেক বিষয় বা কোনো এক বিষয় ঠাসাঠাসি করে মনে রাখি, তখন তা massed learning হয়, কিন্তু যখন কোনো কিছু অধ্যয়ন ক'রে বিশ্রাম লই এবং সময়ের ব্যবধান ঘটিয়ে আবার অধ্যয়ন ক'রে মনে রাখার চেষ্টা করি, তখন তা হয় distributed learning। এই শেষোক্ত ধরনের শিক্ষায় শরীর ও মন সতেজ ও অটুট থাকে বলে আমাদের মনে একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ১৫০০ শব্দ সম্বলিত একটি গদ্য-পাঠে একদিনের মধ্যে বিচ্ছিন্ন সময়ে চারবার অধ্যয়নে যা মনে রয়েছে, পরপর চারবার অধ্যয়নে তা মনে থাকে না। সেজন্য মনস্তাত্ত্বিকেরা distributed learning-এর কতকগুলি সুবিধা দেখিয়ে থাকেন; যেমন—(১) যখন শিক্ষণীয় সময় অপেক্ষাকৃত কম হয়, তখন ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। (২) বারংবার পর্যালোচনায় বেশ সতেজভাবে মনে থাকে এবং তাতে স্মৃতিশক্তির চর্চা হয়। (৩) যখন সময় খুব ছড়িয়ে ভাগ করে ব্যবহার করা হয়, তখন একঘেঁয়েমি আসে না, ফলে মন ক্লান্ত হয় না, মনে রাখার সুবিধা হয়।

(১৭) যে শিক্ষণীয় বিষয় কল্পনার সাহায্যে, অনুকৃতি-অভিনয়ের সাহায্যে আয়ত্ত করা হয় অর্থাৎ সক্রিয় পদ্ধতিতে শিক্ষা (active learning), করা হয়, তা আমাদের বেশি সময় মনে থাকে। এজন্য "will to learn" বা শিক্ষা করবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলার জন্য নানাপ্রকার চমকপ্রদ উপায় গ্রহণ করা প্রয়োজন হয়।

হয়। গেট্‌স্ এই জাতীয় পরীক্ষায় যে ফল পেয়েছিলেন তা ছকের সাহায্যে দেখানো হোলো।

এক্ষেত্রে Active learning-এর প্রয়োগ হওয়ায় পুনঃস্মরণে (recall) খুব সহায়ক হয়েছে দেখা যাচ্ছে।

	অর্থহীন শব্দাবলী শতকরা হিসেবে কত মনে রয়েছে		১৭০ শব্দ-সম্বলিত পাঁচটি ছোটো জীবনী শতকরা হিসেবে কত মনে রয়েছে	
	সঙ্গে সঙ্গে	চার ঘণ্টা ব্যবধানে	সঙ্গে সঙ্গে	চার ঘণ্টা ব্যবধানে
পড়বার জন্য সময় দেওয়া হয়েছে	৩৫	১৫	৩৫	১৬
$\frac{১}{৫}$ সময় আবৃত্তিতে দেওয়ায়	৫০	২৬	৩৭	১৯
$\frac{২}{৫}$ সময় আবৃত্তিতে দেওয়ায়	৫৪	২৮	৪১	২৫
$\frac{৩}{৫}$ সময় আবৃত্তিতে দেওয়ায়	৫৭	৩৭	৪২	২৬
$\frac{৪}{৫}$ সময় আবৃত্তিতে দেওয়ায়	৭৪	৪৮	৪২	২৬

গেটস্-এর পরীক্ষার ফলাফল

৫(৮) যখন শিক্ষণীয় বিষয় অতিরিক্ত আয়ত্ত করা হয় বা Over-learning হয়, তখন তা আমাদের স্মরণ রাখার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তোলে। সময় যতই চলে যায় ততই আমরা ভুলতে বসি বলে মধ্যে মধ্যে অতীত বিষয়ের চর্চা প্রয়োজন হয়। এই অতিরিক্ত শিক্ষাকে এবিনঘস্ বলেছেন—"Any learning over and above that necessary to obtain one correct reproduction constituted over-learning". স্মরণ-ক্ষমতা নির্ভর করছে এই অতিরিক্ত শিক্ষা আয়ত্ত করার উপর এবং বিষয়ের পরিমাণের উপর। এই প্রসঙ্গে র‍্যাডোস্সাভ্লেভিচ্ যে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তাতে দেখা গেছে যে, কিছু

	প্রথম শিক্ষায় কতবার পড়তে হয়েছে	দ্বিতীয় শিক্ষায় কতবার পড়তে হয়েছে	ফলাফল
বয়স্ক	২০	৬	৭০%
শিশু	৪২	৭	৮৩%

র‍্যাডোস্সাভ্লেভিচ্-এর পরীক্ষাপদ্ধতি ও ফলাফল

জিনিস প্রথম শিক্ষা করবার সময় যে প্রচেষ্টা লেগেছে, চব্বিশ ঘণ্টা পরে তা অল্প সময়ে কম পাঠ করেও মনে রাখা গেছে। উপরে সেই পরীক্ষাটির ফলাফলের তালিকা দেওয়া হোলো।

স্মৃতির পরিমাপ (Measurement of Memory) :

আমাদের অভিজ্ঞতার ফল যখন মনের মধ্যে গাঁথা হ'য়ে যায়, তখন আমরা তাকে বলি fixation। পুনঃস্মরণ (recall) সম্ভব হয় শারীরবৃত্ত কারণে, ভাষার মাধ্যমে, মস্তিষ্কের চিহ্ন অনুসারে, নিউরোগ্রাফস্ অনুসারে। এবিনঘস্ স্মৃতির পাঁচটি সমস্যা পরিমাপ করে দেখেছেন —

(১) যে উপাদানের পরিমাণ মুখস্থ করা হবে, তার সঙ্গে সময় ও প্রচেষ্টার সম্পর্ক আছে কিনা ?

(২) যে উপাদানের পরিমাণ মুখস্থ করা হবে তার সঙ্গে সংরক্ষণের সম্পর্ক কতটুকু ?

(৩) ভুলে যাওয়ার (forgetting) সঙ্গে শিক্ষাকাল ও পুনঃস্মরণের সম্বন্ধ কি ?

(৪) বারংবার শিক্ষা ও পুনরাবৃত্তি এবং পর্যালোচনার সঙ্গে একজনের সংরক্ষণের ক্ষমতার সম্বন্ধ কতটুকু ?

(৫) শিক্ষার মধ্য দিয়ে কী ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয় ?

এই পাঁচটি সমস্যা অনুসন্ধান করে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এবিনঘস্ যে ফলাফল পেয়েছেন তা নিম্নে প্রদর্শিত হলো।

শিক্ষণীয় বিষয়	সময় ব্যবধান	শতকরা হিসাবে মনে রাখার পরিমাণ
	২০ মিঃ	৫৮%
	১ ঘণ্টা	৪৪%
	৯ ঘণ্টা	৩৬%
	১ দিন পরে	৩৪%
	২ দিন পরে	২৮%
	৬ দিন পরে	২৫%
	১ মাস পরে	২১%

এবিনঘসের পরীক্ষার ফলাফল

(১) সময় ও প্রচেষ্টা যত বাড়বে, সংযোগ ততবেশি জোরালো হবে।

(২) মনে সঞ্চিত করে রাখা (retention) নির্ভর করছে অতিরিক্ত শিক্ষা (overlearning) এবং পরিমাণগত বিষয়ের উপর।

(৩) ভালোভাবে যখন কিছু মুখস্থ হয়ে যায়, তখন বেশি মনে থাকে।

(৪) বারংবার শিক্ষার মধ্য দিয়ে সংযোগসূত্র বা অনুষঙ্গ (association) দৃঢ় হয়ে যায়।

গড়ে উঠে। ব্যক্তি আবার স্বয়ংচালিত হ'য়ে তার ব্যক্তিত্বের মোড় ফিরিয়ে নিতে পারে। একে বলা হয় functional autonomy। মনঃসমীক্ষণপন্থীরা দেখিয়েছেন যে, আমাদের মনের কাঠামোর মধ্যে তিনটি স্তর রয়েছে—Id (আদিম কাম), Ego (অহং), Super Ego (সামাজিক বুদ্ধি)। কিভাবে আমরা আমাদের Ego বা অহংকে সামাজিক বুদ্ধি বা Super-Ego এর আকর্ষণে সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল্যবোধের দিকে নিয়ে গিয়ে সামাজিক সম্পদ (Social heritage) আহরণ করতে পারি, তাই হবে শিক্ষার আসল কাজ। ব্যবহারবাদীরা দেখেছিলেন উদ্দীপন:-প্রতিবেদনার (stimulus-response) মধ্যে আমাদের যান্ত্রিক ব্যবহারের পরিচয়। লিউইন (Lewin) ক্রমবিকাশের নীতিতে বিশ্বাসী। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব ক্রমশ অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি নিম্নলিখিত চিত্রের সাহায্যে ব্যক্তিত্ব সংগঠনের পরিণতি বুঝিয়েছেন—

ব্যক্তিত্ব ক্রমবিকাশমান

পরিণত বয়সে ব্যক্তিত্ব আরো জটিল হতে থাকে এবং শেষে বয়স্ক অবস্থায় তা পরিণতি লাভ করে। তখন ব্যক্তিত্বের কাঠামো আর পরিবর্তিত হয় না। সেজন্য আমরা দেখি যে, বয়স্ক ব্যক্তির হাব-ভাব, চালচলন, আচার ব্যবহার সকল কিছুই একটা নির্দিষ্ট কাঠামোর রূপ নিয়েছে—যা আর পরিবর্তিত হয় না। ব্যক্তিত্বের দেহগত গঠন সম্পর্কে মনস্তাত্বিকরা বলেন যে, রসক্ষরা গ্রন্থির প্রভাবের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে, যেমন Thyroid ক্ষরণের ফলে মানুষের ব্যক্তিত্ব এক বিশেষ আকার নেয়। ক্ষরণ যদি অল্প হয় তাহলে বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং মানুষ ভুলোমন হয়। Pituitary ক্ষরণ বেশি হলে মানুষের মধ্যে পুরুষসুলভ গুণ নষ্ট হয়ে যায়, এবং স্থূলকায় হয়। আকৃতির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন কয়েকজন মনস্তাত্বিক, যেমন—ল্যাভেটার, ক্রেটস্মার,

ব্যক্তিত্ব সংগঠনের ক্রম পরিণতি

ব্যক্তিত্ব গঠনে দৈহিক প্রভাব

সেলডন। এঁরা দেখিয়েছেন যে, আকৃতি অনুযায়ী মানুষের মেজাজ গড়ে উঠে। সেলডন চার হাজার কলেজের ছাত্রের ফটো নিয়ে এবং তাদের দৈহিক গঠনের সাদৃশ্য মিলিয়ে দেখেছেন যে, আকৃতি অনুসারে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ধরনের হয়। এজন্য তিনি কয়েকটি বিভাগ গড়ে তুলেছেন ; যেমন—

(১) Endromorphic—এজাতীয় ছাত্ররা খুব লোভী, স্নেহপ্রবণ, হাসি-খুসি মেজাজের, আহ্লাদপ্রিয়, স্থূলকায়, উদরপ্রধান হয়।

(২) Vicerotonic—এই পর্যায়ের ছাত্ররা খুব জনবৎসল স্বভাবের হয়।

(৩) Mesomorphic—এই পর্যায়ের ছাত্রদের দৈহিক গঠনে দেখা যায় হাড়চওড়া। এরা শক্তিধর খেলোয়াড় হয় এবং এদের মেজাজ উগ্রস্বভাবের হয়।

(৪) Somatotonic—এই পর্যায়ের ছাত্ররা উচ্চাভিলাষী ও বেপরোয়া ধরনের হয়।

(৫) Ectomorphic—এই পর্যায়ের ছাত্ররা রোগা, বুক পিঠ পাতলা ধরনের হয়।

(৬) Carebrotonic—এই পর্যায়ের ছাত্ররা ভীরু, আত্মকেন্দ্রিক ও মৃদুভাষী হয়।

স্নায়বিক গঠনের উপর ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য নির্ভর করে। ব্যক্তিত্ব নির্ধারণে আমরা আরো দেখি যে, গৃহগত ও পরিবারগত পরিবেশ খুব কার্যকরী হয়। পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তিত্বের কাঠামো অনেকখানি নির্ধারিত হয়। বল্ডুইন, কালহোর্ণ, ক্রুস প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক-গণ ১২৫টি পরিবার পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণত নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়, যেমন—(১) পরিবারের মধ্যে গণতান্ত্রিক সুর বা অভিভাবকের কর্তৃত্ব এই দুইটির মধ্যে যার প্রভাব বেশি হয় সেই অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির মন মেজাজ গড়ে উঠে। (২) অনেক পরিবারে স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা খুব বেশি প্রবল হয়ে উঠে আবার কোন কোন পরিবারে অত্যন্ত রূঢ় আবহাওয়া থাকে। এর ফলে ব্যক্তির মনমেজাজ বিভিন্ন ধারায় গড়ে উঠে। (৩) কোনো কোনো পরিবারের নিয়ন্ত্রণ খুব কঠোর আবার কোনো কোনো পরিবারে বেয়াড়া ধরনের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। যারা শৃঙ্খলা বা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে তারা বেশ সুন্দরভাবে গড়ে উঠে আবার যারা খুব বেশী অন্যায়-অত্যাচার করলেও কথায় কথায় প্রশ্রয় পায় তারা অসামাজিক হয়ে উঠে। (৪) বিদ্যালয় এবং দলের প্রভাব ব্যক্তির উপর খুব বেশী কার্যকরী হয়। ব্যক্তিত্বের প্রভাবাধীনে ব্যক্তির নিজস্ব দায়িত্বও কম নয়। ব্যক্তি যদি আত্মসচেতন না হ'য়ে কতকগুলি

ব্যক্তিত্বগঠনে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয়

সৎগুণের চর্চা থেকে বিরত থাকে এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত আদর্শের মধ্যে যদি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন গড়ে না উঠে তবে ব্যক্তি যথার্থ মানুষ হ'য়ে গড়ে উঠতে পারবে না। (৫) বিদ্যালয়ে এবং সমাজে মানুষের বিভিন্ন প্রকার মেলামেশার মাধ্যমে মানুষ অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। কিন্তু, এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে ও সমাজে মেলামেশা করতে গিয়ে ব্যক্তি অনেক সময় তার নিজের-নিজের মনের সূত্র হারিয়ে ফেলে। বাহিরের ঘটনা ও অন্তরের সঙ্গে যোগসূত্র না থাকার ফলে ব্যক্তিত্বের কাঠামো বিপর্যস্ত ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। একে বলা হয় splitting of personality। এই ধরনের বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ব্যক্তিরা বিভিন্ন ধরনের অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার করে এবং এদের ব্যবহারে বহুমুখী (multiple) এবং দ্বিমুখী (double) ব্যক্তিত্বের লক্ষণ দেখা যায়। এজাতীয় মানুষেরা সমাজের লোকের সঙ্গে ব্যবহারের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আচরণ করে, আবার গৃহে মেলামেশার সময় অন্য ধরনের ব্যবহার করে। এই জাতীয় ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব টুকরো হ'য়ে বিভক্ত হ'য়ে যায় এবং নানা প্রকার অসংলগ্নতা এদের ব্যবহারে ফুটে উঠে।

মনঃসমীক্ষণ-নীতিতে ব্যক্তিত্বের গঠন (Psycho-analytial structure of Personality):

আমাদের ব্যবহারের পশ্চাতে তথা ব্যক্তিত্বগঠনের ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রভাব কার্যকরী হয় সে সম্পর্কে মনস্তত্ত্ববিদেরা অনেক আলোচনা করেছেন। এ সম্বন্ধে
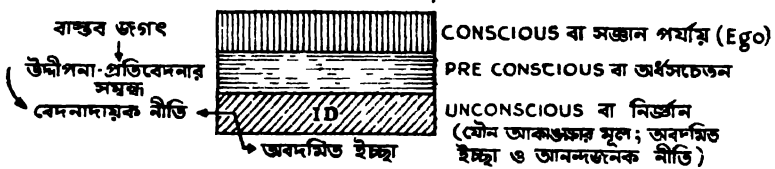
মনের আঞ্চলিক বিভাগ

মনঃসমীক্ষণপন্থী মহামনীষী ফ্রয়েড (Frued) যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি মানুষের মনকে প্রধানতঃ তিনটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে ভাগ করেছেন। ইংরাজীতে একে বলা হয় topographical strata of mind। শরীরবিজ্ঞান মনকে কতকগুলি পর্যায়ে (lobes) ভাগ করেছে। কিন্তু শরীরবিজ্ঞানের এই ভাগ অনুযায়ী আমরা মনকে বস্তু হিসেবে গণ্য ক'রে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ভাগ করতে পারি না। তাই ফ্রয়েড এই বিভাগ

মানেন না, তিনি প্রধানত মনের কতকগুলি স্থিতিশীল বিভাগ গড়ে তুলেছেন, যেমন,—নির্জ্ঞান মন, সজ্ঞান মন ও অবচেতন মন। তারপর তিনি মনের গতিশীল ভাগ করেছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে, সজ্ঞান ব্যক্তিত্ব মানে আমাদের Ego বা Conscious Personality। তবে এই Ego প্রথমত সজ্ঞান আবার কিছুটা নির্জ্ঞানও বটে। ফ্রয়েড Id কে ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন যে, মানুষের নির্জ্ঞান মনের তলায় অজ্ঞাতভাবে অনেক ঝড়ঝাপটা চলেছে। যেমন, আমরা দেখি যে, পৃথিবীর উপরিভাগ খুবই শীতল কিন্তু তার অভ্যন্তরে বিরাট অগ্নিকুণ্ড রয়েছে। কখন কখন এই অগ্নিকুণ্ডের কার্যকলাপের ফলে আমরা বাইরের জগতে ভূমিকম্প দেখতে পাই। তেমনি আমার মনের বেশির ভাগ এই নির্জ্ঞান অংশকে জুড়ে রয়েছে। আমাদের ব্যবহার, আবার আচরণ সকলকিছুর পশ্চাতে নির্জ্ঞান মনের প্রভাব খুবই ক্রিয়াশীল। Ego হোলো আমাদের মনের সজ্ঞান নীতি। এই Ego বাইরের জগতের সংস্পর্শে আসে, আর, Id যা আমাদের প্রবৃত্তি, সেখানে কাজ করে এক গভীর আনন্দজনক নীতি। আমাদের অবচেতন মনে যে অবদমিত আকাঙ্ক্ষা থিতিয়ে পড়ে তার মনের আরো গভীর রাজ্যে প্রবেশ করতে চায় বাইরের রূঢ় আঘাতে। তখন Id তার আনন্দজনক নীতি গ্রহণের জন্য বাধা দেয়। Id এর সঞ্চিত কামনা, আকাঙ্ক্ষা বা impulse বাহিরের জগতে চায় স্ফুরণ। এই Id খুব শক্তিশালী। যদিও তার কোনো শারীরিক সত্তা নেই, তথাপি Id কে Ego-এর মাধ্যমে কাজ করতে হয়। এই সময় এই কাজের পশ্চাতে এক গভীর আনন্দ যখন স্বভাবিকভাবে Id ও Ego-এর মিলিত আকর্ষণে বাইরের জগতের সঙ্গে মনের জগতের কোনো ভেদাভেদ খুঁজে পায় না তখন আমরা সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক হ'যে উঠি। কিন্তু যখন এর অভাব হয় অর্থাৎ যখন আমরা বাইরের সংস্পর্শে এসে কেবলমাত্র বেদনা পাই ও আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের কোনো সুযোগ না পাই, তখন আমাদের ব্যর্থ কামনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা অবচেতন মনের মধ্যে গিয়ে পৌছয়, আর Id গভীর আনন্দ ছাড়া আর কিছু পেতে চায় না বলে সেই বেদনামুখী অভিজ্ঞতাকে বাধা দেয়, তখন অবচেতন মনের পর্যায়ে সঞ্চিত মনোবেদনা কোনো বহির্গমনের পথ না পেয়ে বিপর্যস্ত হ'য়ে যায়। Id-এর আনন্দজনক নীতি আর বাইরের বেদনা—এদুটি মনের পর্দার মধ্যস্থলে গিয়ে যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, তার ফলে দেখা দেয় আমাদের স্বভাবমনের যতকিছু অসংলগ্নতা এবং ওর ফলে মানুষের ব্যবহার অসংলগ্ন হয়ে যায় এবং অসামাজিক রূপ নেয়।

Id, Ego এবং Super Ego—ব্যক্তিত্বের উপর এদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

শিশুর মধ্যে শৈশব থেকে নিজ্ঞান পর্যায়ের মানসিক কার্যাবলীর প্রকাশ দেখা যায়। নিজ্ঞান মন মানুষের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত করে, কার্যাবলী নির্ণীত হয় আনন্দজনক নীতির সাহায্যে। আকাঙ্ক্ষার (desire) মধ্য দিয়ে, বেদনার মধ্য দিয়ে আসে মানুষের পলায়নবৃত্তি (escapism), আকাঙ্ক্ষা থেকে আসে আনন্দ, বেদনা থেকে আসে পলায়নবৃত্তি, অজ্ঞাত আনন্দ থেকে আসে অদ্ভুত কল্পনা-প্রবৃত্তি। ব্যক্তি জানে না কেমন ক'রে সে বাস্তবের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেবে। সে সর্বপ্রকার কর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ে আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করবার জন্য। এর ফলে সে দুর্বিনীত হয় এবং আবেগধর্মী হয়। যখন বাস্তবের সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার কোনো মিল থাকে না তখন মানুষ অস্বাভাবিক ধরনের আচরণ করে।

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, আমাদের Id-এর মধ্যে যৌনপ্রবৃত্তি খুব বেশি কাজ করে। বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের সমস্যা দেখা দেয় এর মাধ্যমে। কোনো কোনো ব্যক্তি অজ্ঞাতসারে যৌনসমস্যার সমাধান করে, নানা ভাবে ব্যবহারের পরিচয় দেয়। সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রে চাই যৌনবিজ্ঞান সম্পর্কে সুস্থ ও সমাজপ্রদ আলোচনা।

আমরা দেখেছি মানুষ একমাত্র প্রবৃত্তির দাস নয়। তার মধ্যে Ego আছে। সে বাইরের জগতের সংস্পর্শে এসে নিজেকে প্রসারিত করতে চায়। যখন তার এই প্রসারণ ক্ষমতা বেশি থাকে না, তখন সে আত্মকেন্দ্রিক হ'যে যায়। কিন্তু, যখন সে Super-Ego-এর আকর্ষণে ছুটে যেতে চায়, তখন সে পায় মহত্তর জীবনবোধের আদর্শ। তাই, স্বাভাবিক ব্যবহারের জন্য এবং উচ্চ আদর্শ নিয়ে জীবনে চলবার জন্য মানুষের প্রয়োজন এই Super-Ego-র আদর্শকে মেনে নেওয়া।

ব্যক্তিত্বের উপযোজন সমস্যা (Problems of Personality adjustment) :

শিশুর মধ্যে আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা দেখা যায়। ছোটবেলা যে গৃহে যে ধরনের আদর অবদার সে পেয়েছে বিদ্যালয়ে এসে সে তার নিজস্ব সার্থকতা চায়। যখন তার ভালোবাসার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না, তখন তার মধ্যে দু'ধরনের প্রবণতা দেখা দেয়—(১) superiority complex বা হামবড়ো মনোভাব এবং (২) inferiority complex বা হীনমন্যমনোভাব। অনেক সময় শিশু যে ধরনের ভালোবাসা চায় তা চরিতার্থ না হ'লে সে দুর্বিনীত হয় এবং এজন্য সে Compensatory mechanism গড়ে তোলে। অর্থাৎ একটিতে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হ'লে অন্যকিছুর মাধ্যমে সেই আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা সে কল্পনা দিয়ে পেতে চায়। আর একটা জিনিস শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। যখন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয় না তখন তার ব্যবহারের মধ্যে সবকিছু জড়িয়ে চলার মনোভাব দেখা দেয়। তখন সে কারও

সঙ্গে মেলামেশা করে না এবং অনেক সময় সে ব্যর্থ মন নিয়ে এমনি ভেঙে পড়ে যে, সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটায়। আর একটি জিনিস হোলো যে, যারা অস্বাভাবিক ও উন্মায়ু সঞ্জাত (neurotic), তারা স্বাভাবিক শিশুর চেয়ে অনেক বেশি defense mechanism গড়ে তোলে। অর্থাৎ নিজে একটা বেড়াজাল গড়ে তুলতে চায় এবং অনেক সময় সে নিজেকে নিজেই সমর্থন করে। আর একটা জিনিস দেখা যায় যে, আমাদের মনের অজ্ঞাতে যে-সব ভাবধারা লুকিয়ে থাকে, সেইগুলি সজ্ঞান মনে বেরিয়ে এসে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। যখন মানুষ বাইরের পরিবেশকে যতখানি গুরুত্ব দিতে পারে ততখানি সে তখন ব্যবহার করে আর যখন পারে না তখন সে একেবারে ভেঙে পড়ে।

উপযোজনা ও ব্যক্তিত্বের সমস্যা

ফ্রয়েড দেখিয়েছেন মনের একটি সুনির্দিষ্ট প্রবৃত্তিকে। তিনি মনের যে ভৌগোলিক অঞ্চল ভাগ করেছেন সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। ফ্রয়েড দেখিয়েছেন যে, কাম্যভাব, বিশ্বাস, মনোভাব প্রভৃতি হোলো পূর্ববর্তী মানসিক পদ্ধতির ফল এবং প্রত্যেক বয়স্ক মানুষের প্রতিক্রিয়ার পশ্চাতে আছে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা।

আডলার (Adler) বলেছেন প্রত্যেক প্রাণীর একটা নিজস্ব বিশেষ ধরনের জীবনের কাঠামো (pattern of life) আছে। পরিবেশকে বুঝবার জন্য প্রত্যেক মানুষের একটা নিজস্ব ক্ষমতা বা বিশেষত্ব আছে। একমাত্র মানুষ শরীরের মধ্যে একটা হীনমন্য ভাব নিয়ে জন্মায়। পরিবেশের মধ্য দিয়ে সে অবস্থা কাটিয়ে শক্তিশালী হোতে চায়। একে আডলার আখ্যা দিয়েছেন 'will to power'। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, কোনো মানুষকে সত্যিকার অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত এই দুইটি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায় না। তিনি দেখিয়েছেন প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব একটা ধর্ম আছে এবং সেই অনুসারে সে তার ব্যবহারের কাঠামো গড়ে তোলে।

ক্রেট্স্‌মার দেখিয়েছেন যে, মানুষের ব্যবহার অনুসারে দুটি শ্রেণী বিভাগ করা যায়—(১) Cycloids এবং (২) Schizoids. প্রথম শ্রেণীতে আমরা দেখি এমন ধরনের ব্যক্তিত্ব যা মানুষকে সমাজপ্রদ করে তুলেছে, সদাসর্বদা প্রফুল্ল ক'রে রেখেছে কিন্তু বাল্যজীবনে কোন কিছুতে অবদমিত হ'য়ে মনের ভাবকে হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চেয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যক্তি হোলো অসামাজিক আবার খুব সংযত, খুব লাজুক, মধ্যে মধ্যে মুশড়ে পড়ে, খুব অনুভূতিপ্রবণ, খুব সৎ, দয়ালু আবার বোকা। এরকম অনেকগুলি পরস্পর বিরোধীর সমাহারে এই জাতীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে।

Cycloid ও Schizoid

ফ্রয়েডের কন্যা আন্না ফ্রয়েড বলেছেন যে, মানুষের ব্যক্তিত্বের সমস্যা সমাধান

করতে হ'লে চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া উচিত। মানুষের ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ব জেনে তার প্রতিকারের জন্য মনস্তাত্ত্বিকরা সাধারণত যে সব প্রণালী ব্যবহার করেন তন্মধ্যে হোলো—(১) Case-history method, (২) Occupation therapy method.. (৩) প্রশ্নাবলী প্রয়োগপদ্ধতি, (৪) রোজনামচা লিখন পদ্ধতি এবং (৫) Shock therapy প্রভৃতি নানা ধরনের পদ্ধতি।

ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ (Types of Personality):

মনস্তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিত্বের গুণ অনুসারে কতকগুলি বিভাগ করেছেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক কোন একটি মানুষকে সুনির্দিষ্টভাবে কোনো প্রকার জাতিরূপে (type) ভাগ করা চলে না, তথাপি মনস্তাত্ত্বিকরা যে বিভাগ গ'ড়ে তুলে ব্যক্তিপার্থক্য নির্ধারণ করেছেন সেই পার্থক্য অনুসারে আমরা ব্যক্তিত্বের কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ করে ফেলতে পারি। যেমন—

(১) মেজাজ অনুসারে আমরা কোনো ব্যক্তিকে অন্তর্বৃত আবার কোনো ব্যক্তিকে বহির্বৃত এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। কারো কারো মধ্যে অন্তর্বৃত
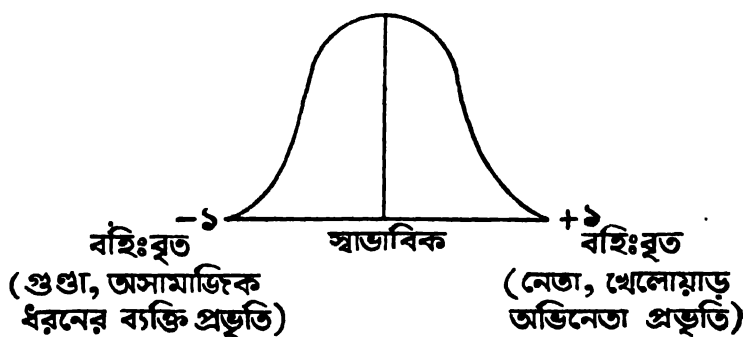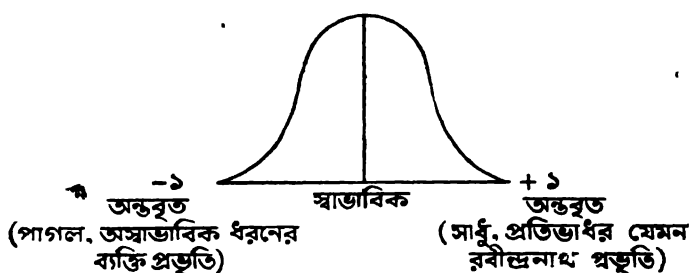
ব্যক্তিত্বের পর্যায়

গুণাবলী খুবই বেশি, কারো কারো মধ্যে বহির্বৃত গুণাবলী খুবই বেশি। কারো কারো মধ্যে এই দুই এর সমাহার দেখা যায়। মনস্তাত্ত্বিক ইয়ুং (Yung)

বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু অন্তর্বৃত এবং বহির্বৃত। মানুষ চরম অন্তর্বৃত হ'লে অস্বাভাবিক ধরনের পাগল হ'য়ে যায় কিংবা সাধু-সন্ন্যাসী হ'য়ে যায় বা প্রতিভাধর হ'য়ে যায়। আবার চরম বহির্বৃত হ'লে মানুষ খুব বড়ো ধরনের নেতা, খেলোয়াড় হ'তে পারে কিংবা অসামাজিক গুণ্ডা হ'য়ে যেতে পারে। যাদের মধ্যে অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত—এই দুইয়ের সমষ্টি সঙ্গতিপূর্ণ হয় তারা স্বাভাবিক হয়। এই পর্যায়ের ব্যক্তিকে ambivert বলে।

অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত

পূর্বপৃষ্ঠার চিত্রের সাহায্যে স্পষ্টই প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা খুব বেশি অন্তর্বৃত তারা সাধারণত নিঃসঙ্গ জীবন ভালোবাসে। বাইরের জগতের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করে না। আরও দেখা যায় যে, তাদের মধ্যে এই অন্তর্মুখী গুণ যদি ভালোর দিকে যায়, তবে সে ক্ষেত্রে তারা দার্শনিক প্রভৃতি হ'য়ে যায় কিংবা সাধুসন্ন্যাসী হ'য়ে যায়। আবার যখন এর আধিক্য মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তখন সমাজের মানুষ একেবারে অকেজো হ'য়ে যায়। আবার যারা বহির্মুখী তাদের কর্মক্ষমতা যদি খুব প্রবল হয় তবে তারা বড়ো খেলোয়াড় থেকে আরম্ভ করে বিখ্যাত নেতা পর্যন্ত হ'য়ে যেতে পারে। বহির্মুখী মানুষেরা খুব বেশি নিজেকে জাহির করতে চায়। কিন্তু যাদের মধ্যে এই বহির্মুখী প্রবণতা সীমা ছাড়িয়ে যায়, তারা অস্বাভাবিক ধরনের গুণ্ডাদল বা অসামাজিক কাজের মধ্যে লিপ্ত হয়। এক শ্রেণীর লোক আছে যাদের মধ্যে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ভাব এক অপূর্ব সমন্বয় লাভ করেছে এবং তারা সমাজে সহজভাবে চলতে পারেন। তবে একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কমবেশি প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু অন্তর্বৃত, কিছু না কিছু বহির্বৃত। আমরা দেখতে পাই যে, যেসব মানুষের মধ্যে এই দুইটি গুণের সমন্বয় ঘটেছে, তারও মধ্যে মধ্যে কিছু না কিছু অন্তর্বৃত বা বহির্বৃত মনোভাবের প্রকাশ না ক'রে পারে না।

(২) বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে আমরা মানুষের ব্যক্তিত্বের পার্থক্য দেখতে পাই। আমরা দেখি ব্যক্তিত্বের পরিমাপ অনুসারে কেউ হয়তো খুব উচ্চ মেধাসম্পন্ন, কেউ হয়তো খুবই প্রতিভাধর, কেউ সাধারণ পর্যায়ের, কেউ হয়তো আবার অতি নিম্নমানের। মনস্তত্ত্ববিদেরা বুদ্ধির বৈচিত্র্য অনুসারে ব্যক্তিত্বের নিম্নলিখিত জাতিরূপ করে থাকেন; যেমন—(ক) ৯০ থেকে ১১০ যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. Q.) তারা সাধারণ পর্যায়ের; (খ) ১১০—১৪০ পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের, তারা সাধারণ পর্যায়ের ঊর্ধ্বে; (গ) ১৪০ এর ঊর্ধ্বে যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক, তারা প্রতিভাধর; (ঘ) সাধারণ পর্যায়ের নিম্নে ৯০—৭০ পর্যন্ত বুদ্ধ্যঙ্ক যাদের, তারা বুদ্ধিতে জড়গ্রস্ত (dullard); (ঙ) বুদ্ধ্যঙ্ক আরো ক্রমশ

বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী ব্যক্তিপার্থক্য

নিম্নাভিমুখী হ'লে তাদের আরো নানাবিভাগ করা যায়। যেমন—feeble-minded, morone, imbecile প্রভৃতি। আমরা এই বুদ্ধির পরিমাপ অনুসারে বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের সাহায্যে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি।

(৩) ব্যক্তিত্বের আর একটি বিভাগ কেউ কেউ করেন, যেমন, Masculine এবং Faminine বা পুরুষধর্মী ও স্ত্রীধর্মী ব্যক্তিত্ব। কোন কোন মানুষের মধ্যে যখন নারীসুলভ কতকগুলি গুণ বিশেষভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠে তখন আমরা তাকে বলি স্ত্রীধর্মী ব্যক্তিত্ব, আবার কারো মধ্যে যখন পুরুষসুলভ কতকগুলি গুণ বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন তাকে আমরা বলি পুরুষধর্মী ব্যক্তিত্ব। কারো কারো মধ্যে স্ত্রীধর্মী ও পুরুষধর্মী গুণাবলীর সমন্বয় ঘটে থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিত্ব অপূর্ব হ'য়ে ওঠে নানা বিচিত্র গুণের সমাহারে।

পুরুষধর্মী ও স্ত্রীধর্মী ব্যক্তিত্ব

(৪) ব্যক্তিত্ব অনুসারে আর একটি ভাগ করা হয়; যেমন—Psychogenic এবং Vicerogenic। চাহিদা অনুসারে তথা শরীর ও মনের প্রয়োজনে যখন কেউ অন্তর্বৃত হয় তখন তাকে বলে Psychogenic, আবার কেউ বহির্বৃত হয় যখন তখন তাকে বলা হয় Vicerogenic।

চাহিদানুযায়ী ভাগ

(৫) ব্যক্তিত্বের বিভাগ অনুসারে আর একটি ভাগ করা যায়। শারীরিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কেউ বা Thyroid ধরনের হয়, কেউ Adrenal ধরনের হয়, কেউ বা pituitary ধরনের হয়। আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থি আছে। এদের ক্ষরণ বেশি কমের উপর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ধরনের হ'য়ে থাকে। যেমন, Thyroid বেশি ক্ষরিত হ'লে বুদ্ধির প্রখরতা দেখা যায়, আবার Pituitary-এর ক্ষরণ বেশি হ'লে মানুষ স্থূলকায় ও স্ত্রীভাবাপন্ন হয়।

শারীরিক লক্ষণ অনুসারে

(৬) ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে আরো কতকগুলি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন—(১) Hyperkinetic ও Hypokinetic-এর মধ্যেও আবার Hyperkinetic Inhibitive type, Hypokinetic Impulsive type প্রভৃতি ভাগ করা যায়; (২) কেউ বা Expansive, কেউ বা Reclusive, কেউ বা Submissive, কেউ বা Ascendent ধরনের হয়; (৩) কেউ কেউ ব্যক্তিত্বের নিম্নলিখিত ভাগ করেন, যেমন, কেউ স্বাভাবিক ধরনের, কেউ বা মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত অনুসারে Hysteriod, Cycloid, Schizoid, Epileptoid প্রভৃতি; (৪) ব্যক্তিত্বের আরো একটি

বিভাগ অনুসারে Choleric, Melancholic, Plegmatic, Sanguine শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

ব্যক্তিত্বের পরিমাপ (Measurement of Personality) :

মনস্তাত্ত্বিক নীতি অনুসারে আমরা ব্যক্তিত্বকে নানাভাবে পরিমাপ করতে পারি। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন ধরনের উপায় নির্দেশ করেছেন। এই সমস্ত উপায়গুলি ব্যক্তিত্ব পরিমাপের নির্দেশসূচক। অবশ্য এটা ঠিকই যে, কোনো বিশেষ পরিমাপের দ্বারা ব্যক্তিত্বকে নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায় না। তথাপি যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করবার চেষ্টা হয়েছে, তার দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কিছু পরিচয় যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠে সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। এখন বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক কায়দা-কানুন অনুসরণ ক'রে ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করবার চেষ্টা চলেছে এবং এই প্রচেষ্টা যে অনেকখানি সার্থক হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়। ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য পূর্বে কোনো সূক্ষ্ম উপায় কেউ ব্যবহার করেননি আমাদের দেশে। পাশ্চাত্ত্য দেশে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার ব্যবহার এদেশেও কিছু কিছু ব্যবহৃত হোতে আরম্ভ করেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ব বিভাগ এবং শিক্ষাবিভাগ ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য standardised কতকগুলি প্রশ্নাবলী ব্যবহার করছেন। পাশ্চাত্ত্যে আমরা প্রথম বর্ণ্টনের মধ্যে দেখি যে, তিনি ১৮৮৪ সালে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য ল্যাবরেটারী স্থাপন করেছিলেন। তিনি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে বিচার বিশ্লেষণ ক'রে দেখেন। ক্রেপলিন নামক একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য দেখেছিলেন কয়েকটি পরীক্ষার দ্বারা, যেমন—(১) Reaction type নির্ণয় পরীক্ষা, (২) কথাবার্তার মধ্যে দ্রুততা, (৩) স্মৃতিশক্তি বিচার, (৪) অনুভূতি, (৫) সংবেদনা, (৬) পার্থক্য নির্ণয়, এবং (৭) ক্লান্তি। এইগুলি বিচার ক'রে তিনি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে মাপ করতে চেয়েছিলেন। স্টার্ণ (Stern) নামে একজন মনস্তাত্ত্বিক মানুষের জটিল ও ভাবগত বিশেষত্ব পরিমাপ করেছিলেন। ক্যাটেল পরীক্ষা ক'রে দেখেছিলেন যে, মানুষের দক্ষতা প্রত্যেকের বিভিন্ন ধরনের। দড়ি টানাটানির জোর, দৌড়ানোর জোর, সময়ের প্রতি প্রতিবেদনা, শব্দগতি, কোনো জিনিস টুক্‌রো টুক্‌রো করা, দৃষ্টিশক্তির পার্থক্য ও চিন্তার বিচার ক'রে তিনি উপরোক্ত সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। জ্যাস্ট্রো (Jastrow) নামে একজন মনস্তাত্ত্বিক দেখলেন যে, বুদ্ধির সঙ্গে সময়ের গতি, বেদনার একটা একটা সম্পর্ক রয়েছে। যা হোক, মনস্তাত্ত্বিকেরা এই বিষয়ে অনেকেই একমত যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবেশ ও বংশগতি উভয়েই

প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাব অনুসারে ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন প্রকার জাতিগঠন কেহ কেহ করেছেন। গল্টন একটি পরীক্ষায় দেখেছিলেন যে, যারা বৈজ্ঞানিক, তারা বিমূর্ত কল্পনা ও চিন্তা সম্পর্কে অনেক উচ্চ ধারণা পোষণ করে। তাঁর এই পরীক্ষার নাম Breakfast questionnaire। তিনি আরো দেখেছেন যে, বৈজ্ঞানিকদের image সম্পর্কে ধারণা কম। Visual-এর ক্ষেত্রে স্তরপার্থক্য খুব স্পষ্ট থেকে এমন অস্পষ্ট হয়ে যায়, তাই তিনি দেখেছেন যে, visual type বের করা বড়ো কঠিন ব্যাপার। গল্টনের পরবর্তী মনস্তত্ত্ববিদেরা ব্যক্তিত্বকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(১) visile বা যাদের visual imagery বেশি। এই জাতীয় লোকেরা অন্যপ্রকার image গ্রহণ করতে পারে না। (২) যাদের গানের কান আছে বা ঐ জাতীয় কোনো ক্ষমতা থাকে তাদের audile পর্যায়ে ফেলা যায়। (৩) যাদের মধ্যে গতিসঞ্চার বেশি তাদের motile বলা হয়। (৪) যাদের মধ্যে উপরোক্ত সব ধরনের image কিছু-না-কিছু মিশ্রিত হ'য়ে সক্রিয়ভাবে প্রতিফলিত হয়, তাদের mixed type বলা হয়।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত কৌশল

ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহৃত হয়:

(১) Case-history Method বা জীবনেতিহাস পর্যালোচনা করা। এই জাতীয় পরীক্ষায় ব্যক্তির জাতিবর্ণ, বংশগত নানাপ্রকার পটভূমিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তালিকাবদ্ধ করা হয় এবং দেখা হয় যে, ব্যক্তির সমস্যা কতখানি গভীর। যে সমস্ত ব্যক্তির নানাধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যা রয়েছে এবং যে সমস্ত ব্যক্তির কোনো-না-কোনো প্রকার দৈহিক ও মানসিক দিক ব্যধিগ্রস্ত, তাদের একটা বিস্তৃত পরিচয় এই পদ্ধতির মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষার্থীকে অতি সহজভাবে কোনো পরীক্ষাকেন্দ্রে আরাম করে বসিয়ে কথাবার্তার মাধ্যমে তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সমস্যার পরিচয় নেওয়া হয়। কোনো কোনো মনস্তাত্ত্বিক ব্যবহারিক দিক দিয়ে "উন্মায়ু সঞ্জাত লক্ষণাবলী বিচারের জন্য প্রশ্নাবলী" (Questionaire on nurotic symptoms) ব্যবহার করেন।

Case-history প্রণালী

(২) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য আর এক ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়; তার নাম Rating scale। এর অপর নাম Personality Profile। একে আবার কেহ কেহ psychograph আখ্যা দিয়ে থাকেন। এই পদ্ধতির প্রকৃতি হোলো কতকগুলি গুণগত বৈশিষ্ট্য-তালিকা তৈরি করা। এই তালিকার মধ্যে মানুষের শারীরিক, মানসিক, ভাবগত,

Rating scale

গুণগত বিভিন্ন দিকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যমূলক প্রশ্নাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক প্রশ্নে নানাপ্রকার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যমূলক সংক্ষেপিত গুণগত তালিকা স্কেলের আকারে সাজিয়ে রাখা হয়। পরীক্ষার্থীকে বলা হয় তার পছন্দমত উত্তরগুলিতে ✓ জাতীয় চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করতে। এই স্কেলের উত্তর অনেক সময় পরীক্ষক স্বয়ং লিখে নেন।

(৩) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য কেহ কেহ "কাগজ-কলম পরীক্ষা" (Paper-and-Pencil test) ব্যবহার করেন এই পরীক্ষা অতি সহজভাবে করা হয়।

কাগজ-কলম পরীক্ষা

পরীক্ষার্থীকে বলা হয় যে, সে কাগজ ও পেন্সিলের সাহায্যে খুশিমতো নিজের ব্যক্তিগত ইতিহাস ও সমস্যা সম্পর্কে লিখবে। পরীক্ষার্থী আপন ইচ্ছামত তার মনের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং হতাশা-বেদনার কথা লিপিবদ্ধ করে। এই পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষার্থীর বহু জটিল মানসিক সমস্যার পরিচয় পাওয়া যায়। মনস্তাত্ত্বিকরা সেগুলি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, এই জাতীয় পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা তাদের মনের অনেক গোপন কথা অসংলগ্নভাবে ব্যক্ত করে ফেলেছে। এমনকি মনের কোনো বিশেষ-ভাব যখন তারা চাপতে চেয়েছে, তখন অজ্ঞাতসারে তাদের মনের খবর বলা হয়ে গেছে।

(৪) Performance Test এর সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিকরা Standardized Test ও Objective Test পর্যায়ের পরীক্ষা চালিয়ে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করেন। উড্‌ওয়ার্থ (Woodworth) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী Personal Data Sheet নামে প্রশ্নাবলী তৈরি করে তার উত্তর আদায় করে বিশ্লেষণপদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তিত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। অধুনাকালে উড্‌ওয়ার্থের আর একটি পরীক্ষা Word Association Test চালু হয়েছে।

Performance Test

এই পরীক্ষানুসারে পরীক্ষার্থীকে কতকগুলি শব্দ ক্রমানুসারে বলে যাওয়া হয় এবং প্রত্যেকটির একটি করে প্রতিশব্দ চাওয়া হয়। পরীক্ষক ঘড়ির সাহায্যে সময় পরিমাপ করে দেখেন যে, এক-একটি শব্দের প্রতিশব্দ উচ্চারণ করতে কত সময় লেগেছে। পরীক্ষার্থীকে আবার সেই সমস্ত শব্দ বলা হয় এবং প্রতিশব্দ চাওয়া হয়। দ্বিতীয়বার এইরূপ পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী নূতন প্রতিশব্দ ব্যবহার করে এবং দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উত্তর দিতে পরীক্ষার্থী অনেক সময় নিয়েছে। যে সব ক্ষেত্রে সময় বেশি লেগেছে, সেই সব ক্ষেত্রে মনস্তাত্ত্বিকরা বিশেষ ব্যক্তিত্বসূচক নিদর্শন খুঁজে পান। Performance Test আরো অনেক আছে, যেমন—Downey-এর Will-Temperament Test, Handwriting Test এবং Murray ব্যবহৃত ব্যক্তিত্ব পরীক্ষার পদ্ধতি প্রভৃতি।

(৫) Interview Method বা কথোপকথন পদ্ধতির সাহায্যে পরীক্ষার্থীকে সহজভাবে তার বিভিন্ন প্রকারে বিশেষত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবে করা হয় এবং এর দ্বারা পরীক্ষার্থীর বিশেষ ধরনের সমস্যা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কথোপকথন পদ্ধতি

(৬) Free Association পদ্ধতির সাহায্যে কতকগুলি সুসংগঠিত প্রশ্নাবলীর উত্তর চাওয়া হয়। পরীক্ষার্থী সেই সব উত্তর সহজভাবে দেয়। তাছাড়া, মনস্তত্ত্ববিদেরা অনেক শব্দের একটি তালিকা তৈয়ারি করেন। পরীক্ষার্থীকে তার মনে যে শব্দ বিশেষ প্রতিক্রিয়া আনে, সেগুলি দাগ দিতে বলা হয়। এর দ্বারা পরীক্ষার্থীর অনেক আচার-ব্যবহারগত, গুণগত, সামাজিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের পরিচয় পান।

স্বাধীন অনুবন্ধ প্রকাশ

(৭) স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতি বা Dream Analysis-এর সাহায্যে ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পদ্ধতি মনঃসমীক্ষণপন্থীরা ব্যবহার করেন। পরীক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে জীবনে যে-সমস্ত স্বপ্ন দেখেছে সেগুলি সহজভাবে ব'লে যেতে। বিশ্লেষণ করে দেখা যায় স্বপ্নের ঘটনাবলীর মাধ্যমে পরীক্ষার্থী তার মনের অনেক রহস্য খুঁজে বেড়িয়েছে। ফ্রয়েড, আডলার, ইয়ুং প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকরা মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছেন বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণ দ্বারা। তারা দেখিয়েছেন যে, স্বপ্ন কখনো কোনো অবস্থায় বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট নয়। বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে কাহিনীর মতো সূত্রাকারে একটা সংযোগের সন্ধান পাওয়া যায় প্রত্যেক স্বপ্নের মধ্যেই। আমাদের মধ্যে অসংখ্য কামনা-ভাবনা, অবদমিত ইচ্ছাবৃত্তি রয়েছে, যা স্বপ্নের মাধ্যমে চরিতার্থ হোতে চায়।

স্বপ্নবিশ্লেষণ পদ্ধতি

(৮) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য কতকগুলি Projective Procedure ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষার্থীকে কতকগুলি ছবি দেখানো হয় এবং সেই ছবি দেখে তার মনের মধ্যে যে জাতীয় ভাব জাগে, তা লিপিবদ্ধ করতে বলা হয়। এই জাতীয় পদ্ধতিকে Thematic Apperception Test বলে।

Thematic Apperception

(৯) Rorchach Test নামে আর একপ্রকার পরীক্ষা ব্যবহার করা হয়। একটি ব্লটিং কাগজে কালি ফেলে তা কাগজের উপর মেলে দিলে নানা প্রকার ছবির আকার নেয়। পরীক্ষার্থীকে সেই ধরনের ছবি বানিয়ে তার মনের অবস্থা বর্ণনা করতে বলা হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

Rorchach Test

সার সংক্ষেপ

ব্যক্তিত্ব একটা সামাজিক গতিশীল ব্যাপার। মানুষের ব্যক্তিত্ব নানাপ্রকার উপাদান (traits) নিয়ে গঠিত; যেমন—(১) শারীরিক গঠন (২) মেজাজ (৩) বুদ্ধি (৪) আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা (৫) সমাজবোধ (৬) ক্ষিপ্রকারিতা (৭) মানসিক দক্ষতা। ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ভর করে নানা উপাদানের উপর; যেমন—পরিবেশ ও বংশগতির প্রভাব, শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত কার্যাবলী প্রভৃতি। ব্যক্তিত্বের গঠন অনুসারে মনস্তাত্ত্বিকরা নানাধরনের জাতিরূপ গ'ড়ে তুলেছেন। আমরা আজকাল ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করতে নানাপ্রকার পদ্ধতির আশ্রয় নিচ্ছি; যেমন, (১) Performance Test, (২) Case History Method, (৩) Paper and Pencil Method, (৪) Rating Scale, (৫) Interview Method, (৬) Free Association Method, (৭) Dream Analysis, (৮) Thematic Apperception Test, (৯) Rorchach Test প্রভৃতি।

Questions

1. What is Personality? Discuss the psycho-analytical structure of Personality.
2. What are the traits of Personality?
3. How Personality can be developed? State the nature of behaviour problems of school-going childern and suggest some of the remedial measures.
4. How Personality can be measured?
5. What are the "Types" of Personality used by different psychologists?

References :

1. Garrett—Great Experiments in Psychology.
2. Ross—Groundwork of Educational Psychology.
3. হরিসাধন গোস্বামী—মনস্তত্ত্বের ভূমিকা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্যক্তির মূল্যায়ন

(Assessment of Individuals)

ব্যক্তি-পার্থক্যের মূলনীতি (Principles of Individual Differences) :

আধুনিক মনস্তত্ত্ব ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিরপার্থক্য আছে বলে স্বীকার ক'রে থাকে। এক-এক ধরনের শ্রেণীর ব্যক্তি আছে যাদের একটি বিশেষ জাতে (Types) ফেলা যায়। প্রাচীন মনস্তত্ত্ববিদেরা অনেক ব্যক্তির মধ্যে একটা "গড়শ্রেণী" (average) খুঁজে পেয়েছিলেন। কেহ কেহ আবার ব্যক্তিকে তার গুণাবলী অনুসারে choleric, sanguine, melancholic এবং phlegmatic শ্রেণীতে ভাগ করে দেখতেন। আমরা পূর্বে আলোচনা করে দেখেছি যে, অসংখ্য প্রকার ব্যক্তি-পার্থক্যের কথা মনোবিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। কারো স্মৃতিশক্তি বেশি, কারো স্মৃতিশক্তি কম, কারো মনোযোগের ক্ষমতা সুস্থির, কারো বা মন খুব চঞ্চল। কেউ বা গভীর চিন্তাশীল, কেউ বা বহির্মুখী। কেহ বা objective এবং subjective—এই দুই প্রকার ব্যক্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। কেহ বা বিশ্লেষণশীল বা analytic আবার কেহ বা সামঞ্জস্য ভালোবাসে বা synthetic ধরনের হয়। কেহ হয়তো স্বতঃস্ফূর্ত, কেহ বা শুধুমাত্র প্রতিবেদনশীল। কারো কল্পনাপ্রবণতা খুব স্বচ্ছ, কারো বা কম। কেহ visual, কেহ auditory, কেহ motor বা অন্যকোনো ধরনের বা ঐ সকলরকম জাতের সংমিশ্রণ। অনেক শিশু হুবহু স্মৃতিশক্তি প্রকাশ করে —এই শ্রেণীর শিশুদের ইংরাজীতে eidetic শ্রেণীর বলা হয়। ইয়ুং (Jung) নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ্ Introvert এবং Extrovert বা অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত এই দুই ধরনের ব্যক্তিশ্রেণী আবিষ্কার করেছেন। Introvert শ্রেণীর ব্যক্তিরা অন্তর্জগৎ নিয়ে থাকতে ভালোবাসে আর Extrovert শ্রেণীর ব্যক্তিরা বাইরের কাজের প্রতি অধিকতর প্রবণতা দেখায়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এই দুইটির মধ্যে একটির প্রাধান্য থাকে। সেজন্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে এই দুটি বিশেষত্বের মাঝামাঝি একটি স্বভাব গড়ে তোলা প্রয়োজন। অবশ্য থর্নডাইক (Thorndike) দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য এমনই সূক্ষ্ম যে, খুব একটা বাঁধাধরা নিয়ম অনুসরণ করা যায় না।

অসংখ্য প্রকার ব্যক্তি-পার্থক্য

ছবির সাহায্যে Introvert এবং Extrovert-এর পার্থক্য বোঝানো দরকার। নিম্নের চিত্রটির মধ্যবিন্দুটি স্বাভাবিক প্রবণতার প্রতীক এবং +১ ও −১ যথাক্রমে Extroversion এবং Introversion-এর বিশেষত্ব প্রকাশ করছে। আমরা পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদেও এ সম্পর্কে আলোচনা করে দেখিয়েছি। ব্যক্তির সঙ্গে
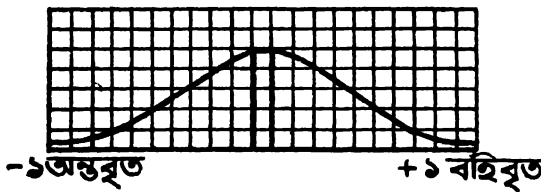
অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত

ব্যক্তির পার্থক্য এত বেশি যে, আমরা সকলকেই একটা 'গড়শ্রেণী' হিসেবে ধরতে পারি না। আমাদের বিদ্যালয়ের শিশুদের মধ্যে ব্যক্তি পার্থক্য অনেক প্রকারের রয়েছে। তাদের বিশেষত্ব অনুসারে এক-একটি 'শ্রেণী' বা 'জাতে' বিভক্ত ক'রে ফেলা যায়। Introvert কিংবা Extrovert উভয়ে যাতে পরস্পর মেলামেশা ক'রে পরস্পরের গুণ গ্রহণ করতে পারে তজ্জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা পেশাদারী ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত

মাদাম মন্তেসরী (Madam Montessori) অবশ্য type অনুসারে ভাগ করতে না ব'লে শিক্ষাকেই ব্যক্তিত্বমণ্ডিত (individualized) করতে বলেছেন। বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্র তার নিজস্ব প্রবণতা অনুসারে যাতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, শ্রেণীর অস্তিত্ব প্রয়োজন নেই।

বুদ্ধির পরীক্ষা (Intelligence Test) :

মনস্তত্ত্বের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তির মানসিক বয়স বের করে ব্যক্তি-পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি। এই মানসিক বয়স (mental age) এবং প্রকৃত বয়স (chronological age) ধরে নিয়ে অঙ্কের সাহায্যে বুদ্ধ্যঙ্ক বা Intelligence Quotient বের করা যায়। টারম্যান (Terman) মানসিক বিকাশ পরিমাপের জন্য এই জাতীয় বুদ্ধ্যঙ্ক ব্যবহার করেছিলেন। মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের একটা সমতা হিসেব ক'রে এই বুদ্ধ্যঙ্ক বের করা হয়। উদাহরণ-স্বরূপ, একজন বালকের মানসিক বয়স ১০ (অর্থাৎ তার পারদর্শিতার স্তর ১০

বৎসরের বয়সের শিশুদের সাধারণ পারদর্শিতার সমান) এবং তার প্রকৃত বয়স (Chronological age) ১০ বৎসর। নিম্নলিখিত সূত্র অনুসরণ করলে বুদ্ধ্যঙ্ক বের করা যায় :

$$\frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০ = \text{বুদ্ধ্যঙ্ক।}$$

এক্ষেত্রে দশমিক বিন্দু অস্বীকার করলে বুদ্ধ্যঙ্ক দাঁড়ায় ১০০। মানসিক বয়স নির্ধারণের জন্য কোন বিশেষ পর্যায়ের শিশুদের উপর প্রযোজ্য কতকগুলি পরীক্ষা ব্যবহার

বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের কৌশল

করা হয়। এই জাতীয় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বিভিন্নপ্রকার যে-সব প্রশ্ন করা হয়, তার উদ্দেশ্য হোলো 'সু-উচ্চ মানসিক কর্মবৃত্তি' (higher mental faculties) অনুসন্ধান করা ; যেমন—যুক্তি, কল্পনা, বিচার, মানসিক দক্ষতা প্রভৃতি। এই বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপের সাহায্যে আমরা শিশুদের বুদ্ধিগত পরিচয় বের ক'রে সেই অনুযায়ী তাদের বিভক্ত ক'রে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি এবং প্রয়োজন মাফিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি। Stanford-Binet Scale অনুযায়ী বুদ্ধির বিস্তার আমরা নিম্নলিখিত ভাবে দেখতে পাই :
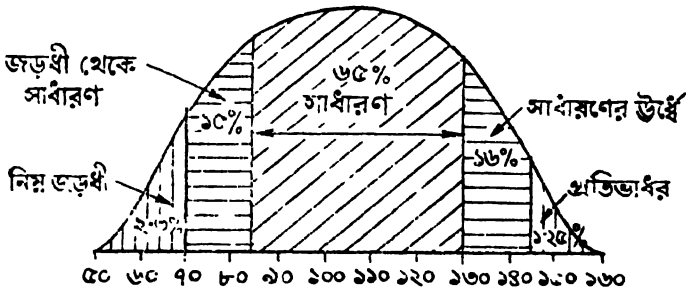
বুদ্ধির বিস্তার

বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপের মধ্য দিয়ে আমরা শিশুদের মধ্যে কে সাধারণ গড় প্রকৃতির, কে খুবই বুদ্ধিমান, কার বুদ্ধি খুবই ক্ষীণ বা জড়ধী, তা আমরা পরিমাপ করতে পারি। এই প্রসঙ্গে Binet-Simon প্রবর্তিত পরীক্ষাপ্রণালী খুবই উপযোগী।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে (Binet) যে স্কেল ব্যবহার করেছিলেন তা নিম্নলিখিত ধরনের—

তিন বৎসর :

১। নাক চোখ মুখ দেখানো

২। দুইটি সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করা

৩। ছবি দেখে বস্তু নির্ণয় করা

৪। পরিবারের নাম বলা

৫। ছয়টি শব্দ সম্বলিত বাক্য পুনরাবৃত্তি করা।

চার বৎসর :

১। নিজের যৌন পরিচয় বলা

২। চাবি, ছুরি, পয়সা সম্পর্কে নাম বলা

৩। তিনটি সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করা

৪। দুইটি লাইন তুলনা করা।

পাঁচ বৎসর :

১। দুইটি জিনিসের ওজন তুলনা ক'রে বলা

২। একটি বর্গক্ষেত্র রচনা করা

৩। দশটি শব্দ সম্বলিত একটি বাক্য উচ্চারণ করা

৪। ত্রিভুজের ভগ্ন অংশকে জোড়া লাগানো।

ছয় বৎসর :

১। সকাল ও বিকেলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা

২। কতকগুলি পরিচিত শব্দকে ব্যবহার ক'বে সংজ্ঞানির্দেশ করা

৩। একটি হীরাকে আঁকা

৪। তের পেনি হিসেবে ক'রে গুন্‌তি কবা

৫। কুৎসিত ও সুন্দর মুখের ছবি তফাত কবতে শেখা।

সাত বৎসর :

১। ডানহাত ও বাঁ কান চিনতে পারা

২। একটা ছবি বর্ণনা করা

৩। যুগপৎ তিনটে নির্দেশ দিতে পারা

৪। মূল্য গণনার ক্ষমতা পরীক্ষা করা

৫। চার রকম রঙের নাম বিশ্লেষণ করতে পারা।

আট বৎসর :

১। স্মৃতি থেকে দুটি জিনিস মনে ক'রে তুলনা করা

২। ২০ থেকে ০ পর্যন্ত গণনা করা

৩। ছবি থেকে কোন বাদ অংশ খুঁজে বের করা

৪। পাঁচটি সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করা।

নয় বৎসর :

১। মুদ্রা বিনিময় করতে জানা

২। জানা শব্দের শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী প্রয়োগ

৩। অর্থের সমস্ত টুক্‌রো টুক্‌রো ভাগ চিনিতে পারা

৪। মাসের নাম সুশৃঙ্খলভাবে বলতে পারা

৫। সাধারণ প্রশ্ন বলতে পারা।

দশ বৎসর :

১। ওজন হিসেবে পাঁচটি টুকরোকে সাজানো

২। স্মৃতিথেকে দু'টি ছবি আঁকা

৩। অর্থহীন কোনো বাক্যকে সমালোচনা করা

৪। কঠিন প্রশ্ন বোঝা বা উত্তর দেওয়া

৫। তিনটি শব্দ দিয়ে দু'টি বাক্য রচনা করা।

বারো বৎসর :

১। লাইন বা রেখার দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ধারণা

২। তিনটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য রচনা করা

৩। তিন মিনিটে ষাটটি শব্দ বলা

৪। তিনটি বিমূর্ত শব্দ ব্যাখ্যা করা

৫। অসংলগ্ন বাক্যকে সাজিয়ে বলা।

পনর বৎসর :

১। সাতটি সংখ্যা পুনরাবৃত্তি করা

২। এক মিনিটে একটা শব্দের তিনরকম মানে বলা

৩। ২৬টি শব্দসম্বলিত বাক্য পুনরাবৃত্তি করা

৪। ছবি ব্যাখ্যা করা

৫। কোনো তথ্যকে ব্যাখ্যা করা।

বয়স্ক :

১। কাগজ কেটে পরীক্ষামূলক ভাবে সাজানো

২। কল্পনা দিয়ে একটা ত্রিকোণকে পুনরায় সাজানো

৩। বিমূর্ত শব্দসম্ভারকে ব্যাখ্যা ক'রে বলা

৪। প্রেসিডেণ্ট ও রাজার মধ্যে তফাত কি বলা ও তিনটি উদাহরণ দেওয়া

৫। কোনো একটা বিষয়বস্তুর সারমর্ম বলা।

বিভিন্ন বয়সের উপযোগী প্রশ্নাবলী পর্যায়ক্রমে কাঠিন্যের স্তর তৈরি ক'রে সাজিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি পরীক্ষার যে অভিনব পদ্ধতি বিনে (Binet) আবিষ্কার করেন, তা পরবর্তী কালে টারম্যান এবং মেরিল কর্তৃক আরো সংশোধিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। টারম্যান ছিলেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের; তাই তাঁর নাম অনুযায়ী এই স্কেলের নাম হয় 'Stanford revision'। এই সব পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে যে, বুদ্ধি অল্পবয়সে যতখানি বাড়ে, বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর ততখানি বাড়ে না। ১৪ বৎসর থেকে ১৬ বৎসরের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি একটা স্থায়ী সীমায় এসে পৌঁছায় বলে অনেক মনস্তত্ত্ববিদের ধারণা। Stanford-Binet-অভীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী সাধারণত নিম্নলিখিতভাবে পর্যায় বিভাগ গড়ে তোলা যায়:

বুদ্ধ্যঙ্ক	বুদ্ধির শ্রেণী-ভাগ	লোকসংখ্যার অনুপাত
১৪০—তদূর্ধ্ব	খুব উচ্চাঙ্গের বুদ্ধি (Very superior)	১.৫%
১২০—১৩৯	উচ্চাঙ্গের বুদ্ধি (Superior)	১১%
১১০—১১৯	উজ্জ্বল বুদ্ধি (Bright)	১৮%
৯০—১০৯	সাধারণ (Average)	৪৮%
৮০—৮৯	অনগ্রসর (Backward)	১৪%
৭০—৭৯	খুব অনগ্রসর Dullard)	৫%
০—৬৯	জড়ধী (Feeble-minded)	২.৫%

বুদ্ধির পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, মানুষের মধ্যে বুদ্ধ্যঙ্ক পর্যায়ক্রমে বেড়ে বেড়ে উঠে গেছে। গ্যারেট তাই বলেছেন—"There is no sharp change between normal and feeble-minded in so far as performance on intelligence tests is concerned, but rather a gradual progression from one to the other. The difference between the two groups is quantitative rather than qualitative. a matter of more available and more complex between resources rather than matter of a different kind of intellectual activity." বিনে প্রবর্তিত performence test-এর সমালোচনা করে কেউ কেউ বলেন যে, শিশুর কাজ অনেকখানি তার সামাজিক শিক্ষণ ও পরিবেশের উপর নির্ভর করে, তার আদিম মানসিক সম্পদের চেয়ে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা গেছে যে, বুদ্ধ্যঙ্কের উপর পরিবেশের প্রভাব অসামান্য প্রতিফলিত হয়েছে। বিনে অবশ্য দেখেছিলেন

যে, পরিবেশকে একেবারে অস্বীকার ক'রে তার অভীক্ষা আদিম মানসিক উপাদান পরিমাপের পক্ষে উপযুক্ত নয়। তিনি এই কথাই বলেছিলেন যে, দুটি শিশুর একই প্রকার মানসিক বয়সের সমতা তখনই বোঝা যায়, যখন একই প্রকার শিক্ষণের প্রভাব দু'জনের মধ্যে গিয়ে পড়ে। অনেকে বিনের সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁর পরীক্ষা দিয়ে কখনো শিশুর চরিত্রগত উপাদান পরিমাপ করা যায় না। বিনে প্রত্যুত্তরে বলেছেন যে, তাঁর কাজ হোলো সাধারণ বুদ্ধিরেখা (general intellectual level) পরিমাপ করা—চরিত্র বা অনুরক্তির উপাদান পরিমাপ নয়। চরিত্রগত উপাদান, স্মৃতিশক্তি, যুক্তি, শিক্ষণের ক্ষমতা, দক্ষতা প্রভৃতির জন্য আর এক প্রকার পরীক্ষার সাফল্যাঙ্ক পরিমাপ চার্ট বা "Psychograph"-এর সাহায্যে শিশুর বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে একটি দশ বৎসরের ১০৪ বুদ্ধ্যঙ্কের শিশুর বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় নিম্নলিখিতভাবে পাওয়া গিয়েছিল বলে গ্যারেট উল্লেখ করেছেন :
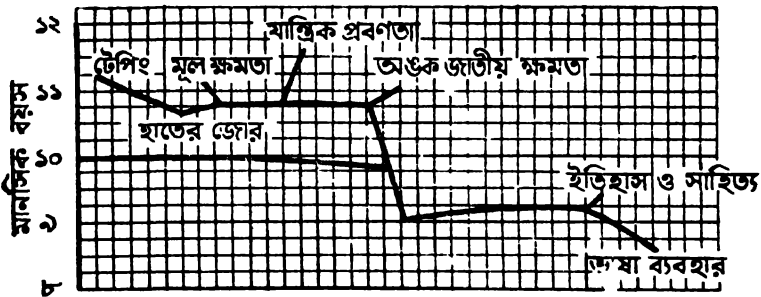
বুদ্ধির দক্ষতার পরিচয়

বিনে-সাইমন পরীক্ষা ততখানি মাত্র সার্থক, যতখানি তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগ করা হয়। স্বাভাবিক পরিবেশ থেকে যেসমস্ত শিশুরা আসে, তাদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা ভালোভাবে প্রয়োগ করা যায়। উপযুক্ত সাফল্য লাভ করতে হলে সাধারণ মানসিক শক্তি বিচারের সঙ্গে সঙ্গে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন, যাতে করে পরীক্ষার্থীর কোনো জায়গায় অস্বাভাবিকতা আছে কিনা তা ধরা যায়। যেখানে সম্ভব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবন, চিকিৎসাগত তথ্য, ঝোঁক বা প্রবণতা বা প্রচেষ্টা —সবকিছু অনুসন্ধান ক'রে দেখা উচিত। শিক্ষার্থী যদি শিশু হয়, তবে তার ভাবগত ও সামাজিক দিক বিচার ক'রে দেখা প্রয়োজন এবং কি ধরনের খেলাধূলা, অভ্যাস ও অনুরক্তিতে সে আনন্দ প্রকাশ করে, তা দেখা দরকার।

বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা এক জিনিস নয়। অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান হোলো বুদ্ধির ফল। বুদ্ধি বলতে আমরা কি বুঝি? আমরা দেখেছি যে, বিনে (Binet) বুদ্ধিকে একটি সাধারণ মানসিক ক্ষমতা ব'লে আখ্যা দিয়েছেন। আমরা বুদ্ধির সংজ্ঞা কিভাবে নির্দেশ করতে পারি? এ সম্বন্ধে ব্যবহৃত বিভিন্ন সংজ্ঞা উদ্ধৃত করে আমরা দেখবো বুদ্ধি বলতে সত্যিকার কি বোঝায়। আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, মানুষ কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতার সমষ্টি, না তার মানসিক জীবনের মধ্যে একটা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ঐক্য রয়েছে। এর উত্তর আমরা স্পীয়ারম্যান (Spearman), থর্নডাইক (Thorndike), থার্স্টস্টোন (Thurstone) প্রভৃতির সংজ্ঞায় পাই। স্পীয়ারম্যান বলেছেন যে, বুদ্ধি দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত, মানসিক শক্তি ও বিশেষ মানসিক শক্তি। একে তিনি বলেছেন 'G' এবং 'S'। এছাড়াও, তিনি এমন কতকগুলি group factors স্বীকার করেছেন, যা আমাদের বিভিন্ন ধরনের বুদ্ধিগত কাজে দেখা যায়। সেগুলি 'G' এর চেয়ে কম, 'S' এর চেয়ে বেশি। থর্নডাইক বলেছেন যে, আমাদের বুদ্ধিগত কাজ বিভিন্ন ধরনের সামগ্রিক প্যাটার্নের পথ খুলে দেয় আর এজন্য দায়ী আমাদের জটিল স্নায়ুতন্ত্র। এই প্যাটার্ন general factor সহ কতকগুলি group factor এবং specific factor এর সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। থার্স্টস্টোন দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধির মধ্যে নয়টি প্রাথমিক ক্ষমতা লুক্কায়িত আছে ; যেমন—(১) দর্শন, (২) অনুভূতি, (৩) যুক্তি, (৪) ভাষার স্বচ্ছতা, (৫) অঙ্ক, (৬) স্মৃতি, (৭) অবরোহ ক্ষমতা, (৮) আরোহ ক্ষমতা এবং (৯) কোনো সমস্যাকে সংহত করবার ক্ষমতা। স্টার্ন (Stern) বুদ্ধি বলতে বুঝেছেন ব্যক্তির সাধারণ ক্ষমতাকে—যা দিয়ে সে নূতন অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। টারম্যান (Terman) বলেছেন—"An individual is intelligent in proportion as he is able to carry on abstract thinking." ফ্রিম্যান (Freeman) দেখেছেন যে, বুদ্ধি হোলো এমন ক্ষমতা—যা দিয়ে আমরা কাজ করতে শিখি এবং ফলপ্রদ নূতন অবস্থাকে ব্যবহার করতে পারি। ক্যাটেল (Cattell) সাধারণ উপাদানের সঙ্গে ব্যক্তিত্ব-জনিত উপাদানের সম্পর্ক দেখেছেন। শারম্যান (Sherman) বলেছেন—"Intelligence is not a single mental process, but a practical concept connoting a group of complex mental Phenomenon."

বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এক জিনিস নয়—বুদ্ধির সংজ্ঞা

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, বুদ্ধাঙ্কের সীমা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে

অনেকখানি স্থায়ী। সাধারণত ১৪ থেকে ১৮ বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীদের বুদ্ধ্যঙ্ক আর বাড়ে না। এই বয়সের পূর্বে বুদ্ধির তারতম্য বেশ ঘটতে পারে, কিন্তু পরবর্তী বৎসরে শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যঙ্ক মোটামুটি একটি নির্দিষ্ট সীমায় এসে পৌছে যায়—যা আর সারাজীবনে সাধারণত পরিবর্তিত হয় না। মনস্তাত্ত্বিকরা দেখেছেন যে, শিক্ষণের দ্বারা বুদ্ধ্যঙ্ক বাড়ানো যায় অল্প বয়সে, কিন্তু বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই বুদ্ধির সীমা আর বর্ধিত হয় না। বরং চর্চার অভাবে তা নিম্নাভিমুখী হয়। পরবর্তী বৎসরে শিক্ষার্থী অভিজ্ঞতা লাভ করে—এই অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধি এক জিনিস নয়। অভিজ্ঞতা হোলো বুদ্ধির ফল মাত্র। সিরিল বার্ট (Cyril Burt) বুদ্ধিব সংজ্ঞা নির্দেশ করে বলেছেন যে, "Intelligence may be regarded as a function of the degree of organic complexity of which the child's attention is capable—of his capacity for noctic synthesis (intellectual organization)"। এব বিকাশ সেজন্য নিভব করে "an increase in the number, variety, originality and compactness of the relations which his mind can perceive and integrate into a cohernt whole"-এর উপর। এই বুদ্ধি শিশুর ক্ষেত্রে ৫—১০ পয়েন্ট পর্যন্ত তফাত হয় মাত্র। অনেক সময় পবিমাপ করার দোষে বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপের মধ্যে ভুল ধরা পড়ে।

বুদ্ধির সীমা

এতক্ষণ আমরা I. Q. বা বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার আমবা Spearman এর 'S' ('Special ability') বা বিশেষ ক্ষমতার কথা আলোচনা করবো। Faculty বা চেষ্টিত মনোবিজ্ঞান মানুষের মনকে কতকগুলি শক্তির সমাহার বলে মনে কবেছিল। এই মত অনুসারে আমাদের মনের কতকগুলি সাধারণ ও বিশেষ ক্ষমতা আছে; যেমন—স্মৃতি ও কল্পনা (সাধারণ ক্ষমতা) এবং ভাষাজ্ঞান, অঙ্কজ্ঞান ইত্যাদি (বিশেষ ক্ষমতা)। থনডাইকের মতে আমাদের ব্যবহারের খুব সংকীর্ণ উপাদানকে এই বিশেষ দক্ষতা আখ্যা দেওয়া যায়। দক্ষতা (ability) হোলো ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতার প্রকাশ। বিশেষ ক্ষমতার সমাহারেই গড়ে উঠে সাধারণ ক্ষমতা। তখন তাকে আমরা চরিত্রগত উপাদান হিসেবে বিচার ক'রে থাকি। স্পীয়ারম্যান তাঁর 'S' সূত্রে কোনো কাজের প্রতি বিশেষ দক্ষতার পরিচয়ের কথা বলেছেন, তবে এই বিশেষ দক্ষতার মধ্যেও সাধারণ মানসিক ক্ষমতা নিশ্চয় থাকে বলে তিনি মনে করেন। তবে তিনি এই 'S' কে বলেছেন

Ability বা দক্ষতা

খুব বিশেষ ধরনের বিশেষ ক্ষমতা—যা একটিমাত্র কাজে প্রকাশিত হোতে পারে। স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ গঠনের ফলে এই শক্তি জন্মে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে, যে-সব শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যঙ্ক খুব উচ্চাঙ্গের নয়—সাধারণ বা জড়ধী, তারা যান্ত্রিক ভাবে বিশেষভাবে বিশেষ ধরনের কাজ করতে পারে। এই ক্ষমতা পরিমাপের জন্য 'Performance Test' ব্যবহৃত হয়। এই 'Performance Test'-এ সাধারণত নিম্নলিখিত ধরনের অভীক্ষার উপাদান ব্যবহার করা হয়; যেমন—

(১) Wale peg Board-এর সাহায্যে চতুষ্কোণ পেরেককে বোর্ডের গর্তের মধ্যে লাগিয়ে দিতে বলা হয় পরীক্ষার্থীকে।
(২) Nets of Cube Test বা কিউব জ্ঞান পরীক্ষা।
(৩) Pintner এর Manikin Test
(৪) Mare এবং Fool Test
(৫) Sequin Form Board
(৬) Button Test
(৭) Picture Completion Test
(৮) Dearborn Form Board
(৯) Pass-Along Test
(১০) Cube Construction.

আমরা নিম্নে বুদ্ধ্যঙ্ক ও বিশেষ ক্ষমতা পরিমাপের বাস্তব পরীক্ষার নমুনা উপস্থাপন করছি :

ব্যক্তিগত বুদ্ধি পরীক্ষা (Individual Intelligence Test)

সমস্যা : টারম্যান ও মেরিল ব্যবহৃত ফার্ম 'এম' অনুযায়ী বুদ্ধ্যঙ্ক পরিমাপ করা।

পরীক্ষার্থীর নাম—শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স—১৫ বৎসর ৫ মাস, শ্রেণী—সপ্তম

উপাদান : ট্যারম্যান ও মেরিল ব্যবহৃত বুদ্ধ্যঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র, ঘড়ি, রেকর্ড বই ইত্যাদি।

পদ্ধতি : পরীক্ষার্থীকে সহজভাবে বসতে বলা হোলো এবং তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বন্ধুত্বপূর্ণভাবে কথাবার্তা বলা হোলো। তারপর তার উপর পরীক্ষা প্রয়োগ করা হোলো। তাকে ১১ বৎসরের উপযোগী প্রশ্ন ব'লে তারপর তাকে উচ্চমানের প্রশ্ন বলা হোলো, যতক্ষণ না সে অপরাগ হয়।

পরীক্ষা :

এগারো বৎসর :	পরিমাপসূচক চিহ্ন
১। যুক্তি অনুসন্ধান	+
২। পুতির মালা গণনা	+
৩। ভাষাগত দুর্বোধ্য প্রশ্ন (৫টির, তিনটি পারলো)	−
৪। বিমূর্ত শব্দ (৫টির ৪টি পারলো)	+
৫। সাদৃশ্য	+
৬। বাক্য—স্মৃতি থেকে বলা	+
	৫টি পারলো

এগারো বৎসরের পরীক্ষায় একটি প্রশ্ন না বলতে পারায় তাকে দশ বৎসরের উপযোগী প্রশ্ন করা হোলো।

দশ বৎসর :	
১। ব্লকগণনা	+
২। গল্প—স্মৃতি থেকে বলা	+
৩। ভাষাগত দুর্বোধ্য প্রশ্ন	+
৪। বিমূর্ত শব্দাবলী	+
৫। জন্তু সম্পর্কে শব্দার্থ	+
৬। ছয়টি সংখ্যা স্মৃতি থেকে বলা	+
	সমস্ত উপাদান পারলো

এই বৎসরের সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারায় "Basal age" নির্ণীত হোলো ১০ বৎসর।

বারো বৎসর :	
১। কোনো ডিজাইন মন থেকে বলা	+
২। ছবি দেখে উত্তর	+
৩। সংখ্যাপূরণ	−
৪। বিমূর্ত শব্দ	+
৫। ছবির দুর্বোধ্যতা ব্যাখ্যা	+
৬। ৫টি সংখ্যা স্মৃতি থেকে বলা	+
	৫টি পারলো

তের বৎসর :

১। অনুসন্ধান পরিকল্পনা। +
২। গল্প—স্মৃতি থেকে বল। −
৩। টুক্‌রো টুক্‌রো বাক্য জোড় লাগানো +
৪। বিমূর্ত শব্দ +
৫। তথ্য সংক্রান্ত সমস্যা +
৬। বাক্য—স্মৃতি থেকে বল। +

৫টি পারলো।

চৌদ্দ বৎসর :

১। যুক্তি +
২। ছবির দুর্বোধ্যতা +
৩। পূর্বাভিমুখীনতা −
৪। বিমূর্ত শব্দ −
৫। উদ্ভাবনী শক্তি +
৬। বিপরীত জিনিসের মধ্যে মিলনসাধন +

৪টি পাবলো

সাধারণ বয়স্ক পর্যায় :

১। বিমূর্ত শব্দ +
২। বিপরীত কল্পনা −
৩। উদ্ভাবনী শক্তি −
৪। সংক্ষেপিত ইঙ্গিত −
৫। পূর্বাভিমুখীনতা −
৬। প্রয়োজনীয় পার্থক্য −
৭। কাগজ কাটা +
৮। প্রবাদ −

৩টি পারলো।

উচ্চ পর্যায়ের বয়স্ক :

১। বিয়োগ সমাধান −
২। বিপরীত কল্পনা −
৩। প্রয়োজনীয় সাদৃশ্য −
৪। সংখ্যা উলোট-পালট −
৫। বাক্য পূরণ ও সংগঠন −
৬। বিপরীত জিনিসের মধ্যে মিলনসাধন −

কোনটি পারলো না

মানসিক বয়স হিসেব :

	Basal Value — ১০ বৎসর
এগারো বৎসরে	৫টি ঠিক × ২ মাস মূল্য = ১০ মাস
বারো ,,	৫টি ঠিক × ২ মাস মূল্য = ১০ মাস
তেরো ,,	৫টি ঠিক × ২ মাস মূল্য = ১০ মাস
চৌদ্দ ,,	৪টি ঠিক × ২ মাস মূল্য = ৮ মাস
সাধারণ বয়স্ক পর্যায় ,,	৩টি ঠিক × ২ মাস মূল্য = ৬ মাস
	৩ বৎসর ৮ মাস

মানসিক বয়স = ১০ বৎসর + ৩ বৎসর ৮ মাস

= ১৩ বৎসর ৮ মাস

জন্মগত বয়স = ১৫ বৎসর ৫ মাস

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{১৩ বৎসর ৮ মাস}}{\text{১৫ বৎসর ৫ মাস}} \times \text{১০০} = \text{৮৬}$$

দলগত বুদ্ধি পরীক্ষা (Group Intelligence Test)

সমস্যা : বিদ্যালয়ের ৪০ জন ছাত্রের (১২ – ১৬ বৎসর বয়সের) বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করার জন্য ডঃ জি. পাল ও শ্রীসমীর বসু (বিজ্ঞানকলেজ, মনস্তত্ত্ববিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) কর্তৃক নির্ধারিত অভীক্ষার ব্যবহার করা হোলো।

পদ্ধতি : এই ৪০ জন ছাত্র বিভিন্ন পরিবেশ থেকে এসেছে। তাদের প্রথম অভীক্ষা সম্পর্কে একটা পরিচয় ক'রে দেওয়ার পর সেই অভীক্ষা প্রয়োগ করা হোলো সমবেত ভাবে।

ফলাফল : বুদ্ধ্যঙ্ক বের করার পর সেই সংখ্যাগুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো (frequency distribution) হোলো। এরপর পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে ফলাফল হিসেব করা হোলো, যেমন—

পরিসংখ্যান পদ্ধতি

ফলাঙ্ক (*Scores*)	x	f	x^1	fx^1	fx^2
৬১—৬৫	৬৩·৫	০	৫	০	০
৫৬—৬০	৫৮·৫	১	৪	৪	১৬
৫১—৫০	৫৩·৫	৪	৩	১২	৩৬
৪৬—৫০	৪৮·৫	৬	২	১২	২৪
৪১—৪৫	৪৩·৫	২	১	২	২
৩৬—৪০	৩৮·৫	৫	০	০	০
৩১—৩৫	৩৩·৫	৮	–১	– ৮	৮
২৬—৩০	২৮·৫	৬	–২	–১২	২৪
২১—২৫	২৩·৫	৪	–৩	–১২	৩৬
১৬—২০	১৮·৫	৪	–৪	–১৬	৬৪
	সংখ্যা বা N = ৪০				২১০

গড় বা mean = আনুমানিক গড় = ৩৩.৫

C = − ১৮/৪০   ৩৩.৫ + (−৯/২০) × ৫

i = ৫   = ৩৩.৫ − ২.২৫

= ৩০.২৫

Standard Deviation (S. D.) = $\sqrt{\frac{\Sigma f x'^2}{N} - c^2} \times i$

= √(১২১০/৪০ − (−.২০২৫)) × ৫

= √(৫.২৫ + .২০২৫) × ৫

Mean = ৩০.২৫   = ১৬.৬৫

S. D. = ১৬.৬৫

উপরোক্ত **দলগত বুদ্ধির পরীক্ষার ফলকে** নিম্নলিখিতভাবে চিত্রের সাহায্যে দেখানো যায় :
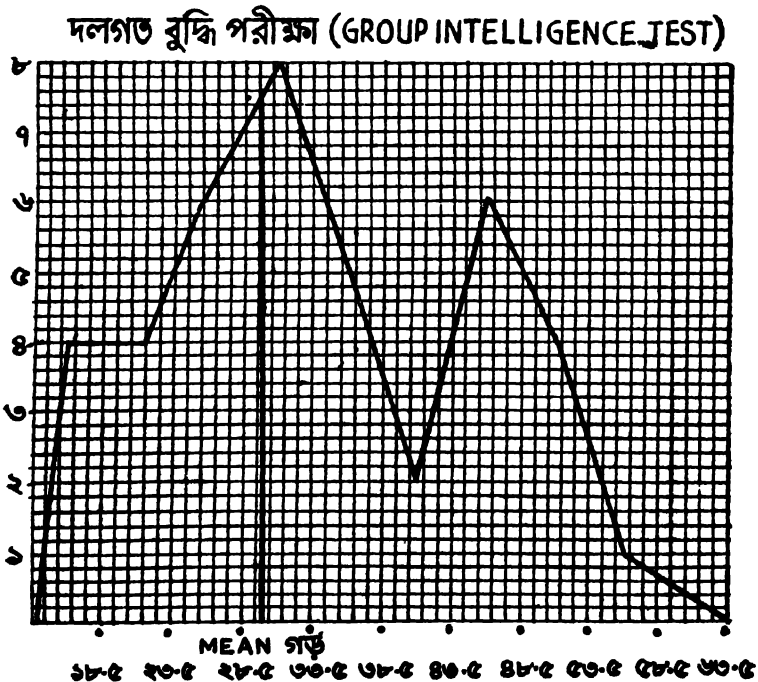
কৃতিত্বমূলক পরীক্ষা (Performance Test)

এই জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণাত্মক-সংশ্লেষণাত্মক দক্ষতা (analytico-synthetic ability) পরীক্ষা ক'রে দেখা হয়। ৩"×৪" ইঞ্চি-বিশিষ্ট ১৬টি ডিজাইন বিভিন্নভাবে এবং কোনাকুনি ভাবে বিভক্ত। এইগুলি ব্যবহার ক'রে পরপর কার্যসমাধা করতে বলা হয়। পরীক্ষার্থী যদি এইগুলি যথাযথ নির্দেশে না সাজাতে পারে, তবে তাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়। যতক্ষণ না সবগুলি পারছে ততক্ষণ এইভাবে পরীক্ষা চলে এবং ফলাফল লিপিবদ্ধ করা হয়। Koho-ব্যবহৃত Block Design পরীক্ষার দ্বারা এইভাবে সংশ্লেষণাত্মক-বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা পরিমাপ করা হয়, যেমন—

সংশ্লেষণাত্মক বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা পরিমাপ

ডিজাইন	সময়	সর্বোচ্চ নির্ধারিত সময়	সাফল্যাঙ্ক	ব্যবহৃত ব্লকের সংখ্যা
১	১৪	১'	২	৪
২	৩৭"	১½'	২	৪
৩	৮৩"	১'	২	৪
৪	৪২"	২'	২	৪
৫	—	২	৩	৪
৬	—	৩'	৩	৯
৭	—	৩'	৩	৯
৮	—	৩'	৪	১৬
৯	—	৩½'	৪	১৬
১০	—	—	৪	১৬
১১	—	—	৫	১৬
১২	—	—	৫	১৬
১৩	—	—	৫	১৬
১৪	—	—	৬	১৬
১৫	—	—	৬	১৬
১৬	—	—	৬	১৬

পূর্ব পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরীক্ষায় নিম্নলিখিত ধরনের ব্লক-ডিজাইন ব্যবহাব কবা হয়-

আমরা বিনে-সাইমন অভীক্ষার দ্বারা বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয় করেছি। কিন্তু কৃতিত্ব-মূলক এই জাতীয় পরীক্ষা সেই বিনে-সাইমন অভীক্ষার পরিবর্তে ব্যবহার হয় তা নয়, এই পরীক্ষা তার সঙ্গে ব্যবহার হয় কৃতিত্বমূলক দিক বিচার করার জন্য।
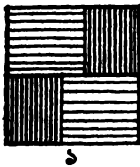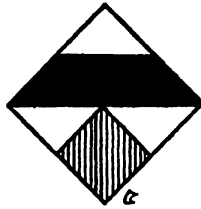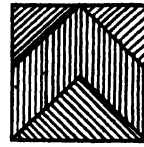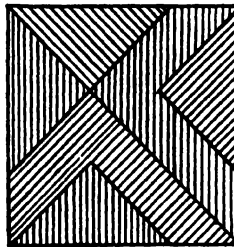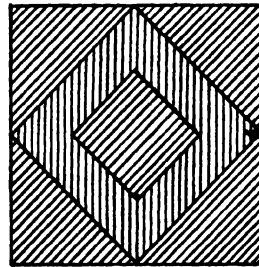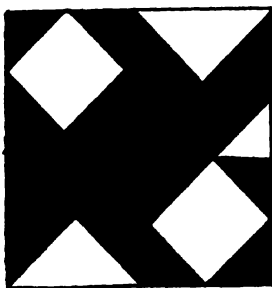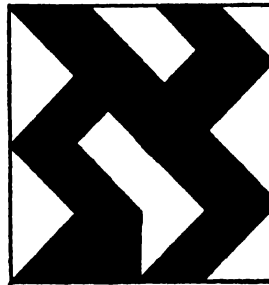
আলোচ্য পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী মাত্র৮টি সাফল্যাঙ্ক অর্জন করেছে এবং তারপর সে আর পারেনি। এর দ্বারা তার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় সম্পর্কে আমরা ধারণা পাই এবং একটি শ্রেণীর মধ্যে তার এই জাতীয় বিশেষ কৃতিত্ব কতখানি তা বিচার করতে পারি।

এই জাতীয় কৃতিত্বমূলক পরীক্ষায় Dearborn Form Board ব্যবহার করা হয়। চিত্রে এই জাতীয় বোর্ডের পরিচয় দেওয়া হোলো—

Dearborn Form Board-এর পরিচয় (১নং ক, ১নং খ)—

Dearborn Form Board-এর পরিচয়—(২নং ৩নং)

২ নং

৩ নং
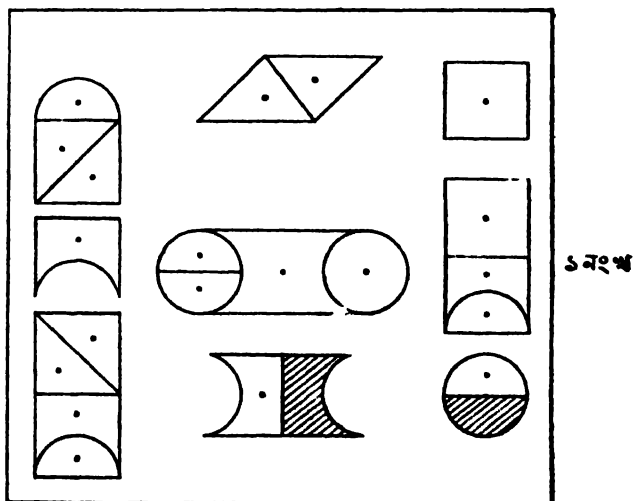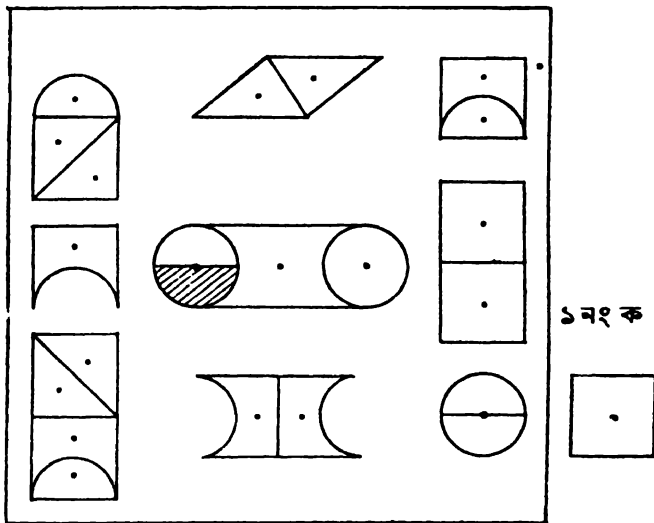
Dearborn Form Board-এর পরিচয় (৪নং)—
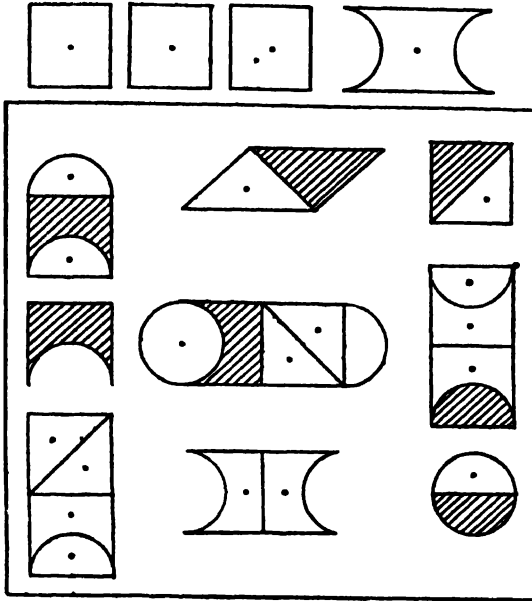
৪ নং

এই প্রকার পরীক্ষায় ১১·৫″×১৩·৫″ ইঞ্চি জাতীয় ফর্মবোর্ড পরীক্ষার্থীকে দেওয়া হয় এবং বোর্ডের সঙ্গে ছয় ধরনের insects দেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীর নিকট সেগুলি এলোমেলোভাবে দিয়ে সেগুলিকে সাজিয়ে দিতে বলা হয়:

ফলাফল:

বোর্ড	সরানোর সংখ্যা	সাফল্য	সময়	সাফল্যাঙ্ক
১	৩	৩	১৩″	৭
২	৫	৩	২১″	৬
৩	১১	২	৫০″	৫
৪	১৪	২	২৫″	৬

মোট সাফল্যাঙ্ক—২৪

সর্বোচ্চ সাফল্যাঙ্ক—৩৫

Pass-Along নামক পরীক্ষায় নয়টি বাক্সে অনেকগুলি ব্লক থাকে; তন্মধ্যে একটি লাল, অন্যগুলি নীল। বাক্সের একপ্রান্ত লাল রঙের, অন্য প্রান্ত নীল রঙের। বাক্সের মধ্য থেকে না সরিয়ে লাল ব্লককে লাল প্রান্তে নিয়ে যেতে বলা হয়

পরীক্ষার্থীকে। নয়টি Oblong Paste Board-এ ছবি থাকে এবং সেই অনুযায়ী লাল ব্লককে সাজাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলাফল নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়:

ফলাফল:

ছবি	সময়	কৃতিত্ব
১	৫″	২
২	২৪″	৩
৩	২৭″	৫
৪	৫০½″	৫
৫	৪২″	৫
৬	২'৪৮″	১
৭	২'৫৬″	১
৮	—	—
৯	—	—

সর্বমোট
২২ পয়েন্ট

এই Pass-Along Test-এ ব্যবহৃত চিত্র পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

অভীক্ষার প্রকারভেদ:

ব্যক্তিকে পরিমাপ করবার জন্য দু'ধরনের পরীক্ষা করা হয়, তার মধ্যে একটি হোলো Psychological test। এই Psychological test নানাভাবে ব্যবহার করা হয়, যেমন—স্মৃতিশক্তির পরিমাপ, ব্যক্তিত্ব পরিমাপ, বুদ্ধি পরীক্ষা প্রভৃতি। এর দ্বারা সব সময় যথার্থ ফল পাওয়া যাবে, তার কোনো মানে নেই। তবে এই জাতীয় পরীক্ষায় শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনেক জ্ঞাতব্য জিনিস জানতে পারা যায় এবং তার সম্পর্কে একটা সামগ্রিক পরিচয়ও পাওয়া যায়। যদিও মনস্তাত্ত্বিক অভীক্ষার দ্বারা নিখুঁত পরিমাপ পাওয়া যায় না, তবু পর্যবেক্ষণের জন্য একটা সূক্ষ্ম মানদণ্ড এর দ্বারা পাওয়া যায়। টমাস (Thomas) দেখিয়েছেন যে, অনেক সময় অভীক্ষাকে শুধুমাত্র ভ্রান্ত যুক্তির উপর দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। একে "engineering instruments for purposes of evaluation" হিসেবে গ্রহণ করা উচিত, নিছক "pragmatic bag of tricks" মনে করা ঠিক নয়। আর একপ্রকার অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, তাকে বলা হয় Psychometric test। এই পরীক্ষার ভিত্তি যান্ত্রিক মনস্তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মত আমাদের বুদ্ধি, অনুরক্তি, যান্ত্রিক অনুরক্তি, সমাজবোধ, সংগীত প্রতিভা প্রভৃতিকে মনের একক স্বাধীন কার্য ব'লে গণ্য করে এবং আমাদের মনকে খানিকটা পরিমাণে পরিমাপযোগ্য কতকগুলি এককের সমাহার রূপে গণ্য

করে। আমাদের মনের সুউচ্চ মানসিক কার্যকে প্রত্যক্ষভাবে পরিমাপ করা যায় না। তাই, মনের কতকগুলি একককে বিচার করতে হয়। বর্তমানে ব্যক্তিমনকে একটা functioning unit হিসেবে মনে করা হয়। গেস্টাল্ট মত বলে যে, মন বিশেষ ভাবে কোনো এক দিকে সামগ্রিক ভাবে কাজ করে। এই মতের উপর বর্তমানের অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নির্ভর করছে এবং সেই অনুযায়ী আমরা ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণের জন্য নানাপ্রকার অভীক্ষা ব্যবহার করছি। এছাড়া, Psychological experiment-এর সাহায্যে মানসিক পদ্ধতির বিশেষত্ব বের করা হয়। থার্স্টোন (Thurstone) একটি পরীক্ষায় সাত প্রকার মানসিক পদ্ধতি পরিমাপ করতে চেয়েছিলেন ; যেমন—(১) Verbal reasoning বা ভাষাগত যুক্তি, (২) অভীক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা, (৩) স্মৃতিশক্তি—শব্দ ও অঙ্ক মুখস্থ বলা, (৪) অবরোহ, (৫) ভাষা বলবার ক্ষিপ্রতা, (৬) অঙ্ক-সংক্রান্ত সুযোগ এবং (৭) সংবেদজ্ঞ গতি। আরো একপ্রকার অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, তার নাম Projective Test। এর দ্বারা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গুণগত উপাদান বের করা হয়। পরীক্ষার প্রশ্নাবলী এমনভাবে তৈরি করা হয়, যার সাহায্যে ব্যক্তি তার নিছক ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে অনেক উত্তর দেয়। এই জাতীয় পরীক্ষা পরিমাপ যন্ত্রের মতো নিখুঁত না হলেও এর সাহায্যে ব্যক্তির অনেক সমস্যা বুঝতে পারা যায়।

অভীক্ষার ব্যবহার :
১। Psychological Test
২। Psychological Experiment
৩। Psychometric Test
৪। Projective Test

দক্ষতা ও অনুরক্তি (Abilities and Interests) :

আমরা আলোচনা ক'রে দেখেছি যে, মানুষের বুদ্ধি একটা সাধারণ শক্তি। এই সাধারণ শক্তির সাহায্যে আমরা পুরাতন অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ করি এবং নূতন অভিজ্ঞতা আহরণে সক্ষম হই। আমরা এই শক্তির সাহায্যে পুরাতন অভিজ্ঞতা থেকে সূত্র সংগ্রহ ক'রে নূতন নূতন উদ্ভাবনী শক্তির দিকে ধাবিত হই। আমাদের এই বুদ্ধির প্রকাশ নানাভাবে প্রকাশিত হয় এবং সেগুলি আমাদের মনের সুউচ্চ ক্ষমতাকে প্রকাশ করে। বিনে তাঁর পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নানাপ্রকার test-item গ্রহণ ক'রে মনের বিভিন্ন দিক বিচার ক'রে বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকরা শুধু মনের এই সাধারণ শক্তি পরিমাপের জন্য বুদ্ধি পরীক্ষার উপর নির্ভর করেন না। আমাদের সকলেরই কিছু-না-কিছু বুদ্ধি আছেই। কিন্তু, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করে না, অথচ নানা জীবিকায় নিযুক্ত থাকে, তাদেরও তো বুদ্ধি রয়েছে। এমনও দেখা যায় যে, বুদ্ধ্যঙ্ক নির্ণয়ের দ্বারা, যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম বলে প্রমাণিত হচ্ছে তারা জীবনের অন্যান্য

বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা (ability) দেখাতে সমর্থ হচ্ছে। এ সব কারণে মনস্তাত্ত্বিকরা Performance Test ব্যবহার করেন। এই Performance Test verbal ও non-verbal—দুই ধরনেরই হয়। সিরিলবার্ট (Cyril Burt) দেখেছিলেন যে, বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে মানুষ বিভিন্ন পেশার উপযোগী হয়; যেমন—

৭০-৭৫ বুদ্ধ্যঙ্ক—প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত উপযোগী এবং সাধারণ নৈপুণ্যপূর্ণ হাতের কাজ করতে সক্ষম হয়।

৮৫-১১৫ বুদ্ধ্যঙ্ক—নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যন্ত উপযোগী দক্ষ কাজ, সাধারণ ব্যবসা প্রভৃতি কাজে অনুরক্তি প্রকাশ করে।

১১৫-১৩০ বুদ্ধ্যঙ্ক—কারিগর, শিক্ষক, কেরানী প্রভৃতিরা এই পর্যায়ে পড়েন। এই স্তরের শিক্ষার্থীরা উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের উপযোগী হয়।

১৩০-১৫০ বুদ্ধ্যঙ্ক—এই স্তরের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের উপযোগী এবং শিক্ষকতা, ওকালতি, দেশশাসন, উচ্চ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতির উপযোগী হয়।

দক্ষতা ও অনুরক্তি অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, বিশেষ ভাবে যত্ন নেওয়া, বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির উপযোগী কি না বিচার করা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনে আজ দেশে বিদেশে vocational guidance এবং educational guidance-এর ব্যবস্থাপনা হচ্ছে। এই জাতীয় ব্যবস্থাপনা বিগত যুদ্ধের সময় খুব কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে গৃহীত হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রবেশের সময় ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা করা হয়। নানাপ্রকার objective type-এর প্রশ্নের দ্বারা সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়। কার কোন দিকে বৃত্তিগত ঝোঁক আছে তা নির্ধারণের জন্য নানাপ্রকার Performance Test বা Abilities Test বা Mental Test ব্যবহার করা হয়। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার (objective test) দ্বারা পরীক্ষার্থীর সাধারণ বুদ্ধি বিচার করা হয় point-scale অনুপাতে এক-একটি বিশেষ নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দানের মাধ্যমে। নিম্নে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার (Objective Test) একটি নমুনা দেওয়া হ'লো। শাজাহানের উপর বেশীর ভাগ প্রশ্নাবলী রচিত হয়েছে।

তারিখ—১৭।৬।৬৩

নাম—শ্রীমধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

বয়স—১৩

বিদ্যালয়—শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যালয়

শ্রেণী—সপ্তম

প্রশ্নাবলী

(ক) যে প্রশ্নগুলির উত্তর তোমার নিকট সঠিক বিবেচিত হবে, তাতে দাগ দাও :

১। শাহ্জাহানের আমলে
শিল্পোন্নতির কারণ—সমাজ ব্যবস্থা, আধ্যাত্মিকতা, আভ্যন্তরীণ শান্তি

২। তাজমহল স্মৃতিসৌধের
উপর প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল—গ্রীক হিন্দু-পারসীক হিন্দু-জৈন

৩। শাহজাহানের শিল্পপ্রীতির
নিদর্শন হোলো— হীরাঝিল মতিঝিল দেওয়ানই-মুলুক

৪। পারস্যবাজ নাদির শাহ
দিল্লী লুণ্ঠন করেন— ১৭৩৫ খ্রী: ১৭৩৯ খ্রী: ১৬৩২ খ্রী:

(খ) যথাযথভাবে সাজাইয়া লিখ :

১। তাজমহল বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :
তাজমহল একবিন্দু কপোলতলে নয়নের জল কালের শুভ্র এ তাজমহল সমুজ্জ্বল।

২। ময়ূর-সিংহাসন মহারাণী ভিক্টোরিয়া পেয়েছিলেন আহম্মদ শাহের নিকট, দলীপ পেয়েছিলেন নাদির শাহের নিকট, রণজিৎ সিংহ পেয়েছিলেন শাহসুজার নিকট।

৩। বৌদ্ধচিত্রে বিলাসের ক্রীড়া ও আধ্যাত্মিক আবেশ মোগলচিত্রে শান্তির ভাব ও ঐশ্বর্যের মোহ।

(গ) শূণ্যস্থান পূরণ কর :

১। তাজমহল নির্মাণ করতে — মুদ্রা — বৎসর লেগেছিল।

২। — বৎসরে — নির্মাণ করেন বেবাদল খাঁ।

৩। শাহজাহানের — শোভাবর্ধন করতো —।

৪। — স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পশ্চাতে ছিল —।

৫। আকবরের ছিল উদার ধর্মনীতি শাহজাহানের — —।

(ঘ) যথাযথ উত্তর দাও :

১। তাজমহল নির্মাণ কে করেছিলেন ?—

২। ফরাসী পর্যটক কে কে এসেছিলেন ? — —

৩। ভারতবর্ষ বিদেশীর নিকট কেন নতি স্বীকার করেছিল ? — —

আজকাল পরীক্ষা পদ্ধতিরও (examinations and tests) দ্রুত সংস্কার হচ্ছে। বিদ্যালয়ে Cumulative Record Card প্রথা চালু ক'রে নানা কাজের মধ্য দিয়ে কি ভাবে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব ও অনুরক্তিমূলক মনোভাব প্রকাশ পায় তা নির্ণয় করা হচ্ছে। Cumulative Record Card-এ সাধারণ বুদ্ধির পরিচয়, শিক্ষাগত উন্নতি (educational attainments), বৃত্তিগত ঝোঁক (vocational bias), নাচ, গান, বিতর্ক, খেলাধূলা, সমাজসেবা, প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতা প্রভৃতি নানাপ্রকার সহপাঠ্যসূচী কর্মবৃত্তির যোগ্যতা তালিকাবদ্ধ করা হয়। এই তালিকার সাহায্যে কার কোন দিকে বিশেষ দক্ষতা ও ঝোঁক রয়েছে তা দীর্ঘ সময় বিচার বিবেচনা ক'রে শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচনে পথনির্দেশ (guidance) করা হয়। Psychograph-এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর অভিরুচি (aptitude) তালিকাবদ্ধ করা হয়। ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী কোন্ জাতীয় জীবিকা বা শিক্ষার পথ গ্রহণ করবে এইজন্য special এবং differential aptitude test প্রয়োগ করা হয়।

দক্ষতা ও অনুরক্তি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা

পরীক্ষা ও অভীক্ষা (Examinations and Tests) :

পুরাতন শিক্ষাব্যবস্থায় শুধুমাত্র Essay Type-এর পরীক্ষা গৃহীত হোতো। শিক্ষার্থী বিশেষ অধীত বিষয়ে যে জ্ঞান অর্জন করতেন তার উপর রচনামূলক কতকগুলি সুনির্বাচিত প্রশ্ন করা হোতো। কিন্তু, এ জাতীয় প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিশেষ কোনো মানসিক শক্তি, দক্ষতা, অভিরুচি প্রভৃতির পরিমাপ ক'রে তার সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের মূল্য দেওয়া হোতো না। রচনাধর্মী পরীক্ষার নানা ত্রুটিবিচ্যুতি আমরা "পরীক্ষাপদ্ধতি" সংক্রান্ত অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এই পরীক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নত ক'রে যাতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপকারী পরীক্ষা চালু করা হয় তজ্জন্য মনস্তাত্ত্বিকরা ও শিক্ষাবিদেরা আগ্রহ দেখিয়েছেন। New Type প্রশ্নাবলীর সাহায্যে পরীক্ষা ব্যবস্থার গতানুগতিকতা দূর করা হচ্ছে। সাধারণত objective বা নৈর্ব্যক্তিক ধরনের প্রশ্নাবলীর সাহায্যে শিক্ষার্থীকে বিশেষ চিন্তা ক'রে এক একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। প্রশ্নের উত্তর সঠিক হ'লে নম্বর সঠিক পাওয়া যায়। এতে সময় বাঁচে, নম্বর দেওয়ার সুবিধা হয়, বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ সম্ভব হয়, চিন্তা করার শক্তির প্রয়োজন হয়। এই জাতীয় অভীক্ষা তখনই বিশ্বস্ত হয়—যখন একই ধরনের বা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীর উপর তা একই প্রকার ফল প্রদান করে। নৈর্ব্যক্তিক বুদ্ধিগত পরীক্ষায় সাধারণত এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য থাকে :

(১) Validity বা সত্যতা
(২) Accuracy বা নিখুঁত ঐক্য
(৩) Reliability বা বিশ্বস্ততা
(৪) Objectivity বা নৈর্ব্যক্তিকতা
(৫) সময় ও প্রচেষ্টার সদব্যবহার
(৬) নির্দিষ্ট Norm বা মানদণ্ড।

এই জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর জ্ঞান যথাযথ ভাবে পরিমাপ করা হয় এবং নূতন নূতন জ্ঞান অর্জনে প্রেরণা পাওয়া যায়।

উন্নত ধরনের পরিমাপ (Improved Types of Assessment) :

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর যথার্থ ব্যক্তিত্বের মূল্য পরিমাপ করবার জন্য নিম্নবর্ণিত নূতন ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(১) পরীক্ষার প্রশ্নাবলী যতদূর সম্ভব নৈর্ব্যক্তিক (objective) এবং সুনির্দিষ্ট (standardized) হবে। নিম্নপর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও রচনামুখী পরীক্ষা গ্রহণ ক'রে শিক্ষাগত উন্নতি (educational attainment) পরিমাপ করা দরকার। যাদের শিক্ষাগত উন্নতি ভালো হচ্ছে, তাদের জন্য যেমন বিশেষ যত্ন প্রয়োজন, তেমনি যারা জড়নী বা নিম্নপর্যায়ের, তাদের জন্যও বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

(২) প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট Group Intelligence প্রয়োগ ক'রে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক (I. D.) পরিমাপ করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত বুদ্ধি পরীক্ষা ও দলগত বুদ্ধি পরীক্ষা—উভয় রকম পরীক্ষা প্রয়োগ ক'রে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তি পরিমাপ করা প্রয়োজন। এজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে Psychological Bureau গঠন করা প্রয়োজন। সুখের কথা আমাদের দেশে এই জাতীয় শিক্ষক তৈয়ারীর জন্য Career Master Course প্রবর্তিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তি অনুসারে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শ্রেণীবিভাগ ক'রে তাদের বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। Group Intelligence Test থেকে আহৃত ফল অনুসারে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের Mean, Median, Mode, S. D., Percentile প্রভৃতি বের ক'রে শিক্ষক তাঁর শিক্ষাদানকে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ক'রে তুলতে পারেন।

(৩) প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিগত ঝোঁক পরিমাপের জন্য Verbal ও Con-verbal Performance Test প্রয়োগ ক'রে Psychograph-এর সাহায্যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা দরকার, কার কোন দিকে বিশেষ দক্ষতা আছে তা পরিমাপের জন্য Dearborn Form Board, Koho-এর

Block Design, Pass Along Test, Mechanical Aptitude Test প্রভৃতি প্রয়োগ সমীচীন।

(৪) ব্যক্তিত্ব পরিমাপের জন্য Case history method, Rorchach Test, Thermatic Apperception Test, Handwriting Test, Personal Data Sheet, Questionnaire on Neurotic Symptoms, Free Association Test, Word Association Test প্রভৃতি প্রয়োগ ক'রে তার ফলাফল লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

(৫) ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক সাধারণ ক্ষমতা Psychological Test এবং Psychological experiment-এর সাহায্যে পরিমাপ করা প্রয়োজন। এজন্য Memory span, Illusion Table, Reaction Time, মনোযোগ পরিমাপের যন্ত্র (Tachistoscope) প্রভৃতি ব্যবহার ক'রে তথ্য আহরণ করা প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট ফর্মে এই সমস্ত পরীক্ষালব্ধ ফলাফল লিপিবদ্ধ হ'লে শিক্ষার্থী সম্বন্ধে একটা সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায় এবং তার ফলে সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির প্রকৃত স্থান নির্দেশ ক'রে তাকে উপযুক্ত উদ্দেশ্যমূলক নির্দেশ দান করা যায়।

শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত পথনির্দেশ ও নির্বাচন :

শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমন Vocational Educational Test ব্যবহার করতে হবে, যা দিয়ে আমরা বর্তমানের সাধারণ ক্ষমতা বা দক্ষতা পরিমাপ করতে পারি এবং ভবিষ্যতের জন্য পথনির্দেশ করতে পারি। ফার্নার (Farner) বলেছেন যে, এজন্য কোনো সন্তোষজনক মানদণ্ড নির্ণয় করা এবং তার ফল বাস্তবক্ষেত্রে মিলিয়ে দেখা অত্যন্ত শক্ত কাজ। বিংহাম (Bingham) অনুরক্তি বা Aptitude বলতে বুঝেছেন এমন সমস্ত জিনিস যা দিয়ে শিক্ষার্থীর সাধারণ যোগ্যতা, তার জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা ও দক্ষতা আহরণের ক্ষিপ্রতা, সাধারণ অনুরক্তিতে দক্ষতা প্রয়োগে ক্ষিপ্রতা প্রভৃতি গুণাবলী পরিমাপ করা হয়। ফ্রিম্যান (Freeman) দেখিয়েছেন যে, ability পরিমাপ ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র বিশেষ শিক্ষণের ফল দেখি তা নয়। উদাহরণস্বরূপ কারো যদি কোনো যান্ত্রিক বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তবে তা শুধু শিক্ষণের ফল তা নয়, এর দ্বারা বোঝায় এমন এক ability যা বিশেষ শিক্ষণের দ্বারা মাত্র গড়ে তোলা যায়। তাঁর মতে aptitude হোলো কোনো faculty বা unitary mental entity নয়, তা'হোলো dynamic trends of the whole personality—অনুরক্তি

সঠিক শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

কোনো শক্তি বা শক্তির সমাহার নয়, তা মনের কোনো একক ক্ষমতাও নয়, তা সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের গতিশীল ধারাকেই প্রকাশ করে মাত্র। সাধারণভাবে বলা হয় যে, আমাদের মনেরই এমন একটা গতিশীল সংগঠন আছে যার জন্য কেহ যান্ত্রিক কাজ পারে, কেহ কেরানীর কাজ পারে বা অন্য কোনো কাজ পারে। ভার্নন (Vernon) লিখেছেন যে, "Abilities become so diversified and interests, work attitudes, and temperament traits are so influential, that we can hardly hope to establish any simple scheme of mental organization." তিনি আরো বলেছেন যে, Ability implies the existence of a group বা category of performances which correlate highly with one another, and which are relatively distinct." তিনি বলেছেন যে, আমরা যদি খুব শক্তভাবে Factor Theory ('G' ও 'S') মেনে নিই, তাহলে অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত নির্দেশ দান কঠিন হবে। পথনির্দেশকে যদি বিজ্ঞানসম্মত করতে হয় তবে যেমন সাধারণ বুদ্ধি ও বিশেষ দক্ষতার পরিমাপ করতে হবে তেমনি বিভিন্ন ধরনের বিশেষ দক্ষতার পরিচয়মূলক অভীক্ষা প্রয়োগ করে তা নির্ধারণের সুযোগ দিতে হবে শিক্ষার্থীকে। আমরা সঠিকভাবে guidance বা পথনির্দেশনা ক'রে নির্বাচন (selection) করবার অফুরন্ত সুযোগ দিতে পারি মাত্র। বিভিন্ন ধরনের উপাদান আবিষ্কার ক'রে সেই মত অফুরন্ত নির্বাচনের সুযোগ ব্যবস্থা করাই হবে বিজ্ঞানসম্মত পন্থা। বর্তমান মনস্তাত্ত্বিকরা তাই সঠিক পথনির্দেশনা ক'রে নির্বাচনের সুযোগের ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দেন। শুধুমাত্র অভীক্ষা প্রয়োগ ক'রে তার ফলাফলের উপর পথনির্দেশ করা ঠিক নয়। Oakley এবং Macrae সেইজন্য সামগ্রিক ভাবে শিশুকে বিচার করতে বলেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ত্ববিভাগ (প্রয়োগশাখা) নিম্নলিখিত রীতিতে ব্যক্তিত্বকে পরিমাপ করতে চেয়েছেন যা খুবই সার্থক ও ফলপ্রদ ব'লে বিবেচিত হয়েছে—

ব্যক্তি ও পরিমাপের পদ্ধতি ও তার প্রয়োগ

(১) **বুদ্ধিঃ** বিমূর্ত বুদ্ধি (Abstract Intelligence) পরিমাপের জন্য Verbal test প্রয়োগ করা হয় এবং এর জন্য পুঁতির মালা, রঙীন বিডস প্রভৃতি উপাদান ব্যবহার করা হয় বিশেষ ক'রে নিম্নপর্যায়ের শিশুদের জন্য। ভাষার মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের শিশুদের বিমূর্ত বুদ্ধি পরিমাপ করা হয়। মূর্তবুদ্ধি (Concrete Intelligence) পরিমাপ করা হয় Dearborn Form Board, Pass-Along Test, Koh-এর Block-Design Test প্রভৃতির সাহায্যে।

(২) **বিশেষ দক্ষতা** (Special Abilities) : সাধারণবুদ্ধি ছাড়া মানুষের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা থাকতে পারে। মনস্তাত্ত্বিকরা বিভিন্ন পেশা বিশ্লেষণ ক'রে পরীক্ষা-অভীক্ষার সাহায্যে সেই সমস্ত দক্ষতা নির্ধারণ করতে পারেন। যান্ত্রিক দক্ষতা (mechanical ability) পরিমাপ করা হয় কতকগুলি অসংলগ্ন অংশকে পূরণ করার পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক কর্মক্ষমতা (manual ability) পরিমাপ করা হয় শিক্ষার্থীকে কতকগুলি কাঠের ব্লক নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় ও সময় ব্যবধানে সাজিয়ে ফেলতে বলে। শারীরিক ক্ষিপ্রকারিতা (Manual dexterity) পরিমাপ করা হয় কতকগুলি কাজ নিষ্পন্ন করার গতি বিচার করে। সংগঠনমূলক দক্ষতা (constructional ability) পরিমাপ করা হয় কাঠের কতকগুলি টুকরো দিয়ে কোনো পরিকল্পনার একটি জিনিস গড়ে তুলবার জন্য শিক্ষার্থীকে দিয়ে।

(৩) **মেজাজ** : ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য থাকে। তাই ব্যক্তির মেজাজ পরীক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ ধরনের অভীক্ষা প্রয়োগ করা হয় :

(ক) Subjective paired questions—ত্রিশটি paired প্রশ্নাবলীর সাহায্যে পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বিষয়ে অনেককিছু জানবার চেষ্টা করা হয়।

(খ) Extrovert-Introvert Test—পরীক্ষার্থী অন্তর্বৃত্ত না বহির্বৃত্ত তা পরিমাপ করবার জন্য প্রশ্নাবলী করা হয়।

(গ) Word Association Test : পরীক্ষার্থীকে একশত শব্দ বলা হয় এবং তার প্রত্যেকটির উত্তর চাওয়া হয়। সময় গণনা করে দেখা হয় যে, ব্যক্তির মধ্যে কোন কোন প্রকারের সমস্যা বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরীক্ষার্থীর স্থিতিশীলতা বা অস্থিরতা, উদ্বায়ুসঞ্জাত কোনো সম্ভাবনা, দুর্ঘটনাজনিত প্রবণতা (accident proneness) প্রভৃতি পরিমাপ করা হয়।

(ঘ) Neurotic questionnaire : কতকগুলি প্রশ্নাবলীর সাহায্যে উদ্বায়ু সঞ্জাত কোনো সমস্যা পরীক্ষার্থীর আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এই পরীক্ষার্থীর মানসিক গড়ন সম্বন্ধে জানতে পারা যায়।

(৪) **শিক্ষাগত দক্ষতা** (Scholastic ability) : ব্যক্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা কতখানি তা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের বিচার ক'রে তালিকাভুক্ত করা হয়। তাছাড়া, বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে দক্ষতা কতখানি তাও বিচার করা হয়।

(৫) মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (Psychological Traits) : ভার্নিয়ার ক্রনোস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার্থীর Reaction Time বা প্রতিক্রিয়ার সময় গণনা ক'রে বলা হয় যে, পরীক্ষার্থী পুরুষধর্মী (mascular type), না অনুভূতিপ্রবণ (sensorial type), না শ্রবণধর্মী (auditory type)।

(৬) শারীরিক উপাদান (Physical Traits) : পরীক্ষার্থীর চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা চিকিৎসাপদ্ধতির সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

(৭) Interview-পদ্ধতি : এই পদ্ধতির সাহায্যে বংশগতির পরিচয়, অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়, শরীর ও মনের বিকাশের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি নানাপ্রকার তথ্য জানবার চেষ্টা হয়।

(৮) জ্ঞাতব্যবিষয় পর্যালোচনা (Case Conference) : মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক, শিক্ষক প্রভৃতি সকলে পরীক্ষার্থীর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে যে ধারণা পেয়েছেন তা সঠিকভাবে পর্যালোচনা করার জন্য এঁদের মধ্যে বৈঠকী আলোচনা করা হয়।

সার সংক্ষেপ

ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির পার্থক্য রয়েছে। তাই, প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ ধরনের কি কি গুণাবলী আছে তা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এজন্য মনস্তাত্ত্বিকরা ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নের জন্য নানা পরীক্ষা-অভীক্ষা প্রয়োগ করেছেন; যেমন—বুদ্ধি পরীক্ষা, বিশেষ দক্ষতা পরীক্ষা, যান্ত্রিক দক্ষতা পরীক্ষা প্রভৃতি। বর্তমানে ব্যক্তির মূল্যবোধ বিচার ক'রে তাকে সঠিকভাবে শিক্ষাগত বৃত্তিগত নির্দেশদানের ব্যবস্থাপনা মনস্তাত্ত্বিকরা স্বীকার করেছেন। আমরা আলোচ্য অধ্যায়ে সেই সমস্ত ব্যবস্থাপনা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

Questions

1. Discuss the various measures for assessing individuals.
2. Define intelligence. Discuss how general intelligence and special abilities can be measured.
3. Discuss various types of assessment used in modern Psychology for assessing the personality of a child.
4. Discuss the utility of Intelligence Test, Performance Test and Modern Objective Tests in education.

References :

1. Garrett—Great Experiments in Psychology,
2. Munn—Psychology.
3. Cyril Burt—The Young Delinquent.
4. Spearman—The Nature of Intelligence.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পরিসংখ্যান

(Statistics in Education)

সাধারণ পরিমাপ (Measures in General) :

আমরা যখন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোনো কোনো গুণ অনুসারে ভাগ ক'রে থাকি, তখন তাকে আমরা বলি সাধারণ পরিমাপ (measures in general)। অঙ্কের মতন সংখ্যা দিয়ে এই পরিমাপ করা কঠিন হয়। কেননা, এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির পার্থক্য পরিমাণগত ভাবে নির্ণয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। কোনো প্রকার জানা এককের (unit) সাহায্যে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। আমরা ব্যক্তিসমূহের পরিমাপকে scores বা সাফল্যাঙ্ক হিসেবে প্রকাশ ক'রে থাকি এবং এজন্য আমরা যে physical scales তৈরি করি তাতে ব্যবহৃত সাফল্যাঙ্ককে (scores) আমরা সাধারণত বলে থাকি measures বা সাধারণ মাপ। Variables বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত বিশেষত্ব বা উপাদান—যে গুলিকে scores বা measures হিসেবে প্রকাশ করা চলে।

সাফল্যাঙ্ক বিচার

মানসিক এবং সামাজিক চরিত্রগত উপাদান পরিমাপের ক্ষেত্রে Variables নিরবচ্ছিন্ন পর্যায় বা Continuous series ধরনের হয়। এই Continuous seriesকে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। বুদ্ধির পরিমাপের ক্ষেত্রে কিংবা উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা এইরূপ Continuous series-এর ব্যবহার দেখতে পাই। যখন কোনো Continuous series-এর মধ্যে ফাঁক দেখা যায় তখন বুঝতে হবে যে, এই পরিমাপ অধিকসংখ্যক ক্ষেত্রকে পরিমাপ করতে পারছে না, বা অন্য কোনো প্রকার ত্রুটিবিচ্যুতি এর মধ্যে রয়ে গেছে। একটি অঞ্চলের পারিবারিক পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, গড়ে তাদের ৫'৫৭টি শিশু রয়েছে, যদিও এই সংখ্যাটি ৫ এবং ৬-এর মধ্যবর্তী একটি ফাঁক সৃষ্টি করেছে। এরূপ ধরনের series-কে discrete বা discontinuous series বলা হয়। তবে আনন্দের কথা এই যে, মনস্তাত্ত্বিক পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে আমরা প্রায়ই Continuous series দেখতে পাই।

পরিমাপের স্কেল

এই Continuous series-এ প্রকৃত পক্ষে scores বলতে কি বোঝায় তা জানা দরকার। একটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে একটি scores বা সাফল্যাঙ্ক মানে দুইটি সীমার একক বা Unit দূরত্ব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, একটি মনস্তাত্ত্বিক বুদ্ধি পরীক্ষায় ১৫০ Score মানে তা ১৪৯'৫ ও ১৫০'৫-এর মধ্যবর্তী এবং ১৫০ হোলো এই দুইয়ের মধ্যবর্তী বিন্দু।
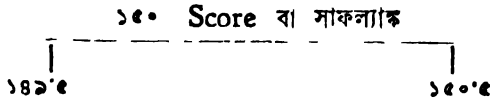
একটি একক সাফল্যাঙ্ক মানে ০'৫ নিম্ন থেকে ০'৫ উর্ধ্ব পর্যন্ত Unit-কে বোঝায়। একজন ব্যক্তি একটি পরীক্ষায় ১৫০ পেয়েছে—এর অর্থ পরিসংখ্যানের ভাষায় সে ১৫০ পেয়েছে কিন্তু ১৫১ পায়নি। এক্ষেত্রে ১৫০ মূল্যের অর্থ ১৫০ থেকে ১৫১-এর মধ্যবর্তী যে কোনো মূল্য। এইজন্য এক্ষেত্রে আমরা মধ্যবিন্দু ধরে বলতে পারি ১৫০'৫ হোলো সঠিক মধ্যবর্তী সংখ্যা।

সাফল্যাঙ্কের একক বা Unit

উভয়ভাবেই আমরা যদি score-কে ব্যাখ্যা করি তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। তবে কাজের সুবিধার জন্য প্রথম মতটিই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং তা বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেখা গেছে।

পৌনঃপুন্য বিস্তার বা Frequency Distribution :

পৌনঃপুন্য বিস্তার বা Frequency Distribution পরীক্ষা ক'রে আমরা যে সমস্ত উপাত্ত (data) পাই সেগুলি সুন্দর ভাবে না-সাজানো পর্যন্ত সেগুলির প্রকৃত কোনো তাৎপর্য নেই। সেইজন্য সেই সমস্ত measure বা score-কে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করে ফেলা উচিত।

পৌনঃপুন্য বিস্তার পরিমাপের নিয়ম

(১) সর্বাপেক্ষা বড় এবং সর্বাপেক্ষা ছোটো সাফল্যাঙ্ক (scores)-এর range বা দূরত্ব বা ফাঁক নির্ণয় করা দরকার।

(২) শ্রেণীবিভাগের জন্য কয়টি নির্দিষ্ট ভাগে এবং কি আকারে তা সাজিযে নিতে হবে তা নির্ণয করা দরকাব।

(৩) যথার্থ শ্রেণী-দূরত্বেব মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন সাফল্যাঙ্ককে সুবিন্যস্ত ভাবে ও সুশৃঙ্খলভাবে সাজিযে ফেলা দবকাব।

নিম্নেব এই তালিকাব—সাহায্যে দৃষ্টান্ত দিযে বোঝানো যেতে পাবে—

একটি পবীক্ষাতে ৫০টি ছাত্র নিম্নরূপ **সাফল্যাঙ্ক** লাভ কবেছে :

১৮৫, ১৬৬, ১৭৬, ১৪৫, ১৬৬. ১৯১, ১৭৭, ১৬৭, ১৭১
১৭৪, ১৪৭, ১৭৮, ১৭৬, ১৪২* ১৭০, ১৫৮, ১৭১, ১৬৭
১৪০, ১৭৮, ১৭৩, ১৪৮, ১৬৮, ১৮৭, ১৮১, ১৭২, ১৬৫,
১৬৯, ১৮৮, ১৮৭, ১৭৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৮৭, ১৫৬, ১৭১,
১৬২, ১৯৩, ১৭৩, ১৮৩, ১৯৭✤ ১৮১, ১৫১, ১৬১, ১৫৩,
১৭২. ১৬২, ১৭৯, ১৭৩, ১৭৯।

* সর্বনিম্ন সফল্যাঙ্ক ১৪২

✤ সর্বোচ্চ সাফল্যাঙ্ক ১৯৭।

এইবাব উপবি-উক্ত সাফল্যাঙ্ককে নিম্নলিখিত উপাযে পৌনঃপুন্য বিস্তাব অনুসাবে সাজানো হোলো—

শ্রেণীব দূবত্ব	মিল	পৌন পুন্য সং ।
১৯৫—২০০	/	১
১৯০—১৯৫	/	২
১৮৫—১৯০	/	৪
১৮০—১৮৫	/////	৫
১৭৫—১৮০	/// / /	৮
১৭০—১৭৫	///// ////	১০
১৬৫—১৭০	//////	৬
১৬০—১৬৫	////	৪
১৫৫—১৬০	////	৪
১৫০—১৫৫	//	২
১৪৫—১৫০	///	৩
১৪০—১৪৫	/	১
		সংখ্যা (N)—৫০

নিয়ে আমরা Thorndike Intelligence Examination থেকে লব্ধ ১০০টি সাকল্যাঙ্ককে **পাঁচ সংখ্যক দূরত্ব** হিসেব ক'রে Frequency distribution দেখাতে পারি :

সাকল্যাঙ্ক দূরত্ব	F (পৌনঃপুন্য
১১০—১১৪	১
১০৫—১০৯	১
১০০—১০৪	৫
৯৫—৯৯	১০
৯০—৯৪	১২
৮৫—৮৯	১৭
৮০—৮৪	১৮
৭৫—৭৯	১৩
৭০—৭৪	১৬
৬৫—৬৯	১
৬০—৬৪	২
৫৫—৫৯	২
৫০—৫৪	১
৪৫—৪৯	১
	সংখ্যা (N) - ১০০

এইবার আমরা এই Frequency distributionকে Graph বা লেখ-এর সাহায্যে উপস্থাপন করতে পারি। লেখ বা Graph সাধারণতঃ দু'ধরনের

ব্যবহৃত হয়—একটি Frequency Polygon, আর একটি হলো Histogram। এই জাতীয় Graphগুলিতে Vertical line-এ Frequencies-এর মধ্যে

কতসংখ্যক পর্যন্ত 'F' আছে সেই অনুসারে দূরত্বের scale ব্যবধান টানা হয়। 'N' বা সংখ্যার ইউনিট অনুপাতে Horizontal scale-এ দূরত্বের ইউনিট পিছু বসানো হয়। এরপর Polygon ও Histogram দুই ধরনের আকারে Graph আঁকা হয়। আমরা উপরি-উক্ত পরীক্ষার সাফল্যাঙ্ক, সাফল্য-দূরত্ব ও 'F' বা পৌনঃপুন্যকে চিত্রের সাহায্যে স্পষ্ট ক'রে পূর্ব পৃষ্ঠায় দেখিয়েছি।

ব্যক্তিসমূহ ও বস্তুসমূহের পরিমাপ নানাপ্রকারের হোতে পারে। বিভিন্ন ধরনের নিখুঁত মানদণ্ড দিয়ে ব্যক্তির সাফল্য আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি এবং তাকে চিত্রের সাহায্যে আকর্ষণীয় ও অর্থপূর্ণ ক'রে তুলতে পারি। যখন ব্যক্তিসমূহের কোনো উপাদানকে আমরা series-এ সাজিয়ে তুলি বা শ্রেণীবিন্যস্ত ক'রে তুলি, তখন আমাদের পরিমাপ অত্যন্ত সহজ ধরনের হয়। ব্যক্তিসমূহের এই পরিমাপকে আমরা scores বা সাফল্যাঙ্ক হিসেবে প্রকাশ করতে পারি। যখন এই scores-কে আমরা সমপরিমাণ এককের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করি তখন তাকে আমরা বলি scale। মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষায় Scaled tests-এ একই ধরনের unit ব্যবহৃত হয়, তবে এসব ক্ষেত্রে absolute zero point ব'লে কিছু চিহ্নিত করা যায় না। যে সমস্ত প্রলক্ষণ বা বিশেষত্ব আমরা scores হিসেবে প্রকাশ করি তাদের আমরা Variables ব'লে থাকি। যে সমস্ত উপাত্ত (data) আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যাঙ্কের মধ্য দিয়ে পাই, সেগুলি অর্থহীন ব'লে গণ্য হ'য়ে যায় যদি-না তাকে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত করি এবং পরিসংখ্যান নীতিতে তার গূঢ় তাৎপর্য অনুধাবন করি। Frequency distribution, Histogram, Polygon প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা পরিমাণগত ও সংখ্যাগত দিককে আরো স্পষ্ট ও মূর্ত ক'রে তুলতে পারি।

Scale নির্দিষ্ট করার নিয়ম

কেন্দ্রীয় প্রবণতা ও তার ব্যবহার (Measures of Central Tendency and their uses):

Frequency distribution-এর মাধ্যমে সাফল্যাঙ্ককে শ্রেণীবিন্যস্ত করে 'F' ও 'N' বের করা যায় তা' আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সাফল্যাঙ্ককে শ্রেণী বিন্যস্ত করবার পর আমরা Mean, Median ও Mode বের করি।

Mean হোলো মধ্যবিন্দু বা গড়—যা হিসেব ক'রে আমরা সাধারণ পরিমাপের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা কতখানি তা বের করি। প্রত্যেক সাফল্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) থেকে কতদূর সীমায় অবস্থিত তা হিসেব ক'রে আমরা শিক্ষার্থীদের গড় নম্বরের উচ্চ বা নিম্ন মান সম্পর্কে একটা পরিচ্ছন্ন ধারণা পাই।

Mean বা মধ্যবিন্দু বের করা অতি সহজ। সাফল্যাঙ্কের যোগফলকে সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করলে আমরা এই Mean-কে বের করতে পারি।

Mean

আমরা সাফল্যাঙ্কের বিশ্বস্ততা পরিমাপের জন্য এই মধ্যবিন্দু হিসেব করি। পরে এই Mean-এর সাহায্যে আমরা standard deviations ও co-efficient of correlation বের করতে সমর্থ হই।

Median ব্যবহৃত হয় তখনই—যখন আমরা দ্রুতভাবে ও সহজে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বের করতে চাই। এবং চরম পরিমাপের ক্ষেত্রে আমরা মধ্যবিন্দু অসমভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারি তখন আমরা median ব্যবহার করি। আমরা যখন মনে করি যে কতকগুলি সাফল্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় প্রবণতাকে প্রভাবান্বিত করতে পারে, তখন আমরা median ব্যবহার করে থাকি। মধ্যবিন্দুর কাছাকাছি কতকগুলি সাফল্যাঙ্ক রয়েছে আমরা তা বিচার করি Median-এর সাহায্যে। অর্থাৎ এর দ্বারা আমরা কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে একটি অবস্থান খুঁজি। তখন দেখি median-এর উপরে বা নীচে এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা অবস্থিত।

Median

আমরা Mode ব্যবহার করি তখনই—যখন প্রায়শ ব্যবহৃত score বা সাফল্যাঙ্ককে আমরা খুঁজি। যখন দ্রুতগতিতে একটা মধ্যবিন্দু খুঁজে বের করার প্রয়োজন হয়, তখন আমরা এই Mode ব্যবহার করি

Mode

নিম্নে তালিকার সাহায্যে আমরা Mean, Median ও Mode নির্ণয়ের প্রক্রিয়া উপস্থাপন করছি—

সাফল্যাঙ্ক	f	x	fx
৭০—৭১	২	৫	১০
৬৮—৬৯	২	৪	৮
৬৬—৬৭	৩	৩	৯
৬৪—৬৫	৪	২	৮
৬২—৬৩	৬	১	৬
৬০—৬১	৭	০	০
	২৪	১৫	৪১

সাফল্যাঙ্ক	f	x	−৫
৫৮—৫৯	৫	−১	−৫
৫৬—৫৭	৪	−২	−৮
৫৪—৫৫	২	−৩	−৬
৫২—৫৩	৩	−৪	−১২
৫০—৫১	১	৫	−৫
	১৫	−১৫	৩৬

আমরা উপরি-উক্ত তালিকায় ৬০—৬১ সাফল্যাঙ্ককে আনুমানিক মধ্যবিন্দু ধ'রে নিয়ে ৭ সাফল্যাঙ্ককে চিহ্নিত ক'রে সীমারেখা টেনেছি। ৭ সাফল্যাঙ্ককে মধ্য-বিন্দু ধরে x হিসেবে 0 বিন্দু ধরে নিয়ে উপবিভাগে কতসংখ্যক সাফল্যাঙ্ক আছে তা '+' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছি এবং নিম্নভাগে সাফল্যাঙ্ক কত আছে তা' '−' চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করেছি। এইবার 'f' এবং 'x' কে গুণ ক'রে fx .বর করেছি। 0 বিন্দুর উপরে fx সংখ্যা হোলো ৪১ এবং 0 বিন্দুর নিম্নে fx সংখ্যা হোলো −৩৬। এদের বিয়োগ করে আমরা পেলাম ৫। Scores-এর ব্যবধান আমরা পাই ২ সংখ্যার দ্বারা। এইবার আমরা ci .বর করতে পারি নিম্নলিখিত সূত্র অনুসরণ করে :

$$ci = \frac{fx \text{ (উপর ও নীচের সংখ্যার বিয়োগ ফল)}}{\text{সংখ্যা (N)}} \times \text{Scores-এর দূরত্ব সংখ্যা}$$

উপবিবর্তিত তালিকা অনুসারে—

$$ci = \frac{২}{১৫} \times ২ = \frac{৪}{১৫} = .২৬৬ = .২৬$$

[সূত্র : অনুমিত মধ্যবিন্দু + ci]
(Assumed Mean)

Mean হ'লো আমাদের অনুমিত মধ্যবিন্দুর scores দূরত্ব-সংখ্যা অর্থাৎ আলোচ্য ক্ষেত্রে ৬০.৫ + .২৬ (ci) = ৬০.৭৬।

Median নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয় :

আমাদের অনুমিত Mean-এর পরবর্তী scores-এর শেষ ইউনিট অর্থাৎ

$$৫৯.৫ + \frac{\text{সংখ্যা (N) অর্থাৎ ৩৯}}{\text{২ (Constant)}} - F$$ **অর্থাৎ** ১৫ + fm বা মধ্যবিন্দুতে **অবস্থিত সংখ্যা** × i **অর্থাৎ** Scores-এর দূরত্ব ২।

f এর নিম্নে উপরিবর্ণিত Table অনুসারে Median দাঁড়ালো নিম্নরূপ :

$$৫৯.৫+\frac{\frac{৩৯}{২}-১৫}{৭}\times ২ \qquad \left[\text{সূত্র} = l+\frac{\frac{N}{2}-F}{fm}\times i\right]$$

$$=৫৯.৫+\frac{৯}{২}\times\frac{২}{৭}$$

$$=৫৯.৫+১.২৯$$

$$=৬০.৭৯$$

Mode নির্ধারিত হয় নিম্নলিখিত সূত্র অনুসারে—

$$৩ \times \text{Median} - ২ \times \text{Mean}$$

আলোচ্য ক্ষেত্রে **Mode** নিম্নরূপ দাঁড়ায় :

$$৩ \times ৬০.৭৯ - ২ \times ৬০.৭৬$$

$$= ১৮২.৩৭ - ১২১.৫২$$

$$= ৬০.৮৫ ।$$

তাহ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, উপরিবর্ণিত Table-এর মধ্যে মধ্যবিন্দু বা Mean হো'লো ৬০.৭৬, Median হো'লো ৬০.৭৯ এবং Mode হ'লো ৬০.৮৫। **সাফল্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় প্রবণতা ৬০.৭৬ থেকে ৬০.৮৫ পর্যন্ত বিস্তৃত।** এই তথ্য থেকে আমরা একটি শ্রেণীর মধ্যে সাধারণ পর্যায়ের শিক্ষার্থীর গড়পড়তা সাফল্যাঙ্কের একটা পরিচয় পাই। এইভাবে আমরা দুটি পরীক্ষায় লব্ধ Frequency distribution থেকে Mean, Median, Mode বের করে তুলনামূলকভাবে সাফল্যাঙ্কের ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যায়ের শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় পেতে পারি। যখন মধ্যবিন্দুর মধ্যে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী একই প্রকার সাফল্যাঙ্ক অর্জন করবে, তখন Median-এর মধ্যে তার পরিচয় পাই। উদাহরণস্বরূপ, একটি শ্রেণীতে দুইটি বিষয়ে সাফল্যাঙ্ক বিচার ক'রে দেখা গেল একটিতে mean দাঁড়ায় ৭২.৯২, অন্যটিতে ৭৩.০০। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধারণ পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। Median-এর ক্ষেত্রে দেখা গেল যে, প্রথমটিতে ৭১.৭৫ এবং দ্বিতীয়টিতে ৭২.৭১ Median হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মধ্যবিন্দুতে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর সাফল্যাঙ্ক রয়েছে। Meanকে Law of averages বলা হয়। এর দ্বারা আমরা গড়পড়তা সংখ্যা বের করি। যখন কোনো সাফল্যাঙ্কের ক্ষেত্রে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বেশি দেখা যায় তখন আমরা mode বের ক'রে তা বুঝতে পারি। Median-এর ব্যবহার আমরা দেখি, যেমন কোনো একটা সমিতির জন্য চাঁদা সংগ্রহ হোলো 0 থেকে

সর্বোচ্চ অঙ্ক পর্যন্ত। ঐ ক্ষেত্রে আমরা Median বের ক'রে মধ্যবিন্দু বা গড় বের করতে পারি এবং বলতে পারি যে, এই বিন্দুতে অধিকসংখ্যক লোক চাঁদা দিয়েছে।

বিশেষত্ব পরিমাপ (Measures of Variability) :

আমাদের যখন সাফল্যাঙ্কের সামগ্রিক বিস্তার সম্পর্কে জ্ঞান দরকার হয়, তখন আমরা বিক্ষিপ্ত সাফল্যাঙ্কের দূরত্ব (range) সম্পর্কে জানতে চাই। এজন্য আমরা Q. S. D. এবং M. D. বের করি। Q হোলো Median-এর পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রীকরণ শক্তির পরিমাণ। আমরা Q-এর সাহায্যে দ্রুতভাবে বিক্ষিপ্ত সাফল্যাঙ্কের variability বা বিশেষত্ব পরিমাপ করি। যখন আমরা সাফল্যাঙ্কের সর্বপ্রকার বিচ্যুতির গঠনকে পরিমাপ করি, তখন M. D. ব্যবহার করা হয়। M. D. তখনই ব্যবহার করা হয়—যখন variability-এর পরিমাপকে চরম বিচ্যুতি প্রভাবান্বিত করে। যখন আমরা সাধারণ পরিমাপের সর্বোচ্চ পরিমাণ বিশ্বস্ততা খুঁজে পেতে চাই, তখন S. D. ব্যবহার করি। যখন দেখা যায় যে, চরম বিচ্যুতি measures of variability-এর উপরে আনুপাতিকভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, তখন আমরা S. D. বের ক'রে তা দেখি এবং পরে Co-efficient of Correlation বের ক'রে তার বিশ্বস্ততা (reliability) কতখানি তা পরিমাপ করি।

নিম্নলিখিত Table থেকে আমরা Q_1, Q_3 এবং σ বের করতে পারি (Q বের করার জন্য Q_1 এবং Q_3 পূর্বে বের করতে হয়)—

সাফল্যাঙ্কের দূরত্ব—

(Score-Interval বা S. I.)	f	x	fx^2
৯০—৯৪	২	৫	৫০
৮৫—৮৯	২	৪	৩২
৮০—৮৪	৪	৩	৩৬
৭৫—৭৯	৮	২	৩২
৭০—৭৪	৬	১	৬
৬৫—৬৯	১১	১৫	০
৬০—৬৪	৯	−১	৯
৫৫—৫৯	৭	−২	২৮
৫০—৫৪	৫	−৩	৪৫
৪৫—৪৯	০	−৪	০
৪০—৪৪	২	−৫	৫০
	N = ৫৬	−১৫	Σfx^2 = ২৮৮

Q_1 = Mean + Mean-এ অবস্থিত f সংখ্যার যোগফল
− Mean এ অবস্থিত f সংখ্যার নিম্নে অবস্থিত সংখ্যার যোগফল +
Mean বিন্দুতে অবস্থিত f সংখ্যা × Score-interval বা সফল্যাঙ্কের দূরত্ব।

আলোচ্য ক্ষেত্রে—

$$Q_1 = \text{Mean } (৫৪\text{˙}৫) + \frac{১৪ - ৭}{৭} \times ৫$$

$$= ৫৪\text{˙}৫ + ৫ = ৫৯\text{˙}৫০$$

$$Q_3 = \text{Mode} + \frac{f \text{ সংখ্যা উপর থেকে 0 বিন্দুর নীচু পর্যন্ত যোগফল} - f \text{ সংখ্যা নীচু থেকে 0 বিন্দুর উপর পর্যন্ত যোগফল}}{f \text{ মধ্য বিন্দুর সংখ্যা}} \times$$

Score interval বা সাফল্যাঙ্কের দূরত্ব।

আলোচ্য ক্ষেত্রে-

$$Q_3 = ৭৪\text{˙}৫ + \frac{৪১ - ৪০}{৮} \times ৫$$

$$= ৭৪\text{˙}৫ +$$

$$= ৭৪\text{˙}৫ + ১\text{˙}২৫$$

$$= ৭৫\text{˙}৭৫$$

অতএব $$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{২}$$

আলোচ্য ক্ষেত্রে—

$$Q = \frac{৭৫\text{˙}৭৫ - ৫৯\text{˙}৫০}{২}$$

$$= \frac{১৬\text{˙}২৫}{২}$$

$$= ৮\text{˙}১৩$$

এইবার আমরা Standard Deviation বা σ বের করবো।

Standard Deviation-এর সূত্র নিম্নরূপ :

$$\sqrt{\frac{\Sigma f x^2}{N} - C^2} \times \text{Score Interval}$$

$$\left[C = \frac{fx \text{ এর বিয়োগফল}}{N}\right]$$

আলোচ্য ক্ষেত্রে—

$$\sigma = \sqrt{\frac{২৮৮}{৫৬} - ০} \times ৫$$

$$\sigma = \sqrt{৫·১৪২৮} \times ৫$$

$$= ২·২৬৭ \times ৫$$

$$= ১১·৩৩৫$$

$$= ১১·৩৩$$

নিম্নে একটি তালিকার সাহায্যে সহজ পদ্ধতিতে M ও σ বের করার প্রক্রিয়া দেখানো হচ্ছে ঃ

Scores : ৫২, ৫০, ৫৬, ৬৮, ৬৫, ৬২, ৫৭, ৭০

তালিকা

Scores	x	x^2
৫২ (৫২ − ৬০)	− ৮	৬৪
৫০ (৫০ − ৬০)	− ১০	১০০
৫৬ (৫৬ − ৬০)	− ৪	১৬
৬৮ (৬৮ − ৬০)	৮	৬৪
৬৫ (৬৫ − ৬০)	৫	২৫
৬২ (৬২ − ৬০)	২	৪
৫৭ (৫৭ − ৬০)	− ৩	৯
৭০ (৭০ − ৬০)	১০	১০০
Σ = ৪৮০		Σx^2 = ৩৮২

$$\underset{\text{(Mean)}}{M} = \frac{\Sigma \text{ Scores}}{N} = \frac{৪৮০}{৮} = ৬০$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}}$$

$$= \sqrt{\frac{৩৮২}{৮}}$$

$$= \sqrt{৪৭·৭৫}$$

$$= ৬·৯১$$

উদাহরণের সাহায্যে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে Co-efficient of variation দেখানো হচ্ছে :

Table

বিশেষত্ব	পরিমাপ একক	শ্রেণী	গড় Mean	σ
V_1 মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য	সেন্টিমিটার	৮০২ পুরুষ	১৯০.৫১	৫.৯০
V_2 দেহের ওজন	পাউণ্ড	৮৬৮,৭৪৫ পুরুষ	১৪১.৫৪	১৭.৮২
V_3 গতি	প্রত্যেকের ৩০ বারের গড়	৬৮ পুরুষ ও স্ত্রী	১৯৬.৯১	২৬.৮৩
V_4 স্মৃতির বিস্তার	সংখ্যা সঠিকভাবে পুনরাবৃত্তি	২৬৩ পুরুষ	৬.৬০	১.১৩
V_5 সাধারণ বুদ্ধি	পয়েন্ট অনুসারে সাফল্যাঙ্ক	১১০১ বয়স্ক	১৫৩.৩	২৩.৬

উপরি-উক্ত তালিকা থেকে কোন বিশেষত্বের Variable কি রকম হয়েছে তা নির্ণীত হোলো :

V_1 (মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য) : $\frac{১০০ × ৫.৯০}{১৯০.৫১} = \frac{১৫৭৭০}{৫০৬৩} = ৩.০২৮ = ৩.১০$

V_2 (দেহের ওজন) : $\frac{১০০ × ১৭.৮২}{১৪১.৫৪} = \frac{৮৯১০০}{৭০৭৭} = ১২.৭৯$

V_3 (গতি) : $\frac{১০০ × ২৬.৮৩}{১৯৬.৯১} = \frac{২৬৮৩০০}{১৯৬৯১} = ১৩.৬৩$

V_4 (স্মৃতি) : $\frac{১০০ × ১.১৩}{৬.৬০} = \frac{৫৬৫}{৩৩} = ১৭.১২$

V_5 (সাধারণ বুদ্ধি) : $\frac{১০০ × ২৩.৬}{১৫৩.৩} = \frac{২৩৬০০}{১৫৩৩} = ১৫.৩৯$

এইবার এই V-গুলিকে Rank অনুযায়ী সাজানো হোলো।

ফলাফল :

V_1 = ৩.১০
V_2 = ১২.৫৯
V_3 = ১৩.৬৩
V_4 - ১৫.৩৯
V_5 - ১৭.১২

V_5 - ১৭.১২
V_4 = ১৫.৩৯
V_3 - ১৩.৬৩
V_2 = ১২.৫৯
V_1 = ৩.১০

পার্সেন্টাইলস্ (Percentiles)

পার্সেন্টাইলকে সাধারণত P_p এই প্রতীক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। Median হোলো এমন মধ্যবিন্দু যার নীচুতে সাধারণত ৫০% ভাগ সাফল্যাঙ্ক থাকে। Q_1 এবং Q_3 হোলো এমন ধরনের চিহ্নিত স্থান যার নিম্নে যথাক্রমে ২৫% এবং ৭৫% সাফল্যাঙ্ক থাকে। যে বিন্দুর নিম্নে কোনো শতকরা সাফল্যাঙ্ক থাকে তাকেই বলে Percentiles।

Percentiles হিসেব করার নিয়ম সাধারণত Median নির্ণয় করার নিয়মের মতোই। নিম্নলিখিত সূত্র Percentiles নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়—

$$P_p \text{ (অর্থাৎ Percentiles)} = \left(\frac{l + PN - F}{fP} \right) \times i$$

L = সাফল্যাঙ্কের মধ্যবিন্দু যেখানে Mean আছে বলে অনুমান করা হয়।

P = যত Percentile চাওয়া হচ্ছে।

N = সংখ্যা।

F = Mean যে বিন্দুতে আছে সেখান থেকে নিম্নমান পর্যন্ত frequency সংখ্যার যোগফল।

i = Score interval-এর দূরত্ব সংখ্যা।

Percentile Scale-এর সর্বোচ্চ বিন্দু P_{100} এবং সর্বনিম্ন বিন্দু P_0 দ্বারা চিহ্নিত হয়। Percentile বের করতে গিয়ে পরীক্ষক সাফল্যাঙ্কের একটা শতকরা ভাগ (যেমন, ১৫%, ২৫%) নিয়ে আরম্ভ করেন। Percentile বের করতে গেলে সাফল্যাঙ্ক নিয়ে হিসেব করা হয়, কিন্তু Percentile rank বের করতে গেলে উল্টোভাবে আরম্ভ করতে হয় এবং কোনো একটি মাত্র individual score নিয়ে আরম্ভ ক'রে তার নিম্নের শতকরা scores হিসেব করা হয়। ব্যক্তি-সমূহ অথবা কোনো বস্তুসমূহকে merit-এর কৃতিত্ব অনুসারে Percentile rank বা P. R. ভাবে সাজানো হয়। এইভাবে P. R. নির্ধারণ প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না।

অবশ্য Percentiles বের করা যায় direct interpolation-এর সাহায্যে, cumulative percentage distribution থেকে সাহায্য নিয়ে। Percentiles ও Percentile Ranks তাড়াতাড়ি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করা যায়। Frequency distribution-এর Ogive থেকে Ogive দেখে Percentiles বলা যায় এবং এরূপ ক্ষেত্রে ভুল কম হয়।

উদাহরণের সাহায্যে Percentile বের করা হচ্ছে। ৭৫% ভাগ Percentile নিয়ম অনুসরণ ক'রে হিসেব করা হচ্ছে। একটি স্মৃতিশক্তি পরীক্ষায় দুটি শ্রেণীর ফলকে বিচার করা হো'লো।

Group A				Group B			
সাফল্যাঙ্ক	*f*	*cf*	%*cf*	সাফল্যাঙ্ক	*f*	*cf*	%*cf*
৭৯	৬	১২৮	১০০%	৮৩	৮	১৩৯	১০০
৭৪	৭	১২২	৯৫·৩	৭৮	৮	১৩১	৯৪·২
৮৯	৮	১১৫	৮৯·৮	৭৩	৯	১২৩	৮৮·৫
৮৪	১০	১০৭	৮৩·৬	'৮	১৬	১১৪	৮২·০
৭৯	১২	৯৭	৭৫·৮	৬৩	২০	৯৮	৭০·৫
৭৪	.৫	৮২	৬৬·৪	৫৮	১৮	৭৮	৫৬ ১
৬৯	২০	৭০	৫৪·৭	৫৩	১৯	৬০	৪৩·২
৬৪	১৬	৪৭	৩৬·৭	৪৮	১১	৪১	২৯·৫
৫৯	১০	৩১	২৪·২	৪৩	১৩	৩০	২১·৬
৫৪	১২	২১	১৬·৪	৫৮	৮	১৭	১২·২
৪৯	৬	৯	৭·০	৩৩	৭	৯	৬·৫
২৪	৩	৩	২·৩	২৮	১	২	১·৪

cf *f*-এর নিম্নবিন্দুতে অবস্থিত সংখ্যাকে নিম্নবিন্দুতে *cf*-এর ক্ষেত্রে constant ধরা হয় এবং তারপর উচ্চবিন্দু গুলিতে নিম্নবিন্দুর *cf*-এর সঙ্গে *f* যোগ ক'রে উপরের দিকে যেতে হয়। এইভাবে cumulative frequency বের করতে হয়।

cf % – *f* এর নিম্নবিন্দুতে *cf* যা আছে তাকে ৭৫% নিয়ম অনুযায়ী ১০০% হিসেবে যা দাঁড়ায়।

Group A এবং Group Bকে একই axis-এর মধ্যে ogive নির্দেশ করা হোলো :

	Group A		Group B	
	Ogive	calculated	Ogive	calculated
P_{40}	৪৬	৪৫·৮১	৪৮·৫	৪৮·৬৯
P_{60}	৫৬	৫৫·৭৭	৫৯·৭৫	৫৯·৮৫
P_{90}	৭৪	৭৩·৬৪	৭৫·৫	৭৪·৮১

$$P_{৪০} = l + \frac{\left(\frac{৩N}{১০} - F\right)}{fm} i$$

$$= ৪১·৫ + \left(\frac{৩৮·৪ - ৩}{১৬}\right) \times ৫$$

$$= ৭৫·৮১$$

৫৫ সাফল্যাঙ্কের Percentile rank Group A-তে = ৫৯
„ „ Group B-তে = ৪৮

A Group-এর ৭০ Percentile rank B Group এর ৬ Percentile rank-এর সমপর্যায়ভুক্ত।

এইবার আমরা দেখবো Group A কত শতকরা হিসেবে Group B-এর median-কে অতিক্রম করেছে।

$$M = l + \frac{\left(\frac{N}{2} - F\right)}{fm} \times i$$

$$= ৫৩·৫ + \left(\frac{৬৯·৫ - ৬০}{১৮}\right) \times ৫$$

$$= ৫৬·১৩$$

৫৯·১% Group A ছেলেরা Group B এর median-কে অতিক্রম করে
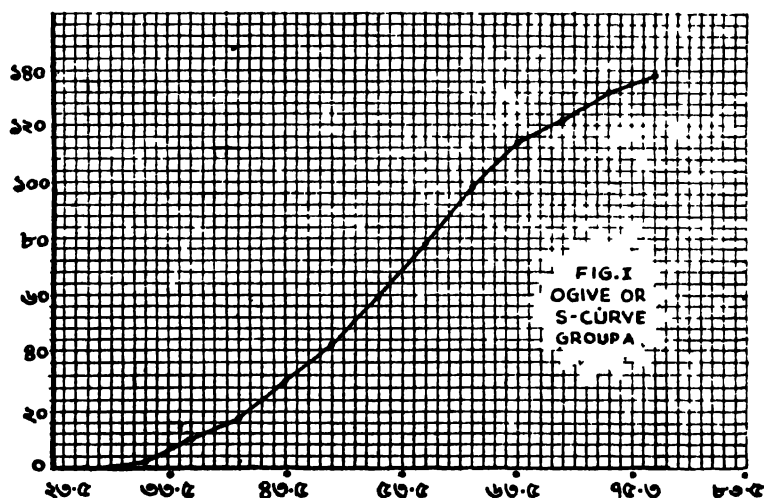
উপরের চিত্রে Ogive-এর মধ্যে Group A-এর Percentiles দেখানো হচ্ছে।

নিম্নচিত্রে Ogive-এর মধ্যে Group B-এর Pecentiles দেখানো হচ্ছে—
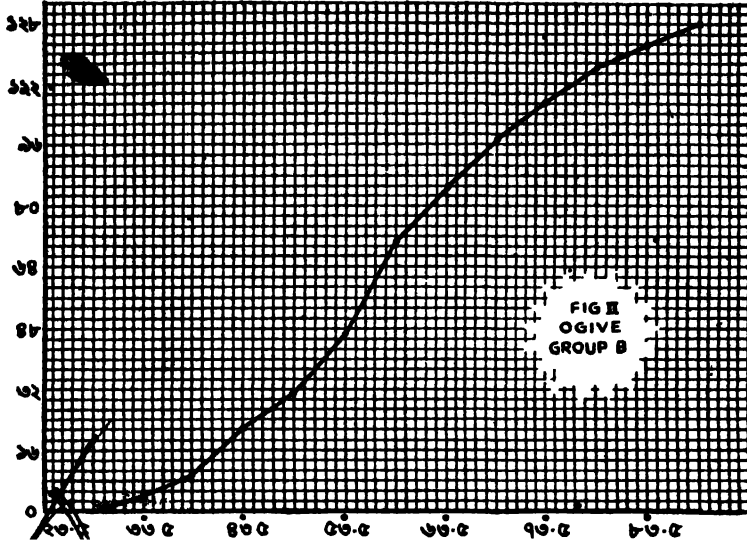
Percentile Rank নির্ণয় :

কোনো একটি পরীক্ষায় ২০টি ছাত্রের সাফল্যাঙ্ক অনুসারে rank বা পর্যায় নির্ধারণ করা হোলো। এইবার প্রত্যেক শিশুর Percentile rank হিসেব করা হোলো :—

$$PR = ১০০ - \left(\frac{১০০R - ৫০}{N}\right)$$

(সূত্র)

প্রথম শিশুর $PR = ১০০ - \left(\frac{১০০ \times ১ - ৫০}{২০}\right) = ৯৭{\cdot}৫$

দ্বিতীয় শিশুর $PR = ১০০ - \left(\frac{১০০ \times ২ - ৫০}{২০}\right) = ৯২{\cdot}৫$

তৃতীয় শিশুর $PR = ১০০ - \left(\frac{১০০ \times ৩ - ৫০}{২০}\right) = ৮৭{\cdot}৫$

চতুর্থ শিশুর $PR = ১০০ - \left(\frac{১০০ \times ৪ - ৫০}{২০}\right) = ৮২{\cdot}৫$

পঞ্চম শিশুর $PR = ১০০ - \left(\frac{১০০ \times ৫ - ৫০}{২০}\right) = ৭৭{\cdot}৫$

এইভাবে ষষ্ঠ শিশু থেকে বিংশতিতম শিশু পর্যন্ত Percentile rank হিসেব করা যায়।

অনুবন্ধ (Correlation) :

দুইটি পরীক্ষায় লব্ধ rank অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সাজানো হোলো—

Table

শিক্ষার্থী	প্রথম পরীক্ষায় Rank	দ্বিতীয় পরীক্ষায় Rank	দুইটি পরীক্ষায় লাভ
ক	৭	৬	১
খ	৪	৪½	
গ	১০	১০	
ঘ	১	৩	
ঙ	৬	১১	
চ	৯	৮	১
ছ	১১	৭	৪
জ	৩	১	২
ঝ	২	২	
ঞ	৫	৪½	½
ট	৮	৯	
			৮½ (Σg)

Σg — লাভের সংখ্যা :

[স্পীয়ারম্যান ব্যবহৃত সূত্র অনুযায়ী correlation বা r বের করার পদ্ধতি দেখানো হচ্ছে]

m — লাভ যতগুলি rank-এর হয়েছে তার সংখ্যার চেয়ে ক্ষতির সংখ্যা কত হিসেব করে যা দাঁড়ায়। যেমন, আলোচ্য ক্ষেত্রে লাভ হয়েছে পাঁচটি ক্ষেত্রে, কিন্তু লাভ হয়নি ছয়টি ক্ষেত্রে। অতএব m = ৬। এইবার স্পীয়ারম্যান ব্যবহৃত সূত্র অনুযায়ী দুইটি পরীক্ষায় লব্ধ rank থেকে Correlation বের করা যায় পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত সূত্র অনুসরণ ক'রে—

$$R=১-\frac{\Sigma g}{M}$$

M কে আমরা এইবার $\left(\frac{n^2-1}{m}\right)$ — এই সূত্র অনুযায়ী বের করতে পারি। আলোচ্য ক্ষেত্রে n হোলো ১১, m হোলো ৬, অতএব এই সূত্র অনুযায়ী

$$M=\left(\frac{১১^২-২}{৬}\right)=২০$$

এইবার Correlation সূত্র অনুসরণ ক'রে দুইটি পরীক্ষার মধ্যে কতখানি সম্বন্ধ আছে তা নির্ণয় করা গেল—

$$R=১-\frac{৮\cdot৫(\Sigma g)}{২০(M)}$$

$$R=০\cdot৫৭$$

যখন দুটি পরীক্ষার মধ্যে সম্বন্ধ positive তখন '+' চিহ্ন দ্বারা বলা হয় যে, দুটি পরীক্ষায় লব্ধ rank-এর মিল আছে। যদি সম্বন্ধ negative হয় তখন '−' চিহ্ন দ্বারা বলা হয় যে, এদের সম্বন্ধ সঠিক নয়। যেখানে কোন সম্বন্ধ থাকে না, সেখানে আমরা 0 চিহ্নদ্বারা চিহ্নিত করি। Correlation-এর দ্বারা আমরা দুটি পরীক্ষায় লব্ধ সাফল্যাঙ্কের rank অনুপাতে সম্বন্ধ নির্দেশকরতে পারি। পিয়ার্সন Co-efficient Correlation বের করেছিলেন এবং তাছাড়া Linear Correlation দ্বারাও r বের করা হয়। কিন্তু, এইগুলি বড়ই জটিল ব'লে সহজ পদ্ধতিতে r বের করার উপায় নির্দেশ করা হোলো।

Questions

1. How Mean, Median and Mode can be calculated from a given table ?
2. How Central Tendencies are determined ?
3. State clearly the process of Calculating the Measures of Variability.
4. How Percentiles and Percentile ranks are computed ?
5. Discuss how Correlation is determined ? Give examples. Discuss the utility of Correlation in education.

References :

1. Sumner—Statistics for Beginners.
2. Garrett—Statistics in Experimental Psychology and Education

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতের শিক্ষাতন্ত্র

(Educational System in India)

ভারতে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে তা পর্যালোচনা করতে গেলে আমরা লক্ষ্য করি যে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে একই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু নেই। শিক্ষার স্তরভেদ সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, এমন কি, কি ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করবে তার বিভিন্নতাও লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে গেলেই আমাদের জানা প্রয়োজন হয়—ভারতের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার কাঠামোটি কিরূপ। মোটামুটি নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভারতের শিক্ষাতন্ত্রকে আমরা বিভক্ত করতে পারি:

(১) **প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর** (Pre-Primary Stage):

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় (Nursery) রয়েছে। যদিও এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, তথাপি সব প্রদেশে তা একভাবে চালু নয়। কোনো কোনো প্রদেশে এ জাতীয় প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থানীয় উদ্যোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, কোথাও রাষ্ট্র কর্তৃক সাহায্যপ্রাপ্ত, কোথাও আবার শিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এই স্তরের শিক্ষায় কোন্ বয়সের শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করবে তা নিয়ে সকল প্রদেশ ঐক্যপূর্ণ কোন নীতি অনুসরণ করে না। কোন কোন প্রদেশে তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসরের শিশুকে এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, আবার কোথাও এই পর্যায় সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত ধরা হয়। এই স্তরের শিক্ষায় শিশুকে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং তাদের সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ, বিশ্রামমুখীন শিক্ষা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভ্যাসের জীবনধারা গ'ড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এই পর্যায়ের শিক্ষা ভারতে বেশ ব্যয়বহুল। উপযুক্ত শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, অর্থানুকূল্য ও জনগণের স্বাভাবিক আগ্রহের অভাবে এই স্তরের শিক্ষা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেনি ভারতবর্ষে। অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই জাতীয় শিক্ষার

দিকে সকল আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় নার্সারী বিদ্যালয় সকল সংখ্যায় দিকে গড়ে উঠ্‌ছে। ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে মোট নার্সারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৩০৫। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে এই সংখ্যা আরো বাড়তির দিকে।

(২) **প্রাথমিক ও প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার স্তর** (Primary and Post-Primary Stage):

কোনো কোনো প্রদেশে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা চার বৎসরের, আবার কোথাও কোথাও বুনিয়াদী শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে এই স্তর পাঁচ বৎসর পর্যন্ত ধরা হয়েছে। বিভিন্ন প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছে, আবার কোনো কোনো প্রদেশে চার বৎসরের চিরাচরিত প্রাথমিক শিক্ষা অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং এই ধরনের বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। তবে সরকার বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রসারের নীতি গ্রহণ করায় প্রাথমিক শিক্ষার স্তর যে পঞ্চম মান পর্যন্ত হবে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষায়তনের (পঞ্চম মান সম্বলিত) সংখ্যা মাত্র ১,৭১১টি, অথচ চতুর্থ মান পর্যন্ত শিক্ষায়তনের সংখ্যা ২,০৮,৪০১ টি। পশ্চিমবঙ্গে এই জাতীয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৬ টি, অথচ চতুর্থ মান পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল মোট ১৪,৬৯৭ টি। ত্রিপুরা রাজ্যে বুনিয়াদী বিদ্যালয় ছিল মাত্র ১ টি, অথচ চতুর্থ মান পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল ৪০৩টি। পরবর্তী পর্যায়ে উন্নতি লক্ষণীয়ভাবে দেখা দিয়েছে।

(৩) **উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয়** (Higher Elementary Stage):

কোনো কোনো দেশে উচ্চতর প্রাথমিক বিদ্যালয় বা ভার্নাকুলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Vernacular Middle School) ছিল, যদিও তাদের সংখ্যা অল্প। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে সকলকিছু সাধুভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হোতো এবং অন্য কোনো ভাষা শিক্ষা দেওয়ায় হোতো না। প্রাথমিক শিক্ষার পর এই সব বিদ্যালয়ে তিন বৎসরের পাঠ্যসূচী অধ্যয়ন করতে হোতো। বর্তমানে এই জাতীয় বিদ্যালয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

(৪) **উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়** (Secondary Schools):

উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়কে সাধারণত দুটি বিভাগে বিভক্ত করা হয়। একটি জুনিয়ার (নিম্নস্তর), আর একটি সিনিয়ার (উচ্চস্তর)। জুনিয়ার স্তরকে আবার

কোনো কোনো প্রদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Middle School) বা নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Lower Secondary Sohool) বলা হয়। এই স্তরের বিদ্যালয় ও উচ্চবুনিয়াদী (Senior Basic) বিদ্যালয় একই পর্যায়ভুক্ত। যদিও পাঠ্যসূচীর দিক দিয়ে এরা বিভিন্ন ধরনের। কোনো কোনো প্রদেশে এই স্তর তিন বৎসরের, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে চার বৎসরের। বেশির ভাগ প্রদেশে এই স্তর তিন বৎসরের। এই স্তর অনুসারে আমরা যেমন নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে এক ধরনের বিদ্যালয় দেখি, তেমনি এই স্তরের উপরে আর একটি স্তর আছে, তাকে বলা হয় উচ্চমাধ্যমিক। কোনো কোনো প্রদেশে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় তিন বৎসরের, আবার কোনো কোনো প্রদেশে দুই বৎসরের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয় (Middle School) চার বৎসরের - দুই বৎসরের নিম্নপর্যায় ও দুই বৎসরের উচ্চপর্যায় সম্বলিত।

(৫) **উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়** (Higher Secondary Schools):

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিকল্পনার উদ্ভব সম্প্রতি হয়েছে এবং তা ব্যাপকভাবে কার্যকরী করার জন্য সুবিস্তৃত কর্মপ্রণালী গৃহীত হয়েছে। কেন কোনো প্রদেশে তিন বৎসরব্যাপী, আবার কোথাও চার বৎসরব্যাপী উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। ইণ্টারমিডিয়েট শ্রেণীর এক বৎসর সাধারণত এই স্তরের শিক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ক'রে একাদশ পর্যায়ের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনা সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছে। কেহ কেহ দ্বাদশ পর্যায়ের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা বলছেন। কোনো কোনো প্রদেশে দ্বাদশ পর্যায় পর্যন্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু আছে। তবে সর্বভারতীয় ঐক্য বজায় রাখার জন্য বর্তমানে সর্বত্র একাদশ মানের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় গঠনের কার্যক্রম অনুসরণের প্রচেষ্টা চলেছে।

(৬) **উচ্চতর শিক্ষা** (Higher Education):

বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্যায়ে সাধারণত ডিগ্রী কোর্স চার বৎসরের জন্য চালু ছিল, তন্মধ্যে দু'বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট এবং দু'বৎসর ডিগ্রী কোর্স হিসেবে। কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষাও পুনর্গঠিত হওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। বর্তমানে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স চালু হয়েছে। দিল্লী রাজ্যে যেখানে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু হয়েছে, সেখানে

ইণ্টারমিডিয়েট স্তর একেবারে বাতিল করা হয়েছে। মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমত চালু করা হয়। সম্প্রতি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স পরিকল্পনা চালু ক'রে পুরাতন ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স রহিত করবার ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছেন।

(৭) ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ (Intermediate College):

ভারতের স্যাডলার কমিশন ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স চালু করবার কথা বলায় ভারতের পূর্বাঞ্চলে অনেক স্থানে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ গ'ড়ে উঠেছিল। এই কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে না থেকে বোর্ড অফ সেকেণ্ডারী এণ্ড ইণ্টারমিডিয়েট এডুকেশনের অধীনে চালু হয়েছিল। অন্যান্য অনেক প্রদেশে চার বৎসরের ডিগ্রীকোর্স দু'টি আলাদা ইউনিটে বিভক্ত হয়ে একটি ইণ্টারমিডিয়েট স্তর, অন্যটি ডিগ্রীস্তর হিসেবে কার্যকরী ছিল। কিন্তু সম্প্রতি নূতন পরিকল্পনায় এই ইণ্টারমিডিয়েট স্তরের এক বৎসর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এবং আর এক বৎসর ডিগ্রীকোর্সের মধ্যে সংযুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা কার্যকরী হওয়ায় এ জাতীয় কলেজের বিলুপ্তি ঘটছে।

(৮) পেশাদারী কলেজ (Professional Colleges):

ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং, টেক্‌নোলজি, মেডিসিন, ভেটেরিনারী বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ে অনেক পেশাদারী কলেজ রয়েছে। এই সমস্ত কলেজে পূর্বে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করবার পর ভর্তি হওয়া যেতো। সম্প্রতি উচ্চতর মাধ্যমিক ও ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রীকোর্স চালু হওয়ার ফলে উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিগত প্রাক্‌শিক্ষা গ্রহণের উপর এই সমস্ত কোর্সে ভর্তি নির্ভর করছে।

(৯) কারিগরী প্রতিষ্ঠান (Technical Institutes):

কারিগরী প্রতিষ্ঠান নানা নামে গড়ে উঠেছে; যেমন, বাণিজ্য বিদ্যালয় (Trade Schools), শিল্পবিদ্যালয় (Industrial Schools), বৃত্তিগত বিদ্যালয় (Occupational Institutes) এবং পলিটেকনিক (Polytechnics)। ১১ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের শিক্ষার্থীদের কারিগরী শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতা অনুযায়ী বাণিজ্য, শিল্প বা স্বাধীন বৃত্তিতে প্রবেশের উপযোগী নানাধরনের কারিগরী পাঠ্য প্রবর্তন করা হয়েছে এই জাতীয় বিদ্যালয়গুলিতে।

অধিকাংশ রাজ্যে পলিটেকনিক স্থাপন করা হ'য়েছে এমনভাবে—যা বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের বৃত্তির উপযোগী হ'য়ে উঠে। জুনিয়র ও সিনিয়র পলিটেকনিক কোর্স প্রবর্তন ক'রে শিক্ষার্থীদের শিল্প শিক্ষার মান নির্ণয়ের কাঠামোগত পার্থক্য করা হয়েছে। অধিকাংশ প্রদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বহুমুখী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন ক'রে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত নির্বাচনের সুযোগ করা হয়েছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নানা ধরনের ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন—শিল্পগত, বাণিজ্যগত, কৃষিগত প্রভৃতি। বর্তমানে দেশে বহুমুখী বৃত্তি নির্বাচনের উপযোগী বহুমুখী বিদ্যালয় গ'ড়ে তোলা হচ্ছে ব্যাপকভাবে।

(১০) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা (University Education):

প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ত্রৈবার্ষিক পাঠ্যক্রম অনুসরণের পর দু'বৎসরের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে। কোনো কোনো স্থানে তিন বৎসরের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু করার সম্ভাব্য ফলাফল বিচার করা হচ্ছে। অনার্স কোর্সের শিক্ষার্থীদের জন্য দুই বৎসরের এবং অনার্স বিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য তিন বৎসরের পাঠ্যসূচী অনুসরণের কথাও চিন্তা করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, শিল্পশিক্ষ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাকে পুনর্গঠিত ক'রে তোলা হচ্ছে। নিছক পুঁথিগত চর্চার উপর জোর না দিয়ে গবেষণার উপর যাতে এই পর্যায়ের শিক্ষার বেশি গুরুত্ব পড়ে সে কথাও শিক্ষাবিদ্‌গণ পর্যালোচনা ক'রে দেখছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠনের যে পালা শুরু হয়, তার ফলে ভারতে ১৯৪৮ সালে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

কিণ্ডারগার্টেন

|

প্রাথমিক বিদ্যালয় (অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক)

| সাত বৎসর থেকে ১৪।১৫ বৎসর বয়সী

[এই পর্যায়ে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার বিষয়সূচী গৃহীত হয়, তবে বৃত্তিগত শিক্ষা বাদ দিয়ে দেওয়া হয় এবং বীজগণিত অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ে অঙ্ক থেকে বিদেশী ওজন,

দৈর্ঘ-প্রস্থ পরিমাপ ও মুদ্রা সংক্রান্ত আলোচনা বাদ দেওয়া হয়। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার মতো কোনো শিল্পকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষাদানের পরিবর্তে সাধারণভাবে পাঠদানের রীতি গৃহীত হয়।]

কারিগরী বা বৃত্তিমুখী বিদ্যালয়

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে এই শিক্ষা। এই শিক্ষা প্রাথমিক পর্যায়ের পর অনবচ্ছেদ ধারা (Continuation Schools) হিসেবে গণ্য হবে। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে জ্ঞানের সহিত ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীদের ফ্যাকটরী, ওয়ার্কসপ বা ছোটখাটো শিল্প-প্রতিষ্ঠানে হাতেকলমে শিক্ষা নিতে হবে। শিক্ষানবীশী করবার পর পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ভাতা দেওয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ের শিক্ষার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হবে—

ড্রয়িং, আর্ট ডিজাইন, শিল্প সংক্রান্ত কলাকৌশল ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য, হিসাবপত্র, বুক কিপিং, অর্থনীতি, কাটিং, পৌরনীতি, খেলাধূলা ও শরীরচর্চা। এই পর্যায়ের শিক্ষা তিন থেকে পাঁচ বৎসর ধরে চলবে।

ফ্যাক্টরী, ওয়ার্কসপ, অন্যান্য স্বাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা

যথাযথ শিক্ষায়তনে রিফ্রেসার কোর্স প্রবর্তন

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

এই পর্যায়ের শিক্ষা হবে তিন থেকে চার বৎসরব্যাপী। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের জন্য এই পর্যায়ের শিক্ষা হবে অবৈতনিক। এর পাঠ্যসূচীতে থাকবে কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান, বিদেশীভাষা (মুখ্যত ইংরেজি, তবে মাতৃভাষা হবে শিক্ষার মাধ্যম) পৌরনীতি শরীরচর্চা ও খেলাধূলা সম্পর্কে জ্ঞানদান।

দুই বৎসর থেকে তিন বৎসরের শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়

আইন, চিকিৎসাবিদ্যা ও অন্যান্য পেশাদারী বিদ্যালয় (তিন বৎসর থেকে পাঁচ বৎসরের পাঠ্যসূচী)

ফ্যাক্টরী ও ওয়ার্কসপ

ইঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরী (চার বৎসরের বিদ্যালয় বা পলিটেকনিক ধরনের)

পোস্ট-গ্রাজুয়েট বিদ্যালয়

কলা ও বিজ্ঞান (তিন থেকে চার বৎসর বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা)

পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ের শিক্ষা

রিফ্রেসার কোর্স

আমেরিকার শিক্ষাতন্ত্র নিম্নরূপ :

বয়স	বিদ্যালয়ের শ্রেণী		বিদ্যালয় বৎসর	
২২		নর্মাল স্কুল বা শিক্ষকশিক্ষণ বিদ্যালয়	গ্রাজুয়েট বিদ্যালয়	১৬
২১-২২			বিশ্ববিদ্যালয়	১৫
২০-২১				১৪
১৯-২০			প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	১৩
১৮-১৯				১২
১৭-১৮	পার্ট টাইম কনটুনিয়েসান বিদ্যালয়	চার বৎসরের হাই স্কুল	সিনিয়ার হাই স্কুল	১১
১৬-১৭				১০
১৫-১৬			জুনিয়ার হাই স্কুল	৯
১৪-১৫				৮
১৩-১৪	প্রাথমিক বিদ্যালয়			৭
১১-১২				৬
১০-১১				৫
৯-১০				৪
৮-৯				৩
৭-৮				২
৬-৭				১
৪-৬	কিণ্ডারগার্টেন	গৃহ		
২-৪	নার্সারি বিদ্যালয়			

বর্তমানে ভারতের শিক্ষাতন্ত্র নিম্নরূপ ঃ

	ভারতের শিক্ষাতন্ত্র	বিদ্যালয় বৎসর
	উচ্চতর গবেষণা	
বি.এল., বি.টি., বি.ই. প্রভৃতি	বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	২২ ২১ ২০
	ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রী কোর্স	১৯ ১৮
জুনিয়ার টেকনিক্যাল	উচ্চতর মাধ্যমিক (১২ বৎসরের মাধ্যমিক)	১৭ ১৬
টেকনিক্যাল ডিপ্লোমা কোর্স	উচ্চ মাধ্যমিক	১৫ ১৪
	জুনিয়ার হাই / উচ্চ বুনিয়াদী	১৩ ১২ ১১ ১০
	প্রাথমিক শিক্ষা	৯ ৮ ৭ ৬
	নার্সারি শিক্ষা	৫ ৪ ৩

Questions

1. Give an outline of educational system in India with reference to Primary, Secondary and Higher Education.

2. Discuss in the light of the recommendations of National Planning Commission, 1948, the educational ladder accepted in independent India.

References : 1. Report of the Secondary Education Commission
2. Report of the National Planning Commission, 1948.
3. Nurulla and Nayak—History of Education in India.
4. J. M. Sen—History of Elementary Education in India.

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

(Free and Compulsory Primary Education)

ঐতিহাসিক বিবর্তন (Historical Development) :

ভারতে বিশেষ ক'রে বাঙ্গলা দেশে যে এককালে প্রায় একলক্ষ পাঠশালা ছিল, তার প্রমাণ অ্যাডামস্-এর বিখ্যাত রিপোর্টের মধ্যে পাওয়া যায়।[১] পরাধীন ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি খুব উল্লেখযোগ্য নয়। (ইংরেজ এদেশে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করেছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে প্রকৃতভাবে সাক্ষর করে তোলা নয়—তাঁরা চেয়েছিলেন যে, কিছু কিছু লোক এমনভাবে শিক্ষা গ্রহণ করবে—যাঁরা ইংরেজ প্রবর্তিত শাসন কাঠামোর উপযুক্ত বাহন হিসেবেই গড়ে উঠবে মাত্র।) Downward filtration নীতির মাধ্যমে বড়জোর শিক্ষার প্রভাব কিছুটা নিম্নপর্যায়ে থিতিয়ে পড়বে, এই ছিল লক্ষ্য। নিছক লেখা, পড়া, অঙ্ক (Three R—Reading, Writing and Arithmatic)— শিক্ষা দান ছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের নির্ধারিত উদ্দেশ্য। ইংরেজ আমলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হলেও প্রাথমিক শিক্ষার সত্যিকার কোনো উন্নতি হয়নি। ১৯০৯ সালে মহামতি গোখেল প্রবর্তিত 'প্রাথমিক শিক্ষা বিল' ভারতে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি যখন কেন্দ্রীয় আইনপরিষদে 'প্রাথমিক শিক্ষাবিল' উপস্থাপন করেছিলেন, তখন ভারতবর্ষের শুভানুধ্যায়ীরা অনুভব করেছিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষাকে শুধু অবৈতনিক নয়, বাধ্যতামূলক ক'রে তুলতে হবে—যদি ভারতের মানুষকে অন্তত সাধারণভাবেও শিক্ষিত করে তুলতে হয়।

অ্যাডামের রিপোর্ট

১) ১৮৩৮ সালে অ্যাডাম সাহেব বলেছিলেন যে, বাঙ্গলা ও বিহারে এক লক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। প্রতি ৬৩টি শিক্ষার্থীর জন্য একটি ক'রে বিদ্যালয় ছিল। অ্যাডাম যে ধরনের শিক্ষালয়গুলির বর্ণনা করেছিলেন, গুণগত উৎকর্ষের দিক দিয়ে সেগুলি উৎকৃষ্ট না হলেও এই চিত্রের দ্বারা বোঝা যায় যে, পরবর্তিকালে ইংরেজ আমলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সঠিকভাবে হয়নি। ১৯৪৪-৪৫ সালের বাঙ্গলার রিপোর্টে জানা যায় যে, মাত্র ৪০,১২১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্তমান। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, প্রায় এক শতাব্দিকাল প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি যথার্থভাবে হয়নি।

কিন্তু আশ্চর্য, সারা পৃথিবীতে যখন অন্তত আট বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা গণতান্ত্রিক নাগরিকত্বের ন্যূনতম প্রয়োজন হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল, তখন ভারতের প্রাদেশিক সরকারসমূহ অন্তত পঞ্চম মান পর্যন্তও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা-পরিকল্পনা গ্রহণে বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করেননি।

১৮৯৬ সালে বোম্বাই গ্রাজুয়েট এসোসিয়েশনে মহামতি গোখেল বলেছিলেন যে, ভারতে সর্বসাধারণের শিক্ষার উন্নতি অত্যন্ত মন্দগতি। তিনি বলেছিলেন যে, যদি কোনো তুলনা করতে হয়, তবে তা ইংরেজের কার্য-কলাপের—তাঁরা ভারতে যে ধরনের কাজ করছেন সেই তুলনায় ইংলণ্ডে ও অন্যত্র সম্পূর্ণ অন্যরকম করছেন। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "Gentlemen, is it possible, is it conceivable that Englishmen could be more enthusiastic, more keen on this subject of the spread of the primary education than ourselves? To them at best, it can only mean the discharge of a great present duty. But to us it means the future salvation of our country. Who can realize more keenly than ourselves that the fate of our country is bound up with the spread of education among the masses?" ১৮৯৭ সালে মহামতি গোখেল ওয়েলবি কমিশনের সামনে বলেছিলেন যে, ইংরেজ ইংলণ্ডে শিক্ষাখাতে যে ব্যয় করছেন, ভারতবর্ষে তা করছেন না। "One cannot help thinking that it is all the difference between children and step-children. Out of every one hundred children of school-going age, eighty eight are growing up in darkness and ignorance and consequent moral helplessness." সরকার

মহামতি গোখেল কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার আন্দোলন

ইংরেজ কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট খরচ করেন, অথচ ভারতে শিক্ষার জন্য কিছু করেন না ব'লে তিনি সমালোচনা করেছিলেন কঠোর ভাষায়—"The Government cannot further the cause of education on the ground of their financial embarrassment, whereas a sum larger than the whole educational expenditure of Government was given away to its European

Officials with one stroke of pen." ১৯০০ সালে তিনি বোম্বাই ব্যবস্থা পরিষদে সরকারকে সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক ব্যয়বরাদ্দ ধরতে হবে। ১৯০২ সালে বাজেট বিতর্কে তিনি লর্ড কার্জনকে এই কথা বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে—যেখানে পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটি গ্রামে বিদ্যালয় নেই এবং দশজন শিশুর মধ্যে নয়জন নিরক্ষর, তখন ইংলণ্ডে প্রত্যেক শিশুকে বাধ্যতামূলক ভাবে বিদ্যালয়ে যোগদানের কথা বলা হচ্ছে এবং পনর বৎসরের মধ্যে সেখানে ৪০½ লক্ষ থেকে ১১০½ লক্ষ স্টার্লিং ব্যয় করা হচ্ছে। এই বক্তৃতার পর লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কিছু ব্যয়বরাদ্দ করেছিলেন এবং তার প্রত্যুত্তরে গোখেল বলেছিলেন যে, শিক্ষাকে সেনাবিভাগ ও রেলওয়ে বাজেটের সমপর্যায়ভুক্ত করে তুলতে হবে। ১৯০৫ সালে তিনি সরকারকে প্রাথমিক শিক্ষায় কিছু ব্যয়বরাদ্দ করবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে দেশব্যাপী অবৈতনিক করে তুলতে হবে। ১৯০৭ সালে তিনি বরোদারাজ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৯০৮ সালে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে বলেছিলেন, "The State should accept it as a sacred obligation resting on it to provide for the free and compulsory education of its children. No State, especially in these days, can expend too much on an object like education." গোখেলের এই ধরনের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও তাঁকে ১৯১০ সালে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রত্যাহার ক'রে নিতে হয় এবং ১৯১১ সালে যখন তিনি আবার সেই বিল উত্থাপন করেন তখন তা পরাস্ত হয়। এই বিল যারা পরাস্ত করেন তাঁরা যুক্তি হিসেবে বলেছিলেন যে, গোখেলের এই শিক্ষাবিল এমন কিছু নূতন উদ্ভাবিত জিনিস নয়—অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় ভারতের এক অস্পষ্ট প্রগতির কামনায় প্ররোচিত হ'য়ে এই বিল উত্থাপিত হয়েছে। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, এই পরিকল্পনার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। কেননা, উচ্চশিক্ষার প্রগতিকে রুদ্ধ করা হবে যদি প্রাথমিক শিক্ষার এত মূল্য স্বীকৃত হয় এবং শিক্ষার গুণগত ও সংখ্যাগত উন্নতি পর্যায়ক্রমিক না হ'লে তার কোনো মূল্যও নেই। গোখেল তার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দিয়ে বলেছিলেন যে, একটি সরকার ভালো কি মন্দ, তা বিচার করা যাবে তার শিক্ষাগত নীতি দিয়ে। সরকারের

অনুসৃত নীতিতে ২৮ বৎসরে মাত্র ১·২% থেকে ১·৯% ভাগ শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এসেছে ; অথচ, ইংলণ্ডে মাত্র ১০ বৎসরে সমগ্র শিক্ষার্থী এসেছে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায়। জাপান মাত্র ২০ বৎসরে তার সমগ্র শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় এনেছে। গোখেল চেয়েছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার অবৈতিক ও বাধ্যতামূলক নীতি অবিলম্বে প্রবর্তিত হোক। তিনি চান নি যে, তাঁর দেশবাসী অশিক্ষার অন্ধকারে একদিনও নিমজ্জিত হ'য়ে পিছিয়ে থাকুক। গোখেল প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে বলেছিলেন যে, "Elementary education for the mass of people means something more than a mere capacity to read and write. It means for them a keener enjoyment of life and a more refined standard of living. It means the greater moral and economic efficiency of the individual. It means the higher level of intelligence for the whole community generally. He who reokons these advantages lightly may as well doubt the value of light and fresh air in the economy of human health." অর্থাৎ, তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বলতে নিছক লেখা, পড়া ও অঙ্ক কষাকে মূল্য দেননি। তাঁর মতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য জনগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ছাড়াও আরো উন্নত ধরনের জিনিস। প্রাথমিক শিক্ষা জনগণকে এনে দেবে জীবনের আনন্দ, উন্নত ধরনের জীবন যাপন প্রণালী। ব্যক্তির মধ্যে এই শিক্ষা এনে দেবে অধিকতর নৈতিক ও অর্থনৈতিক যোগ্যতা। এ শিক্ষা সাধারণভাবে সমগ্র জাতির বুদ্ধি ও প্রতিভাকে উন্নত করবে। যারা এর উপযোগিতা অস্বীকার করবে তারা মানুষের স্বাস্থ্যের উপযোগী আলো-বাতাসকেই অস্বীকার করবে। আমাদের দেশে যারা মনে করতেন যে, গণশিক্ষা ততদিন পর্যন্ত সম্ভব নয়, যতদিন না দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীভূত হয়, গোখেল তাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে, সর্বপ্রকার জাতীয় উৎপাদন ও শক্তিসামর্থ্যের মূলভিত্তি হোলো সাধারণ শিক্ষার বুনিয়াদ। বারংবার তাঁর বিল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর গোখেল শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন উদাত্ত স্বরে—"This bill thrown out today will come back again and again, till on the stepping stones of its dead selves, a measure ultimately rises which will spread the

light of knowledge throughout the Land." আমরা আরো আশ্চর্য হ'য়ে যাই যখন শুনি যে, ১৯৪৪ সালে স্যার জন সার্জেণ্ট আট বৎসরের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে দেশবাসীকে আরো চল্লিশ বৎসর অপেক্ষা করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ভারতে প্রাথমিক শিক্ষা কি ধরনের হওয়া উচিত, এ সম্পর্কে 'হার্টগ কমিটি' ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন—"We cannot accept the view that the Central Government should be entirely relieved of all responsibility for the attainment of Universal Primary Education. It may be that some of the provinces, inspite of all efforts, will be unable to provide the funds necessary for that purpose, and the Government of India should therefore be constitutionally enabled to make good such financial deficiencies in the interest of India as a whole. In England, special measures are taken to finance the education of the necessitous areas and we think it desirable in the interests of India as a whole, that similar means should be taken in this country." অর্থাৎ, এই কমিটির মতে কেন্দ্রীয় সরকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। এমন হোতে পারে যে, কোন কোনো প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে ভারতের সামগ্রিক স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত এগিয়ে এসে আর্থিক অসুবিধা দূর করা। ইংলণ্ডে প্রয়োজনীয় এলাকার শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহের যে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে, ভারতবর্ষেও তেমনটি হওয়া সমীচীন।

হার্টগ কমিটির রিপোর্ট

বাঙ্গলাদেশে ১৯৩০ সালে "Bengal (Rural) Primary Education Bill" পাশ হয়। এই আইনের দ্বারা এই নীতি গৃহীত হয় যে, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করা হবে। আশ্চর্যের বিষয়, এই আইন রচিত হলেও ১৯৩৮ সালের পূর্বে কোথাও এ ব্যবস্থা কার্যকরী হয়নি। এই আইনের পূর্বে ১৯১৯ সালে মিউনিসিপ্যাল আইনের সাহায্যে কতকগুলি সুনির্বাচিত মিউনিসিপ্যাল এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ভাবে চালু

করবার চেষ্টা হ'লেও আশানুরূপ কোনো ফল দেখা যায়নি। ১৯৩৮ সালের পূর্বে বাঙ্গলাদেশে প্রধানত নিম্নলিখিত ধরনের প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু ছিল :

(১)	শিশুশ্রেণী	নিম্ন-প্রাথমিক
(২)	প্রথম শ্রেণী	
(৩)	দ্বিতীয় শ্রেণী	
(৪)	তৃতীয় শ্রেণী	উচ্চ-প্রাথমিক মক্তব (কোরান শিক্ষা আবশ্যিক)
(৫)	চতুর্থ শ্রেণী	

কিন্তু আশ্চর্য, বাঙ্গলাদেশে ও ভারতবর্ষে ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা এক ভাগ মাত্রও বাড়েনি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতিসূচক সংখ্যা হিসেবে। এমন কি আরো দেখা যায় যে, অ্যাডাম-এর রিপোর্টের তুলনায় একশত বৎসর পরেও ভারতবর্ষে ৩৩০ জন শিক্ষার্থী-পিছু মাত্র একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৩২-৩৭ সালের ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্টে জানা যায় যে, প্রায় চার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমেছে। বাঙ্গলাদেশের ৬৪,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়-সংখ্যা ১৯৩৯-৪০ সালে এসে দাঁড়ায় ৫৪, ৪৬০-এ ১৯৪৫-৪৬ সালে তা দাঁড়ায় ৪০,১০৮।[১] অবশ্য এই সংখ্যা কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ হোলো নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমন্বয়-করণ ও আরো উন্নততর ব্যবস্থাপনা গ্রহণ। তথাপি শিক্ষার গুণগত দিক বিচার করলে এই উন্নতি আদৌ সমর্থন-যোগ্য নয়। এই জাতীয় উন্নতিতে ভারত সরকার আত্মসন্তুষ্ট হলেও এবং প্রকৃত পক্ষে ছাত্রসংখ্যা ১৫ লক্ষ বেশি হলেও শতকরা ৮৪ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। যারা বিদ্যালয়ে যোগদান করেছিল তার মধ্যে আবার শতকরা ৭২ জন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষার কোনো মর্মই অনুধাবন করতে পারলো না। প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এমন শোচনীয় অপচয় (wastage) আর কোনো দেশে হয়েছে কিনা বলা কঠিন। যখন ভারতীয় সংবিধানের ৪৫নং অনুচ্ছেদে ভারতে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার নীতি গৃহীত হয়, তখন ভারতবর্ষে এই

বাঙ্গলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষা

১। কে. ডি. ঘোষ,—আমাদের শিক্ষা, ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা, পৃঃ ৪৬–৪৭ দ্রষ্টব্য।

আশা করা হয় যে, অচিরে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতি মুক্তি পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, যে লক্ষ্য মনে রাখা হয়েছিল ১৯৬০ সাল পর্যন্ত তা অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার যুগান্তকারী পরিবর্তন সম্পর্কে সর্বপ্রথম মহাত্মা গান্ধী ১৯৩৭ সালে বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণের কথা বলেন। তিনি ৭ বৎসর থেকে ১৪ বৎসরের শিশুদের জন্য ইংরেজি ব্যতীত মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা অর্জনের ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা (Wardha Scheme) সমালোচনার বিষয়বস্তু হলেও অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমন—

(১) এই পরিকল্পনায় ৭-১৪ বৎসর পর্যন্ত শিল্পকেন্দ্রিক (craft centric) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলা হয়। ইংরেজি ব্যতীত এই শিক্ষার মান মাধ্যমিক পর্যায়ের হবে।

(২) শিক্ষার ব্যয়ভার অনেকখানি রাষ্ট্র গ্রহণ করবে—এই মূলনীতি ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় গৃহীত হয়।

মহাত্মা গান্ধীর পরিকল্পনা

(৩) শিল্পসূচীতে পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুযায়ী বৃত্তিকেন্দ্রিক শিল্পনীতির সঙ্গে মাতৃভাষা, অঙ্ক, সমাজপাঠ ও সাধারণ বিজ্ঞান, চিত্রাঙ্কণ, সংগীত, নৃত্য, চারুকলা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

(৪) মহাত্মাজী 'Go back to village'-এর শ্লোগান দিয়েছিলেন। গ্রামকে ভালোবেসে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা এই পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

(৫) যে সব শিক্ষার্থী প্রতিভাসম্পন্ন, তাদের উচ্চশিক্ষার জন্য স্থানান্তরিত করা।

মহাত্মা গান্ধীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনাকে মূলত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কেউ কেউ বিচার করেছেন—

(ক) তিনি শাশ্বত মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং কর্মমূলক শিল্পকে শ্রদ্ধা করেছেন।

(খ) কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার নীতিকে তিনি গ্রহণ করেছেন—যা জন ডিউই, রুশো প্রভৃতির শিক্ষানীতিতে স্বীকৃত সত্য।

(গ) তিনি গোখেল প্রবর্তিত অবৈতনিক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দাবিকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার জন্য প্রচেষ্টা নিয়েছেন।

মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষার যে মূলনীতি নির্ধারণ করেছিলেন, তা নিম্নরূপ :

(১) শিক্ষা হবে আত্মনির্ভরশীল।

(২) হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা হবে।

গান্ধীজী অবশ্য বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর শেষ বাণীতে "Learning through craft"-এর কথা বাদ দিয়েছিলেন।

গান্ধীজী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ ওয়ার্ধা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন ; যথা—

(১) মাতৃভাষা

(২) স্বাস্থ্য ও সামাজিক শিক্ষা

(৩) সাধারণ বিজ্ঞান

(৪) বৃত্তি

(৫) অঙ্ক

(৬) সংগীত, নৃত্য ও অঙ্কন

(৭) বাগানের কাজ, ব্যায়াম ও সৌন্দর্যপূর্ণভাবে অবয়ব পরিচালনা।

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানকে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন এবং বিদেশী ভাষাকে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করেননি। তিনি তাঁর শিল্পপ্রণালীকে বৃত্তিকেন্দ্রিক ও অনুবন্ধসম্মত (principle of correlation) করে তুলেছেন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেব আদিম মানব সমাজের গল্প, প্রাচীন সভ্যতায় মানুষের জীবন ও কর্মধারা, দেশ-দেশান্তরের মানুষের জীবন-কাহিনী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, সামাজিক অভ্যাস ও দায়িত্ববোধ-মূলক নানাধরনের কর্ম, হাতের কাজ ও বৃত্তি ব্যক্তিগতভাবে ও সহযোগিতা-মূলকভাবে করা, খেলাধূলো, পরিবেশ-পরিচিতি ও পরিবেশ সুন্দর করে রাখার অভ্যাস অর্জন, গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি মমত্ববোধ সঞ্চার, শরীর চর্চা, সাধারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষাদানের জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। এতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য.ছিল নিছক লেখা, পড়া ও অঙ্ক কষা। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যকে সম্প্রসারিত করে নিছক পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তে আনন্দজনক শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়ে এক

যুগান্তর সৃষ্টি করলেন। দেশের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থায় সকলেই নূতন ধরনের শিক্ষার জন্য উন্মুখ ছিল এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে দেশের অগণিত দেশপ্রেমিক গান্ধীজীর আন্তরিকতায় সন্দেহ না করে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়ে পড়েন। ১৯৩৭ সালে 'ভারত সংস্কার আইন' চালু হলে কংগ্রেস নয়টি প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করলে পর বুনিয়াদী শিক্ষাকে কার্যকরী করবার প্রচেষ্টা দেখা দেয়। বাঙ্গলাদেশে এ বিষয়ে খুব কম উৎসাহ দেখা গেলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ বেশি দেখা যায় এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী ও সার্জেন্ট প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি অনুসরণ করবার প্রচেষ্টা হয়। মহাত্মা গান্ধীর নীতি সার্জেন্ট কর্তৃক আংশিক স্বীকৃত হওয়ায় ওয়ার্ধা পরিকল্পনা সম্পর্কে সারা দেশে আরো গুরুত্ব বেশি হয়। অবশ্য কেহ কেহ গান্ধীজির পরিকল্পনার সঙ্গে সার্জেন্টের পরিকল্পনার মূল সামঞ্জস্য অনুধাবন করে প্রাথমিক শিক্ষায় বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। মহাত্মাজীর ওয়ার্ধা পরিকল্পনা হুবহু অনুসরণ না করে তার যাথার্থ্য গ্রহণ করবার উপদেশ অনেকে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে মহাত্মাজী তৎকালীন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষাদর্শন উপস্থাপন করেছিলেন, যার মর্মার্থ কেবলমাত্র অনুধাবন করলে ভালো হয়। বুনিয়াদী শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধারণা কোনো একটা স্থিতিশীল ধারণা নয়।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন—

"Basic Education is a great experiment. We must be prepared to develop, modify and adopt it to meet the needs of towns and villages, and of industrial and agricultural areas.'

পণ্ডিত নেহরু বলেছিলেন—"The approach to education should not be too rigid and should allow free play for experiment and the development of the industrial and of the society we aim at. In any experiment, there must be variety. There is always the danger of too much orthodoxy killing the spirit and preventing the development of an inquisitive and experimental mind."

মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তাধারার পর স্যার জন সার্জেন্টের নেতৃত্বে ১৯৪৪ সালে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা-উপদেষ্টা

পরিষদের (Central Advisory Board) এক রিপোর্ট প্রকাশ করেন—যা সার্জেন্টের নামানুসারে 'সার্জেন্ট রিপোর্ট' নামে খ্যাত হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এই রিপোর্ট সার্জেন্টের নামানুসারে রচিত হলেও ভারতের বিভিন্ন মনীষীদের সহযোগিতা ব্যতীত এই রিপোর্ট রচিত হোতো না। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার মূল আদর্শকে চোখের সামনে রেখে এই রিপোর্ট রচিত হয়। সর্বস্তরের শিক্ষা নিয়ে যথেষ্ট মতামত প্রকাশ করা হয়েছে এই সুবিখ্যাত রিপোর্টে। সার্জেন্ট পরিকল্পনায় সমগ্রভাবে মানুষের জীবনের সর্বপ্রকার শিক্ষার কথা আলোচনা করা হয়েছে। মহাত্মাজী সাত বৎসর বয়স থেকে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু এই রিপোর্টে ছয় বৎসর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া বাধ্যতা-মূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নার্সারী (৩ বৎসর থেকে ৫ বৎসর) শিক্ষার কথা বলা হয়েছে—যা আমাদের দেশে একেবারে নূতন শিক্ষাচিন্তা। এই স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক হবে, কিন্তু বাধ্যতামূলক নয়। শিশুর চাহিদা ও সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে আনন্দজনক কর্মের মধ্য দিয়ে উপযুক্ত পরিবেশে শিক্ষয়িত্রীর পরিচালনায় এই নার্সারী বিদ্যালয় কাজ করবে, এই হোলো সার্জেন্ট পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রাথমিক ও পরবর্তী শিক্ষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ওয়ার্ধা ও সার্জেন্ট পরিকল্পনার সাদৃশ্য ও পার্থক্য আমরা নিম্নলিখিত ভাবে দেখতে পাই :

ওয়ার্ধা পরিকল্পনা

১। ৭-১৪ বৎসর—অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা—শিক্ষার ব্যবস্থার রাষ্ট্র কর্তৃক আংশিক গ্রহণ ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ শিক্ষা—মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দান।

(১৯৩৭ সাল)

২। নঈ তালিম : (১৯৪৫ খ্রী:) বুনিয়াদী শিক্ষার চারিটি স্তর—

(১) পূর্ব-বুনিয়াদী শিক্ষা

(২) বুনিয়াদী শিক্ষা

(৩) উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা

(৪) বয়স্ক শিক্ষা

সার্জেন্ট পরিকল্পনা

১। ৬-১৪ বৎসর—অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা।
৬-১১ বৎসর নিম্নবুনিয়াদী
১২-১৪ বৎসর উচ্চবুনিয়াদী

২। ১৪-১৬ বৎসর—নিম্ন টেকনিক্যাল বিদ্যালয়

৩। ১১-১৭ বৎসর—অ্যাকাডেমিক বা সাধারণ বিদ্যালয়

৪। ১১-১৭ বৎসর—শিল্পমুখী বিদ্যালয় (উচ্চ)

৫। ১৭-২০ বৎসর—ডিপ্লোমা কোর্সযুক্ত উচ্চ টেকনিক্যাল বিদ্যালয়

৬। ২০-২২ বৎসর—ঐ, উচ্চতর

৭। ১৭-২০ বৎসর—বিশ্ববিদ্যালয়

সার্জেন্ট পরিকল্পনা ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর এনে দিয়েছে। মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার মূল নীতিকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্য এই পরিকল্পনা শিক্ষাবিদ্‌দের কৌতূহল ও উৎসাহ সৃষ্টি করে। এই পরিকল্পনায় সর্বপ্রথম শিক্ষার সামগ্রিক চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। এত ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে এই পরিকল্পনা রচিত যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শিক্ষা-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একে অনেকে "ম্যাগনাকার্টা" বলে অভিহিত করে থাকেন। প্রাক্-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ সর্বপ্রথম সার্জেন্ট পরিকল্পনা করেন। এই পর্যায়ের শিশুরা (৩ থেকে ৫ বৎসর পর্যন্ত) আনন্দজনক কর্মের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ানুভূতির শিক্ষা লাভ করবে যোগ্য শিক্ষয়িত্রীর অধীনে। কলকারখানা প্রভৃতি নানা জীবিকায় ব্যস্ত নরনারী তাঁদের সন্তানসন্ততিদের এইভাবে নার্সারী বিদ্যালয়ে রেখে জীবিকার্জনে যেতে পারেন, এই ছিল নার্সারী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে বৃত্তিশিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নানাপ্রকার বৃত্তির মধ্য থেকে যে-কোনো বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ পায়। ওয়ার্ধা পরিকল্পনার উৎপাদনাত্মক নীতিতে যে আত্মনির্ভরশীল অর্থনৈতিক শিক্ষার কথা ছিল, সার্জেন্ট তা অবিকল গ্রহণ না করে উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে অনুরূপ ব্যবস্থা আংশিকভাবে গ্রহণের সুপারিশ করেন। সার্জেন্ট পরিকল্পনার আর একটি বিশেষত্ব হোলো এই যে, এতদিন পর্যন্ত গতানুগতিক শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর চাহিদার প্রতি কোনো নজর দেওয়া হোতো না, শুধুমাত্র পুঁথিগত জ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হোতো। সেই স্থলে সার্জেন্ট পরিকল্পনা প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে নাগরিকত্বের উন্মেষ সাধনের জন্য নানাপ্রকার খেলাধূলা, গানবাজনা, নাচ, অভিনয়, বিতর্ক প্রভৃতি আনন্দজনক উপাদানকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গরূপে বিবেচনা করে এক নূতন শিক্ষার আদর্শ খাড়া করলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে, অর্থাৎ নিম্নবুনিয়াদী স্তরে সার্জেন্ট পরিকল্পনা ইংরেজিভাষা শিক্ষাদানকে স্বীকার করেননি, কিন্তু উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ওয়ার্ধা পরিকল্পনায় কিন্তু উচ্চ বুনিয়াদী স্তর পর্যন্ত সম্পূর্ণ মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সার্জেন্ট পরিকল্পনা আবশ্যিক ও বাধ্যতা-মূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে গিয়ে শিক্ষক সংগ্রহ ও আর্থিক

অসুবিধার কথা বিশেষভাবে বলেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, প্রায় চল্লিশ বৎসর লাগবে আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাকে কার্যকরী করতে এবং এজন্য আনুমানিক ব্যয় হবে ২০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টে সার্জেণ্ট বলেছিলেন যে, "It is for India to decide whether time has arrived when a national system of education is a paramount necessity." তিনি আরো বলেছিলেন,—"If India continues to evade her responsibilities in the march to the goal of social security, she must be content to relegate herself to a position of permanent inferiority in the society of civilized nations. In every country in the world which aspires to be regarded as civilized, with the exception of India, the need for a national system of education which will provide the minimum preparation for citizenship has been accepted." কিন্তু সার্জেণ্টের এ কথা মনে ছিল না যে, গোখেলের নেতৃত্বে ভারতের জনসাধারণ সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষার দাবি বহুদিন পূর্ব থেকে করে এসেছে। সার্জেণ্টের পরিকল্পনা যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য এবং অর্থাভাবে কার্যকরী হয়ে উঠেনি।

১৯৪৮-৪৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার School Education Committee নামে একটি কমিটি ২৪ জন সভ্যকে নিয়ে গঠন করেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরী এই কমিটির সভাপতি এবং ডক্টর ক্ষেত্রপাল ঘোষ সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই কমিটি মন্তব্য করেন যে, ৬ বৎসর থেকে ১১ বৎসর পর্যন্ত নিম্নবুনিয়াদী (জুনিয়ার বেসিক) এবং ১২ বৎসর থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত উচ্চবুনিয়াদী (সিনিয়র বেসিক) এই দুই ধরনের বিদ্যালয় গঠন সমীচীন। বুনিয়াদী শিক্ষায় শিল্পশিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ে কমিটি ইংরেজি ভাষাকে ঐচ্ছিক হিসেবে গ্রহণের কথা বলেন। কিন্তু উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষাদানের কথা বলেন। নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষার শেষে Public Examination দরকার নেই বলে কমিটি মনে করেন।

বর্তমানে আমরা পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত এই কয়টি ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখতে পাই :

(১) নার্সারী বিদ্যালয়

(২) নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৪) এক-শিক্ষক সম্বলিত বিশেষ বিদ্যালয়

(৫) উচ্চ বিদ্যালয়, উচ্চতর বিদ্যালয়, জুনিয়ার হাইস্কুলের পঞ্চম মান

(৬) সরকার নিয়ন্ত্রিত (Government Sponsored) প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৭) বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়

(৮) কর্পোরেশান ও মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়।

আমরা ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে, ১৮৫৪ সাল পর্যন্ত Downward Filtration নীতি গৃহীত হয়েছিল। এই সময় পর্যন্ত চিরাচরিত পাঠশালা, টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতির উপর কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ১৮৫৪ সালেও আমরা দেখতে পাই যে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্যদানের নীতি অনুসরণ করা হয়নি। জনসাধারণ নিজেদের ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপনে এসময় সক্ষম ছিল না। তাছাড়া, তাদের পক্ষে মাহিনা দেওয়ার কোনো ক্ষমতাও ছিল না। অথচ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যদানের কোনো বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা হয় নি। সরকার যেটুকু নামমাত্র সাহায্য করতেন, তা ১৮৫৯ সালে স্ট্যানলির ডেসপ্যাচের (Stanley's Despatch) পর সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষায় সরকারী সাহায্যদানের কোনো অর্থ হয় না। এতে বলা হয় যে, সরকার প্রাথমিক শিক্ষার সরাসরি দায়িত্ব নেবেন এবং করধার্যের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হবেন। বিভিন্ন প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ধার্য হয় কিন্তু বাঙ্গলাদেশে তা হয় না। তার কারণ লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারদের উপর করধার্য করেন—যার ফলে এই অতিরিক্ত করধার্য আইনসঙ্গত বলে গণ্য হয়নি। এরপর প্রাথমিক শিক্ষার সরকারী নীতি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। প্রত্যেক প্রদেশ তার নিজস্ব নীতি অনুসরণ করতে উদ্যোগী হয়। উডের ডেসপ্যাচকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয় এবং তার ফলে কোনো কোনো প্রদেশ সরকারী সাহায্যদানের নীতি বা কোনো কোনো প্রদেশ 'সেস' বা কর আদায় করার নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে কোনো সুষ্ঠু ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, আসাম ও উত্তরপ্রদেশে করধার্যের নীতি গৃহীত হয়। বোম্বাই ও

আরো কয়েকটি প্রদেশে চিরাচরিত প্রাথমিক ও 'মিড্‌ল' (Middle) বিদ্যালয়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ক'রে সরকার নূতন নূতন রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হন। অবশ্য এই সমস্ত বিদ্যালয়ে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয় এবং আধুনিক গৃহ ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়। এক কথায় এদের যে সমস্ত সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়, তা চিরাচরিত বিদ্যালয় থেকে অনেক বেশি। এর ফলে নূতন ও পুরাতন বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। পুরাতন বিদ্যালয়-গুলি ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং রাষ্ট্র পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে উঠে। বাঙ্গলা এবং মাদ্রাজের কতকাংশ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত প্রদেশে প্রাচীন বিদ্যালয় অবলুপ্ত হয়ে যায়। বাঙ্গলাদেশে ১৮৭১ সালের পূর্ব পর্যন্ত কোনো শিক্ষাকর ধার্য হয়নি। ১৮৭১ সালের পর সেক্রেটারী অফ স্টেটকরধার্য অনুমোদন করেন। কিন্তু ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বাঙ্গলাদেশে কোনো করধার্য করা সম্ভব হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলা, মাদ্রাজ ও আসামে আংশিকভাবে চিরাচরিত বিদ্যালয় রক্ষার জন্য যে চেষ্টা হয়েছিল অন্য প্রদেশে তা হয়নি। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাষ্ট্রীয় আদর্শে পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৮টি। তখন প্রাইভেট বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠ্‌তে আরম্ভ করে এবং যেগুলি তা হোতে পারেনি সেগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি আদৌ উল্লেখযোগ্য হয়নি। অ্যাডাম শিক্ষার হার দেখিয়েছিলেন ৬'১% ভাগ; কিন্তু ১৯২১ সালে গিয়ে তা দাঁড়ায় মাত্র ৬'৩% ভাগ। গুণগত দিক দিয়ে এই সুদীর্ঘ সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার কোনো অগ্রগতি হয়নি। সংখ্যার দিক দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে তা চলতে পারেনি। অগ্রগতির লক্ষণ প্রকাশিত না হওয়ার কারণস্বরূপ বলা হয় যে, একদিকে যেমন শিক্ষাবিস্তারে জনগণের আগ্রহ ছিল না, তেমনি শিক্ষাকর যা আদায় হোতো তা গ্রাম্য বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় না করে অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল। এমন কি এই শিক্ষাকর হিসেবে অর্জিত অর্থ উচ্চশিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয় ও শহরের উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় করা হোতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই অর্থ প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই একমাত্র ব্যবহার করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না হয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নামমাত্র ব্যয় করা হয়। এর ফলে প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঠিকমতো বেড়ে উঠ্‌তে পারেনি। হাণ্টার কমিশন (Hunter Commission) লক্ষ্য করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষাকর ব্যয়িত হচ্ছে না। তাই, এই কমিশন মন্তব্য করেন যে, গ্রাম্য ফণ্ড (rural fund) একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে ব্যয়িত হোতে পারবে না। শাসনগত দিক দিয়ে আর একটা ভুল দেখা দেয় যে, প্রাথমিক শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় এক্তিয়ার থেকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা—যেমন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা পর্ষত প্রভৃতির হস্তে সরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু, এই সমস্ত সংস্থা সঠিকভাবে শিক্ষার দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ না করায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র বড়ো অবহেলিত রয়ে গেল। অধিকাংশ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার সভ্য হয় অশিক্ষিত, না হয় খুব বেশী উৎসাহী। ফলে শিক্ষার চাহিদা পূরণের জন্য যে সমস্ত গুণাবলীর প্রয়োজন ছিল তা তাদের ছিল না। ইংরেজশাসনে শহরের দিকে দৃষ্টি ছিল বেশি—মফঃস্বলগুলি একেবারে অবহেলিত ছিল। এর ফলে বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও গণশিক্ষার প্রসার তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু হয়নি। চিরাচরিত বিদ্যালয়গুলি কোনোরূপ আনুকূল্য না পাওয়ায় এবং মফঃস্বলকে একেবারে অবহেলা করার ফলে বিংশ শতকের গোড়ায় দেখা গেল যে, এই জাতীয় বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আর রইল না।

একটি জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি তার শিক্ষার হার দেখে পরিমাপ করা যায়। অশিক্ষিত মানুষদের দমন করে রাখার চেয়ে শিক্ষার সাহায্যে মার্জিত ও শিক্ষিত জনগণকে শাসন করা সোজা। এই সহজ সত্য কথাটি যে ইংরেজদের জানা ছিল না, তা নয়। কিন্তু তারা শিক্ষার ব্যাপারে দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এসে কতকগুলি অসুবিধারও সম্মুখীন হয়। দেশের বেশির ভাগ মানুষের আর উপায় কিছুই ছিল না বলা চলে। তার উপর ভারতবর্ষে জনসংখ্যার হার নিত্যই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এর ফলে সরকার দীর্ঘসূত্রতার নীতি নিয়ে এগোনোর চেষ্টা করেন মাত্র!

উনবিংশ শতাব্দীতেও ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে যে কথা উঠেনি, তা নয়। অ্যাডাম সর্বপ্রথম প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে আইন জারী করবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১৮৫০ সালের দিকে ইংরেজ কর্মচারীরা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কর ধার্যের প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁরা প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করবার জন্য আইন তৈরির কথাও বলেছিলেন। এই সময় ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং

সেজন্য করধার্য করার প্রস্তাব নিয়ে আন্দোলন চলছিল। খুব স্বাভাবিক ভাবে ভারতের ইংরেজ কর্মচারীরা এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের ডি. পি. আই. এই আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়ে ১৮৫৩ সালে একটি বিল প্রণয়ন করেন; কিন্তু তা কার্যকরী হয়নি। ১৮৭০ সালের দিকে ইংরেজ শিল্প উন্নয়নের প্রতি মনোযোগী হ'লে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে ইংরেজের সংযোগ বাড়তে থাকে। এর ফলে ক্রমশ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য স্বীকৃত হোতে থাকে, কিন্তু তবুও এই আন্দোলন সঠিক কোনো আকার নিতে পারেনি। ১৮৮৫ সালে ভারতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হোলো এবং এর ফলে দেশে একটা বিদেশী আবহাওয়া বইতে শুরু করলো। হাণ্টার কমিশন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বললেও তা যথার্থ কোনো আকার নেয়নি। সরকার এ সম্বন্ধে কিছু করবার জন্য এগিয়ে আসেননি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় লর্ড কার্জনের নীতির প্রতিবাদে এবং কোরীয় ও রুশ-জাপান যুদ্ধের অনিবার্য ফলে ভারতে এক অপূর্ব ধরনের জাতীয়তাবাদ আন্দোলন দেখা দিলে পর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এই সময় বরোদা রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার পরীক্ষা শুরু হয় এবং সেই পরীক্ষার সাফল্যের দিকে সারা ভারতের দৃষ্টি পড়ে। স্যার ইব্রাহিম রহমান, জিন্না, স্যার চিমনলাল, প্যাটেল ভাই এই আন্দোলনে নেতৃত্ব করেন। মহামতি গোখেল সর্বপ্রথম ইম্পিরিয়াল লেজিস্‌লেটিভ্ কাউন্সিলে শিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব তোলেন। ১৯১১ সালে তিনি একটি বিল উত্থাপন করেন। মহামতি গোখেল জানতেন যে, ইংরেজ সরকার বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে উদাসীন, এমন কি বিরোধীও বটে। ইংরেজরা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষার প্রসারতা ঘটিয়ে নিজেরা জনপ্রিয়তা হারাতে রাজী ছিলেন না। তার উপর দেশের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনগ্রসর। বিভিন্ন জাতি ও পেশায় বিভক্ত ভারতীয়রা শিক্ষার চেয়ে কৃষির দিকে বেশি সজাগ ছিল। এ সব নানা কারণ প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে তোলার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে। এ ছাড়া অর্থনৈতিক অসুবিধাও প্রকাণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। গোখেল এই সমস্ত দিক ভেবেচিন্তে তাঁব বিলটি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাতে তা পাশ হ'য়ে যায়। তাঁর এই বিলটি ১৮৭০ সালের ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনের ধারা অনুযায়ী তৈরি হয়। তিনি প্রধানত বলেছিলেন—

(১) শিক্ষাকে স্থানীয় সংস্থার হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

(২) তিনি নারী-শিক্ষার কথা উত্থাপন করেন এবং ৬ থেকে ১০ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেন।

(৩) কোনো আইন তাড়াতাড়ি না করে যে-কোনো কাজে সরকারের অনুমোদন চাই।

কিন্তু তাঁর এই বিল সারা ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলের জন্য রচিত হলেও এবং শহর এই পরিকল্পনা গ্রহণে উদ্যোগী থাকলেও মফঃস্বল সেরূপ উদ্যোগী ছিল না। তিনি সরকারকে শিক্ষার জন্য $\frac{1}{3}$ অংশ ব্যয় করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর এই বিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও স্থানীয় সংস্থাসমূহ কর্তৃক সমর্থিত হলেও সরকার, দেশীয় রাজ্য এবং প্রতিক্রিয়াশীল ভারতবাসী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বলেন যে, নারীশিক্ষার প্রসার ঘটলে সমাজের নৈতিক মান ভেঙে পড়বে। মহামতি গোখেলের এই বিল শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়নি। তিনি গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি পরাজয়ের মধ্য দিয়েই দেশকে সেবা করবেন।

গোখেলের এই বিলের প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়ায় ভারতের শিক্ষিত সমাজ বাধ্যতামূলক সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দিকে অধিকতর আকৃষ্ট হন। একে কার্যকরী করার বাস্তব ব্যবস্থা সম্পর্কে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল, তখন ১৯১৯ সালের ভারত সরকারের আইন অনুযায়ী প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন নীতি স্বীকৃত হোলো। ১৯২১ সালে শিক্ষার দায়িত্ব প্রাদেশিক মন্ত্রীদের উপর ন্যস্ত হোলো। রাজনৈতিক অধিকার দানের নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে জনগণের শিক্ষার উপর অনিবার্যভাবে গুরুত্ব স্বীকৃত হয়। মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতাবর্জন ও নারীদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে সারা ভারতে এক আন্দোলন গড়ে তোলেন। দেশে এক সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা দেয় এবং অনিবার্যভাবে গণতান্ত্রিক নতুন জীবনের জন্য সারাভারতের মানুষ উন্মুখ হয়ে ওঠে। এরই অনিবার্য পরিস্থিতিতে ১৯৫১ সালের ভারতীয় সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব স্বীকৃত হয়।

১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত প্রায় ভারতের সকল প্রদেশে একই ধরনের আইন চালু ছিল। বোম্বাই-এ প্যাটেল-আইন নামে যে আইন পাশ

হয়, তা গোখেলের বিল অনুযায়ী তৈরী হয়, তবে যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি এতে ছিল তা গোখেলের বিলে ছিল না। প্যাটেল-আইন প্রাথমিক শিক্ষাকে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল এবং সরকার স্থানীয় সংস্থাকে সাহায্য করতেও পারেন, বা নাও করতে পারেন—এই নীতি মেনে নিয়েছিল। বাঙ্গলাদেশেও অনুরূপভাবে ১৯১৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা আইন (Primary Education Act) পাশ হয়। ১৯৩০ সালে বাঙ্গলা (গ্রাম্য) প্রাথমিক শিক্ষা বিল (Bengal Rural Primary Bill) তৈরী হয়। এই আইনের ফলে প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য একটি শাসনতন্ত্র গড়ে তোলা হয়। স্কুলবোর্ডগুলি অ্যাডহক সংস্থা (Ad hoc body) হিসেবে গড়ে উঠে। এই স্কুলবোর্ডগুলি গণতান্ত্রিক নিয়মে সুসংগঠিত নয়, ফলে ১৯৩০ সালের আইনে প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় কমিটি (Central Primary Education Committee) গঠনের কথা থাকলেও তা কার্যকরী হোয়ে উঠতে পারেনি। এখনও পর্যন্ত প্রাথমিক-শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো সুষ্ঠু-শাসনতন্ত্র গড়ে তোলা হয়নি। দেশ স্বাধীন হলেও প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা যেরূপ আন্তরিকতার সঙ্গে সমাধান করা উচিত ছিল, তা করা হয়নি। ১৮৮২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে স্থানীয় সংস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন জেলা স্কুলবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির জন্য সামগ্রিক ভাবে নীতি নির্ধারক-কোনো সুষ্ঠু-প্রাদেশিক সংস্থা গঠন করা করা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যা ব্যাপক ও জটিল বলে এ সমস্যা সমাধানের জন্য কোনো পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত ঐক্যপূর্ণ নীতি অনুসরণ করা হয়নি। ফলে আজিও প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনের দিকে আন্তরিক কোনো লক্ষ্য নেই। স্থানীয় সংস্থাগুলি পূর্বে বিদ্যালয়-গুলির উপর নিজেদের কর্তৃত্ব পরিচালনা করতো, রাষ্ট্র কখনো তাদের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায়, পাঠ্যসূচী নির্ধারণে এবং সরকারী পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতো না। ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলিও উপযুক্ত অর্থসংগ্রহ করতে না পেরে আন্তরিকতা-পূর্ণ ভাবে কোনরূপে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতো। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে জনগণের মনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা জেগেছে —ক্রমে ক্রমে অনেক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। সরকার অর্থানুকূল্য করছেন এবং শাসন পরিচালনার ব্যাপারে জিলা স্কুলবোর্ডগুলির কার্যকলাপ লক্ষ্য করছেন এবং পাঠ্যসূচী প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তথাপি প্রাথমিক

শিক্ষার ক্ষেত্রে আজিও জেলা স্কুলবোর্ড এবং শিক্ষা বিভাগের দ্বৈত শাসন চলছে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাগত উন্নতি ঘটলেও গুণগত উৎকর্ষ সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছয়নি। এখনও পর্যন্ত সরকার হার্টগ কমিটির অনুসৃত Policy of consolidation এবং দুর্বল বিদ্যালয়কে অপলোপন করে চলছেন। তাছাড়া, ১৯২৯-৬০ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার নীতি দুর্বল। সরকার কোনো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন না অথচ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে সেখানে শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেছেন—যা এখনো সার্থক বলে প্রমাণিত হয়নি। ভারতীয় সংবিধানে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের যে নীতি গৃহীত হয়েছে, তা কার্যকরী করে তোলার জন্য আজিও দুর্বল নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা-সমস্যাকে আরো অধিকতর "মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির" দিক দিয়ে ভাবতে হবে এবং এজন্য অর্থের অভাবকে কিছুতেই আর কোনো বাধা হিসেবে ভাবলে চলবে না। সারা দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করে তোলার জন্য রীতিমতো আন্দোলন শুরু ক'রে এক নূতন শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিকে জাগ্রত করে তুলতে হবে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, সরকার আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নত করবার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিছক সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করলে চলবে না। বুনিয়াদী শিক্ষার ধাঁচ কি ধরনের হবে এ নিয়ে অনাবশ্যক তর্ক বিতর্ক না করে শিক্ষাকে জীবন্ত, ফলপ্রদ, আনন্দজনক ও সৃষ্টিশীল করে তোলার বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। মহাত্মা গান্ধী বুনিয়াদী শিক্ষাকে ঠিক সেই অর্থে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ডঃ কে. ডি. ঘোষ "Gandhiji : A Catholic Revolutionary in Education" নামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—"...where primary education was cheerless, soul-killing and bookish, wholly confined to symbols, he made it joyous and creative, free from the shattering shackels of dead, useless, unwanted information. Where it was completely divorced from life, he based it on real work connected with the child's social and physical environment." ডঃ জাকির হোসেন ১৯৪৯ সালে সারা ভারত বুনিয়াদী সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে বলেছিলেন

যে, গান্ধীজী নিঃসন্দেহে এক বিশেষ ধরনের সমাজ চিন্তা করেছিলেন কিন্তু তিনি সেজন্য কোনো প্যাটার্ন নির্দিষ্ট করে দেননি। বৈচিত্র্যকে তিনি স্বীকার করেছিলেন অথচ বুনিয়াদী শিক্ষার গোঁড়াপন্থীরা মহাত্মাজীর চরকাকে অন্ধভাবে গ্রহণ করে নিতে চেয়েছেন। সকল কিছুকে অন্ধভাবে অনুবন্ধ নীতির সম্পর্ক দেখাতে হবে এমন কিছু মানে নেই বলে অনেক শিক্ষাবিদ্ মনে করেন। ১৯৪৭ সালে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই নীতির কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে বলেন যে, কোনো শিল্প নির্ধারণের বেলায় এই কথামাত্র ভাবতে হবে যে, তা শিল্পের দিক দিয়ে কতখানি ফলপ্রদ। সুতরাং নিছক চরকাকে সকল কিছুর মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এমন কথা বলা হয়নি। আসলে মহাত্মা গান্ধীর বুনিয়াদী পরিকল্পনা ও সার্জেণ্টের পরিকল্পনা জোর দিয়েছে শিল্পগত চর্চার উপর, সৃষ্টিশীল কর্মের উপর। দেখতে হবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কতখানি জিনিস তৈয়ারি করে তাদের নিজেদের স্বাবলম্বী করবার জন্য—অর্থ উপার্জন বড়ো কথা নয়, বড়ো হোলো তারা কতখানি সৃষ্টি-সম্ভার গড়ে তুলছে। বুনিয়াদী শিক্ষাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করে সারা ভারতব্যাপী এক বিস্তৃত ও ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

গান্ধীজী সাত-আট বৎসরের বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকার সে সময় সর্বদা অর্থের প্রশ্ন তুলে তা কার্যকরী করতে চাননি। ১৯৪৯ সালে সারা ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে সরকারের এই জাতীয় নীতির বিরুদ্ধে ডঃ জাকির হোসেন এবং আচার্য বিনোবা ভাবে কঠোর মন্তব্য করেছিলেন। আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছিলেন—'Education is a perfect thing and could not be cut into pieces like that." ডঃ জাকির হোসেন দেখিয়েছিলেন যে, সৃষ্টিশীল কর্মের মধ্য দিয়ে আট বৎসরের বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করে আত্মনির্ভরশীল শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। 'সকল কিছুকেই তকলীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই'— এই কথা স্বীকার করে ১৯৩৭ সালের ওয়ার্ধা কনফারেন্সে মশরুওয়ালা বলেছিলেন— 'What connot be taught through a craft should not be left out. We shall teach as much of these subjects through the takli or any other basic craft as possible. The rest we cannot leave untouched." জ্ঞানের যে সমস্ত বিষয় শিল্পের মাধ্যমে

অনুবন্ধ স্থাপন করে শিক্ষা দেওয়া যায় না, সেগুলি বাদ দিলে চলবে না। আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৪৯ সালের সারা ভারত বুনিয়াদী শিক্ষা সম্মেলনে মন্তব্য করেছিলেন যে. "Referring to statements like 'knowledge should be correlated with craft and life as far as possible', I would say the attitude of 'as far as possible' was wrong', Workers must have the courage to say, knowledge which was not related to craft or life need not necessarily be imparted to children. Lust for knowledge like lust for wealth is sinful. It was not necessary for children to have all the knowledge existing in the world. But they must be given the capacity or power to acquire whatever knowledge they want." আচার্য ভাবে আসলে বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে জীবনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করা উচিত তার চেয়ে জ্ঞান আহরণের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার কথা বলেছেন। রুশোর সঙ্গে তাঁর শিক্ষানীতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রুশো বলেছিলেন—"My object is not to furnish the mind with knowledge but to teach it the method of acquiring it."

প্রাথমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়কে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করবার পরিকল্পনা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্যাপক নীতি হিসেবে অনুসৃত হয়েছে। ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বুনিয়াদী বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

Questions

1. Discuss the growth and development of Primary Education in India.
2. Discuss the movement initiated by Gokhale for introducing Primary Education in the real sense of the term.
3. State the salient features of Basic Education sponsored by Gandhiji and developed by Sargeant.

Reference :

1. Sargeant Committee's Report.
2. Gandhi—Basic Education.
3. Zakir Hussain—Educational Reconstruction in India.
4. Nurulla & Nayak—History of Education in India.
5. S. N. Mukerjee—Do.

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা
(Problems of Basic Education)

আমরা পূর্ব অধ্যায়ে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার সহিত সার্জেন্ট প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু আলোচনা করবো।

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে যে দুটি নীতি প্রধানভাবে অনুসরণ করা হয় তা হোলো : (১) অনুবন্ধ প্রণালী (principle of correlation) এবং (২) সৃষ্টিশীল কর্মমূলক শিক্ষা। বুনিয়াদী শিক্ষার এমন এক পর্যায়ে সৃষ্টিমূলক কাজকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর মধ্যে জেগে ওঠে দায়িত্ববোধ ও আত্মনির্ভরশীলতা বা স্বয়ংসম্পূর্ণতা। দেখতে হবে যে, শিক্ষার্থীরা যেন উদ্দেশ্য অভিমুখীন কার্যে প্রেরণা পায়, আত্মপ্রকাশের স্বাধীন ও প্রাণবন্ত সুযোগ পায়, দেশ ও জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা গড়ে তোলার উদ্দীপনা পায় এবং বিশ্রামকালীন সংস্কৃতিধর্মী কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা পায়। একটি বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হোলো তার পরিবেশ; আর এই পরিবেশে শিশু হবে একজন সক্রিয় অংশীদার। সে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সৃষ্টিশীল কার্যে যেন যোগ্যতার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করতে পারে। এজন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে চাই একটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ। উদাহরণ স্বরূপ—

(১) প্রত্যেক শিশু যেন অনুভব করে যে বিদ্যালয়টি তার নিজস্ব জিনিস।

(২) প্রত্যেক বিদ্যালয়ে একটি সমাজ সংসদ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থী সেই সংসদের একজন যোগ্য শরিক হবে।

(৩) সাম্প্রদায়িক উপাসনার পরিবর্তে জাতীয় ও লোক প্রচলিত বিবিধ অনুষ্ঠান, গীতি, আলেখ্য, উৎসব নৃত্যাদির অনুষ্ঠানসূচী অনুসরণ করতে হবে।

(৪) গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও তথ্য বোর্ডে সাজিয়ে রাখতে হবে।

(৫) প্রদর্শনী, মিউজিয়াম প্রভৃতি ।শিক্ষামূলক কর্মানুষ্ঠান গ'ড়ে তুলতে হবে।

(৬) আনন্দজনক অনুষ্ঠান, যেমন—বনভোজন, ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) সমবায় সংগীত ও কর্মযজ্ঞ, ফসল তৈরী প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(৮) সমাজের ছোটখাটো টুকিটাকী জিনিসের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় যাতে নিবিড় হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) পায়খানা, প্রস্রাবখানা ইত্যাদি তৈরী, পল্লীস্বাস্থ্য রক্ষার যাবতীয় কাজ ইত্যাদি অসংখ্য ধরনের রুচিশীল ও সৃষ্টিশীল কর্মসূচী আমরা বুনিয়াদী শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে কেহ কেহ বিরূপ ধারণা করে বলেন যে, এ শিক্ষা হোলো প্রাচীন ধরনের, এর মধ্যে নূতনত্ব কিছু নেই। বুনিয়াদী শিক্ষার মূলতত্ত্ব হোলো শ্রমের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করা। যে শিক্ষা শুধুমাত্র পুস্তক-কেন্দ্রিক, তাকে সম্পূর্ণ শিক্ষা বলা যায় না। হাতের কাজের উপর যে-শিক্ষা জোর দেয়, সেই শিক্ষার কাজ হোলো আসল শিক্ষা। এ দিক দিয়ে অনেকে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। শিক্ষাকে যেমন বুনিয়াদী হতে হবে, তেমনি হতে হবে সৃষ্টিধর্মী ও শ্রমধর্মী।

আচার্য বিনোবা ভাবে বলেছেন যে, বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক অস্পষ্ট ধারণা অনেকের আছে। কিছু চরকার সুতো বা শিল্প উৎপাদনই বুনিয়াদী শিক্ষার শেষ কথা নয়। কিংবা শুধুমাত্র পড়াশুনা আর কাজ করা, বা এ-দুটো একসঙ্গে মিশিয়ে দিলেই বুনিয়াদী শিক্ষা হয় না। কেউ কেউ শুধু 'কাজের' উপর জোর দিতে বলেছেন। কিন্তু এর কোনটাই ঠিক নয়। এই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য শ্রমের যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার, পুস্তকের গুরুত্ব না থাকলেও সৃষ্টিশীল জ্ঞান আহরণের ব্যবস্থা করা। আসলে এই শিক্ষা জ্ঞানের সঙ্গে কার্যের সংযোগসাধনের কথাই বলে। একে অনুবন্ধ বা correlation বলা হয়েছে। আসলে একেই আচার্য বিনোবা বলেছেন 'সমবায়'।

আবাদী কংগ্রেসে বুনিয়াদী শিক্ষাই ভবিষ্যতে সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থারূপে গ্রহণ করা হবে ব'লে পণ্ডিত নেহরু যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন সেই অনুযায়ী দেশে অজস্র 'বেসিক' স্কুল গড়ে তোলা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্ত

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সত্যিকার বুনিয়াদী কর্মসূচী অনুসরণ করা হচ্ছে কিং না তা বিচার করে দেখতে হবে বলে আচার্য বিনোবা ভাবে উপদেশ দিয়েছেন।

বুনিয়াদী শিক্ষায় পুস্তকের কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে অনেকে মনে করেন যে, সহজে শিশু যে জ্ঞান আয়ত্ত করবে তাই যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্য নয়। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে পুরাপুরি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। ইতিহাসের রাজারাজড়ার কাহিনী ও সালতামাম শিক্ষার্থীরা সহজে গ্রহণ না করতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের মূল তত্ত্ব সম্পর্কে তাদের অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাছাড়া, তত্ত্বজ্ঞান, নীতিবিচার, ধর্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান আহরণ করতে হবে। তাছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাস্থ্যবিধি, রন্ধনশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। নিজের বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার জন্য বাচনভঙ্গী ও হস্তাক্ষর সুন্দর হওয়া চাই। শিক্ষার্থী যতটুকু জ্ঞান অর্জন করবে তার মধ্যে যেন কোনো ফাঁকি না থাকে—যোলো আনা জ্ঞান নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হবে। যার ফলে প্রকৃত বিদ্যা অর্জন করে শিক্ষার্থী সত্যিকার মানুষ হয়ে ওঠে, সে দিকটির প্রতি বিশেষ জোর দিতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে।

বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, আমরা এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই যেখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থী যে শুধু-মাত্র নিছক লেখাপড়া, অঙ্ককষা শিখবে তা নয়, উচ্চ আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ চরিত্রবান মানুষ হওয়ার শিক্ষা অর্জন করবে। শারীরিক শ্রমকে অস্বীকার করে সত্যিকার চরিত্রবান মানুষ গড়ে ওঠে না। তাই, শরীরচর্চা ও পরিশ্রমের চেয়ে অত্যধিক মর্যাদা দিতে হবে বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে। একমাত্র সুস্থ, সবল ও চরিত্রবান মানুষকে দিয়েই প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কিছু-না-কিছু কাজ করবে, উৎপাদন করবে। শিক্ষা সেজন্য যেমন বুদ্ধিগত হবে, তেমনি হবে সৃষ্টিগত। বুনিয়াদী শিক্ষা হবে সর্ববিষয়ক শিক্ষার ক্ষেত্র। আর এজন্য প্রথম গুরুত্ব দিতে হবে শারীরিক শ্রম করবার নীতিকে। এর মধ্য দিয়েই মানুষের বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে।

মহাত্মা গান্ধী যে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন, তার পশ্চাতে তাঁর একটি সমাজদর্শন অন্তর্নিহিত ছিল। বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে সেই সমাজ-দর্শনটি কি ভাবে নিহিত আছে তা জানতে হবে। মহাত্মা গান্ধী সারা পৃথিবীর মানুষকে 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' এই বাণী শুনিয়েছেন। এ বাণী ভারতের শাশ্বত বাণী। যুগে যুগে ভারতীয় ঋষিরা এই বাণী শুনিয়েছেন। মহাবীর, বুদ্ধ, যীশু—সকলেই এই বাণী শুনিয়েছেন। তবে, মহাত্মাজী এমন নূতন কথা কি শোনালেন? গান্ধীজী দেখেছিলেন যে, এই বাণীর একটা যুগদাবি আছে অনিবার্যভাবে। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে পৃথিবীতে সাম্রাজ্য-বাদী শক্তিগুলি যুদ্ধের রণদামামা বাজিয়ে বিজ্ঞানকে তার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ প্রবৃত্তিরও এমন বিকাশ ঘটছে যে, মানুষ তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিজ্ঞানকে মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। বুদ্ধিগতভাবে মানুষ হিংসার পথকে ধরে নিয়ে বিশ্বকে বিভীষিকাময় করে তুলেছে। তাই, আমাদের প্রবৃত্তিকে বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল করে এই বিভীষিকার পরিণতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে হবে সজ্ঞানভাবে। আজ এমন এক জীবনদর্শন শিক্ষার মধ্য দিয়ে অনুশীলন করতে হবে—যাতে আমরা বুদ্ধিগতভাবে প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির কুটিল আবর্ত কাটিয়ে উঠে সত্যিকার মানব সভ্যতার অগ্রগতির পথে পা বাড়াতে পারি। সমাজের অন্তঃস্থলে যেখানে বিভেদ, বিচ্ছেদ ও হিংসার হলাহল উত্থিত হচ্ছে সেই মূল ক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে সমস্যার সমাধানে যত্নশীল হতে হবে। তাই, তিনি শোষণহীন, শ্রেণীহীন সামঞ্জস্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল এক সমাজব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই জাতীয় সমাজ-ব্যবস্থা লাভ করতে হলে চাই পরিপূর্ণ মানুষ—যে মানুষ সমাজের মৌলিক একক বা unit, যে-মানুষ সকল কিছুতে হয়ে উঠবে স্বাবলম্বী, যার আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি যথার্থভাবে বিকশিত। গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে সেই মানুষ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন দুটি জিনিসকে—উৎপাদনের প্রক্রিয়া (productive process) এবং সামাজিক পরিবেশ (social environment)। এ দুটির মাধ্যমে প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজ-সচেতন হয়ে উঠবে এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদা দেখিয়ে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে। শৈশব কাল থেকে যাতে করে মানুষ এই বিষয়ে যথার্থ শিক্ষা লাভ করতে পারে এজন্য গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন।

বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়ার কথা হোলো পরিবেশের প্রতি উপযোজন ক্ষমতা লাভ করতে শেখা। মানুষ যার ফলে পরিবেশের প্রতি নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারে সেজন্য উপযুক্ত জ্ঞান সংগ্রহ ও সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা অর্জন প্রয়োজন। শিক্ষার মধ্য দিয়ে এ ক্ষমতা অর্জন করতে হবে। বুনিয়াদী শিক্ষায় তাই, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনের কথা বলা হয়। মামুলি বা গতানুগতিক শিক্ষায় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনকে জোর দেওয়া হয় না। বুনিয়াদী শিক্ষায় জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জ্ঞানার্জনের উপর জোর দেওয়া হয়। এজন্য এ শিক্ষা-ব্যবস্থা অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক ও কর্মকেন্দ্রিক। গান্ধীজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায় একটি বিশেষ সমাজ-দর্শন ও জীবনদর্শন লুক্কায়িত রয়েছে। এই দর্শন অনুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করতে হবে—কেননা মানুষে মানুষে কোনো বৈষম্য নেই। শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সাধারণত শ্রমবিমুখ। তাই, অন্নশ্রমের নীতি গ্রহণ করে মহাত্মা গান্ধী শিক্ষার মাধ্যমকে এক নূতন দিগ্‌দর্শনে রূপান্তরিত করেছেন। বুনিয়াদী বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে এমন এক স্থান অধিকার করে বসবে—যাতে করে শিক্ষার্থী সমাজের উপযোগী হ'য়ে গড়ে ওঠে। বুনিয়াদী শিক্ষার পশ্চাতে আছে এক বিরাট ও ব্যাপক সামাজিক দিগ্‌দর্শন যার ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থী সমান অধিকারের নীতিতে শ্রম করবে, দৈহিক শ্রমকে মর্যাদা দিয়ে। বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্য দিয়ে যে সমস্ত নাগরিক গড়ে উঠবে তারা শোষণকারী হবে না বা শোষণের কোনো প্রবৃত্তি তাদের থাকবে না। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে কল্যাণকর আদর্শ এবং প্রীতি ও প্রেমের আদর্শ। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নয়, সহযোগিতার মাধ্যমে কর্ম করা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সমাজকে সমৃদ্ধ করে তোলাই হবে সত্যিকারের আদর্শ বা নীতি। এই অবস্থার মধ্য দিয়ে গান্ধীজী-পরিকল্পিত শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। গান্ধীজী আরো দেখেছিলেন যে, ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিটি মানুষের উপযোগী করে তুলতে হলে তাকে স্বল্প ব্যয়সাধ্য করে তোলা দরকার। ভারতে প্রতি বর্গমাইলে লোকসংখ্যা ২৮০ এবং ৬—১১ বৎসরের শিশুদের শতকরা ২৮জন শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হয় এখানে। অতএব এখানে শিক্ষাকে স্বল্পব্যয়সাধ্য করতে হলে চাই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল শিক্ষা, আর সেদিক থেকে শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

বুনিয়াদী শিক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এই শিক্ষা যেহেতু শ্রমের দ্বারা অর্জিত, এই শিক্ষার দ্বারা মানুষের মনে জাগে গভীর আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ। এ শিক্ষা উৎপাদনাত্মক শ্রম ও কঠোর কৃচ্ছ সাধনের মধ্য দিয়ে অর্জিত বলে তা অন্তরের জিনিস হিসেবে গণ্য হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষায় উৎপাদনাত্মক নীতি গৃহীত হয়েছে সামাজিক সম্বন্ধকে স্বীকার করে নিয়ে। তাই, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে জাগে একটি সহযোগিতামূলক মনোভাব, প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রেষারেষি ভাব নয়। সৃষ্টিশীল শক্তি সমাজগত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বলে ভোগের প্রবৃত্তি বা সঞ্চয় প্রবৃত্তির পরিবর্তে সমাজসেবা ও আত্মত্যাগের মনোভাব শিক্ষার্থীর মনে জেগে ওঠে।

বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানানুশীলনের শিক্ষার কোনো বিরোধ নেই। শ্রমকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে সহজভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন মানে এই বোঝায় না যে, জ্ঞানার্জন স্পৃহা মন্দীভূত হবে। বরং কর্মের মাধ্যমে, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আরো অধিক জ্ঞান অর্জনই এই শিক্ষা-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। তবে অর্জিত জ্ঞান যাতে অভিজ্ঞতার দ্বারা আহৃত হয় সেদিকে বুনিয়াদী শিক্ষায় নজর দেওয়া হয় বেশী করে।

শিক্ষার্থীরা যে শিক্ষা আহরণ করবে তা কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সর্বাঙ্গীন শিক্ষা আহরণ করবে। এ শিক্ষা দেহ, মন ও বুদ্ধির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করে তুলবে। শিক্ষার্থী কাজ করবে ঠিকই, কিন্তু অধিকাংশ কাজই হবে ক্রীড়াসুলভ মনোভাব নিয়ে—যাতে কাজের মধ্যে একঘেয়েমি কোনকিছু না দেখা দেয়। শিল্পকাজকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বুনিয়াদী শিক্ষায় গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিল্পকাজ শিশুর নিকট যেন আনন্দদায়ক ও ক্রীড়াসুলভ হয়। শিল্পকাজ করার সময় সেজন্য কয়েকটি নীতি মনে রাখতে হবে, যেমন, (১) শিল্পটি যেন শিক্ষার্থীর সহজ আয়ত্ত হয়। (২) শিশুর যোগ্যতা যতই বাড়বে ততই শিল্পকাজটির প্রক্রিয়া যেন আরো উন্নত পর্যায়ের হয়। (৩) শিশুর উৎপন্ন জিনিস যেন ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। (৪) শিশু যে জিনিস উৎপাদন করবে তা যেন সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারিক কার্যকারিতা থাকে। (৫) শিশু শিল্পকে কেন্দ্র করে যে কাজ করবে তা যেন অনুকূল পরিবেশে করতে পারে। (৬) শিল্পকাজ

সম্পাদন করতে গিয়ে শিশু যেন বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সম্বন্ধ রক্ষায় সজাগ হয়ে ওঠে। (৭) শিশু যেন শিল্পগত চর্চার মধ্য দিয়ে রুচিশীলতা ও কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে। (৮) শিল্পকাজটি করবার বেলায় সে যেন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে—বৈচিত্র্য অনুসরণ করে সে চলতে পারে; নতুবা একঘেয়ে কাজে সে আনন্দ খুঁজে পাবে না। (৯) যে শিল্পকাজটি শিশু করবে, তা যেন সহজলভ্য হয় এবং তার ব্যয়সাধ্যের মধ্যে পড়ে। একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, শিল্প শিক্ষার মধ্য দিয়ে সে যেন উৎপাদনাত্মক প্রেরণা পায়, উৎপাদনাত্মক নীতির সঙ্গে শিক্ষা অর্জনের নীতির যেন একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য গড়ে ওঠে ; নতুবা শিল্পের সাহায্যে শিক্ষার যথাযথ অনুবন্ধ (correlation) স্থাপন কার্যকরী হবে না।

বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার সবচেয়ে বড়ো একটি দিক হলো সমাজ-সংস্কার করবার প্রচেষ্টা। এজন্য বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য দ্বিমুখী তলোয়ার (double-edged sword) স্বরূপ। একদিকে এই শিক্ষা সমাজের কল্যাণকর আদর্শকে জাগিয়ে তুলবে, আর অন্যদিকে এই শিক্ষা সমাজের যা কিছু আবর্জনা তাকে দূরীভূত করবার পথ দেখিয়ে দেবে। শিক্ষার মহান আদর্শ ও সামাজিক কল্যাণের আদর্শ পরস্পর সংযুক্ত।

মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষায় কাতাইয়ের মারফত নানাপ্রকার শিক্ষা গ্রহণের যে ব্যবস্থা আছে তা শিক্ষাবিদ্গণ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে রাজী নন। তবে বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে দেশের শিক্ষাবিদ্গণ অনেকেই অভিনন্দিত করে থাকেন। কোনো একটি বিশেষ শিল্পকে শিক্ষার একমাত্র বাহন হিসেবে গ্রহণ না করে ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে কর্মমূলক শিক্ষার ভিত্তিকেই বুনিয়াদী শিক্ষার সত্যিকার নীতি হিসেবে অনেকে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। যে সমস্ত কাজকর্ম শিশুদের মনে বুদ্ধি ও কর্মশক্তি জাগিয়ে তোলে সেইগুলিকেই গ্রহণ করা ভালো। দেখতে হবে কোন্ ধরনের কাজে শিশুদের আত্মনির্ভরতা ও দায়িত্বজ্ঞান সম্যকরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। দেখতে হবে কাজকর্ম যেন উদ্দেশ্যমূলক হয়। শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশের স্বাধীনতা যে-সব কাজকর্মে বেড়ে ওঠে, তাকেই গ্রহণ করা বিধেয়। দেখতে হবে কি ধরনের কাজকর্ম সমাজ ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে অধিকতর সংযোগ সাধনের সহায়ক হয়ে ওঠে। যেসব কাজের সাংস্কৃতিক মূল্য আছে এবং যা অবসর বিনোদনের সহায়ক, সেগুলিকে মূল্য দিতে হবে।

১৯৩৭ সালে মহাত্মাজী বুনিয়াদী শিক্ষার যে খসড়া তৈয়ারী করেন, তারই ভিত্তিতে ১৯৩৮ সালে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনা সাধারণভাবে ওয়ার্ধা পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাব করা হয় যে, মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হবে এবং সাত বৎসর ব্যাপী অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তিত হবে। কাতাই শিল্পকে শিক্ষার প্রধান বাহন হিসেবে উৎপাদনাত্মক নীতি বলে গ্রহণ করা হয়। নূতন সমাজ রচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকল্পনা গান্ধীজী রচনা করেছিলেন। এই শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভরশীল নীতিকে প্রধান স্থান দেওয়া হয়। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই হোলো বুনিয়াদী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য। পরবর্তিকালে এই পরিকল্পনার কিছু সংশোধন করে যে 'নঈ তালিম' পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাতে উপরিউক্ত নীতি মূলত বজায় রাখা হয় এবং শিক্ষার স্তরকে আরো ব্যাপকভাবে বিন্যস্ত করা হয়, যেমন—(১) পূর্ব বুনিয়াদী শিক্ষা, (২) বুনিয়াদী শিক্ষা, (৩ উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা এবং (৪) বয়স্ক শিক্ষা। পূর্ব বুনিয়াদী পর্যায়ের শিক্ষায় খেলাধূলা হবে শিক্ষার মাধ্যম, কিন্তু উত্তর বুনিয়াদী শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক। বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনার মোটামুটি এই বিভাগ সংশোধন ক'রে সার্জেণ্ট কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিম্ন বুনিয়াদী ও উচ্চ বুনিয়াদী এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করেন। একটি নির্দিষ্ট শিল্পকে কেন্দ্র করে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদানের নীতি স্বীকার না ক'রে সার্জেণ্ট কমিটি সৃষ্টিশীল কর্মের নীতিকে (activity centred) বুনিয়াদী শিক্ষার নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। গান্ধীজী-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার সঙ্গে সার্জেন্ট-পরিকল্পিত বুনিয়াদী শিক্ষার পার্থক্য এখানে।

Questions

1. Discuss the principles of Basic Education.
2. Compare Sargeant Scheme with Gandhiji's concept of Basic Education.

References :

1. Mahatma Gandhi—Basic Education.
2. Sargeant Committee's Report.
3. ক্ষেত্রপালদাস ঘোষ—আমাদের শিক্ষা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক শিক্ষায় ইংরেজির স্থান

The Place of English in Primary Education

শিক্ষা-ব্যবস্থায় সামগ্রিকভাবে ইংরেজি ভাষার স্থান কি হবে এই নিয়ে বর্তমানে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে। ইংরেজের শাসন এদেশে প্রবর্তিত ছিল বলে অনিবার্য ঐতিহাসিক প্রয়োজনে শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে ইংরেজি ভাষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। ইংরেজি ভাষার পঠনপাঠন প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু হোতো। এই ভাষার প্রভাব এত সুদূরপ্রসারী ছিল যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরও ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হোতো। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে কতখানি স্থান জুড়ে থাকবে সে সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্‌গণ চিন্তা করছেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইংরেজি ভাষার কল্যাণে ভারতের জনগণের মধ্যে এক বিরাট সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে। ইংরেজি ভাষা বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুবই মূল্যবান। এইসব দিক বিচার করে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের বিষয়টি কোনোমতে গৌণ করা উচিত হবে না এবং তাকে প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অনেকে একথাও বলেন যে, কেবলমাত্র ভাবপ্রবণতার দ্বারা চালিত হয়ে ইংরেজি ভাষাকে গৌণ করে দেখলে চলবে না। আবার অনেক শিক্ষাবিদের মত হোলো যে, দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি ভাষার অতখানি গুরুত্ব প্রয়োজন নেই এবং তা যদি নিতান্তই শিক্ষা করতে হয় তবে তা বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁরা এ যুক্তিও দেখান যে, অতীতে ইংরেজি ভাষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে অন্যান্য অধীত বিষয়গুলিকে অবহেলা করা হোতো। একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই মানুষ তার ভাব ও চিন্তা স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারে। অতএব মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ইংরেজি শিক্ষাদানের কোনো অর্থই হয় না। জুনিয়ার বেসিক,

সিনিয়ার বেসিক, নিম্নমাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজি পঠনপাঠন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করা উচিত বলে কেহ কেহ মন্তব্য করেন। ৭।৮ বৎসরের শিশুদের ইংরেজি শিক্ষাদানের কোনো অর্থই হয় না বলে তাঁদের ধারণা।

বিদেশী ভাষা সম্পর্কে অন্যান্য দেশে যে নীতি গ্রহণ করা হয় তা আলোচনা করলে আমরা দেখি যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের নীতি অনেক ক্ষেত্রেই গৃহীত হয়েছে। ফ্রান্সে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গোড়াতেই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়—তবে তা বাধ্যতামূলক নয়। শিক্ষার্থী ইচ্ছা করলে জার্মান, ইতালীয়, স্পেনীয় প্রভৃতি যে-কোনো বিদেশী ভাষা শিক্ষা করতে পারে। তবে বেশির ভাগ বিদ্যালয়ে জার্মান অথবা ইংরেজি এই দুটি ভাষার মধ্যে যে-কোনো একটি শিক্ষা করতে হয়। জাপানে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষাদান আবশ্যিক। জার্মানীর পশ্চিম অঞ্চলে ইংরেজি ভাষা সাধারণভাবে এবং গ্রাণ্ডস্কুলেন (বুনিয়াদী বিদ্যালয়) বিদ্যালয়ে ইংরেজি শিক্ষাদান ঐচ্ছিক বলে গ্রহণ করা হয়। মিশরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ও ফরাসী ভাষা আবশ্যিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। ইরাণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঐচ্ছিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। সুইডেনে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির স্থান সর্বাগ্রে। মোটামুটি বিভিন্ন দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হয়েছে। সেদিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভারতবর্ষের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিদেশী ভাষা হিসেবে ইংরেজির স্থান বলবৎ রাখা প্রয়োজন। কিন্তু, প্রাথমিক বিদ্যালয় বা নিম্নবুনিয়াদী পর্যায়ে ইংরেজির স্থান কি হবে এ নিয়ে শিক্ষাবিদদের চিন্তার অন্ত নেই।

মহাত্মা গান্ধী যে বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, তাতে তিনি উচ্চ বুনিয়াদী স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাকেই শিক্ষার বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের নীতি একেবারেই গ্রহণ করেন নি। কিন্তু এ নীতি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় গৃহীত হয়নি। মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ভাষাকে অন্যতম আবশ্যিক ভাষা হিসেবে রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান রহিত করে পঞ্চম শ্রেণী থেকে ইংরেজির আক্ষরিক জ্ঞানদানের নীতি কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে পুনরায় তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের নীতি

গ্রহণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের চেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে ইংরেজি ভাষার গঠনপ্রণালী (structure) শিক্ষা দেওয়ার উপরে। মাইকেল ওয়েস্টের (West) ভাষায় এখন মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের "to tear the heart out of a book" এর ক্ষমতা অর্থাৎ ইংরেজি পড়বার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হয়। সেজন্য বিষয়বস্তু অপেক্ষা গঠনপ্রণালী আয়ত্তের দিকে জোর দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র 'অক্ষর' বা 'প্রতিশব্দ' শিক্ষা করলে ভাষার তাৎপর্য আয়ত্ত হয় না; তাই, ফ্রায়েস্ (Fries) যাকে বলেছেন 'the signalling system' অর্থাৎ অর্থবাহা শব্দজ্ঞান অর্জনের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিবেশ পরিচিতির মাধ্যমে ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক পরিচয় দেওয়া ও আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতা জাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা সমীচীন নয়। পূর্বে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি পঠন এবং প্রথম শ্রেণীতে আক্ষরিক জ্ঞান অর্জন করতে হোতো। সে সময় ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান অর্জনের উপর জোর বেশি দেওয়া হোতো। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য অনেক বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হয়। এ অবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ ভাষাজ্ঞান অর্জনের প্রাথমিক সোপান হিসেবে আক্ষরিক জ্ঞান ও সাধারণ পরিবেশ পরিচিতি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে কিছুটা শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। শিশুরা অল্প বয়সে অনেক ভাষা আয়ত্ত করতে পারে। সেজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণ ইংরেজি জ্ঞান আয়ত্ত করবার ব্যবস্থা থাকলে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবেশের মুলে আর বিশেষ কষ্ট পেতে হয় না। এ দিক দিয়ে প্রাথমিক পযায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদান আদৌ দূষণীয় নয়। তবে দেখতে হবে যে, ছবির মাধ্যমে ইংরেজি সম্বন্ধে প্রাথমিক ভাষাজ্ঞান ও অক্ষর পরিচয় কি ভাবে সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করা যায় তজ্জন্য বিশেষভাবে নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে ব্রুটনের (Bruton) মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"A mere statement of the basic structures of English even if they are arranged in order of frequency, would be of little value as teaching material. It is necessary to arrange the items in a teaching order, and to state within reasonable limits the stage at which the various items should be introduced." প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।

ইংরেজি ভাষা শিক্ষাদানের নীতি মাধ্যমিক পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে। এ সম্বন্ধে বাদানুবাদের প্রশ্ন না তোলাই ভালো। মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষাদানের যে নীতি Draft Syllabus for Higher Secondary Schools-এ গৃহীত হয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরাজি শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণের বেলায় সে কথা মনে রেখে পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

এই Draft Syllabus-এ বলা হয়েছে—

(১) পঠন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইংরেজিতে কথা বলার ভিত্তি তৈরি করতে হবে।

(২) শব্দ সম্ভার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

(৩) কেবলমাত্র শব্দসম্ভার মারফত নয়, গঠনের মাধ্যমে ভাষা আয়ত্ত করতে জানতে হবে।

(৪) গঠনপ্রণালী হবে পর্যায়ক্রমিক—সহজ থেকে জটিলের পথে যেতে হবে এবং তা হবে সৃজনধর্মী ও শিক্ষাপ্রদ।

(৫) একটি উপাদান প্রথমে আয়ত্ত করতে দিতে হবে এবং যখন তা সংগঠিতভাবে শিক্ষা করা হয়ে যাবে, তখন তার সাহায্যে পরবর্তী উপাদানের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

(৬) মাতৃভাষার সাহায্য মধ্যে মধ্যে নিতে হবে, যাতে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করা সহজ হয়ে উঠবে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষাদানের উপরিউক্ত নীতিকে যদি মানতে হয়, তবে প্রাথমিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ সমীচীন হবে —

(১) ইংরেজি শব্দ পরিচিতি হবে প্রতীক (symbol) মারফত।

(২) সাধারণ পরিচিত অবস্থা থেকে ইংরেজি শব্দের পরিচিতি আরম্ভ হবে।

(৩) ব্যাকরণগত দিকটি এই পর্যায়ে শিক্ষাদান সমীচীন হবে না।

(৪) আক্ষরিক পরিচিতি ও হস্তাক্ষরের উপর মুখ্যত জোর দিতে হবে।

(৫) মাতৃভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেই ইংরেজি শব্দের প্রাথমিক পরিচিতি জানতে দিতে হবে।

(৬) খুব সাধারণভাবে কিছু কিছু ইংরেজি ভাষায় কথাবার্তার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে—কিন্তু ব্যাকরণগত দিকটির প্রতি কোনো সজ্ঞান বা কষ্টকল্পিত প্রয়াস থাকবে না।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষা আবশ্যিকভাবে পঠন-পাঠনের প্রয়োজন নেই। উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার মনের ভাবসাম্য রক্ষার জন্য সাধারণভাবে ও ঐচ্ছিকভাবে শিক্ষকগণ ইংরেজি লিখনপঠন শিক্ষা দিতে পারেন। ইংরেজি ভাষা আন্তর্জাতিক ভাষা। অতএব এর মধ্যে সংযোগ রাখলে দেশের সংস্কৃতির পক্ষে শুভ হবে না। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিষয়ে কোনো 'load' বা বোঝা চাপিয়ে দেওয়া সমীচীন হবে না। বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। কবিগুরু বলেছেন—'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ'। সুখের কথা, পশ্চিমবঙ্গে সরকারীভাবে সেই ভাষা স্বীকৃতি লাভ করেছে। এদিক বিবেচনা করে প্রাথমিক স্তরে বাংলাভাষার উপরই অধিক চাপ আরোপ করা উচিত। সংস্কৃতিগত মূল্য ও উচ্চস্তরের শিক্ষার সঙ্গে ভারসাম্যের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি এ স্তরে গ্রহণ করা ঠিক নয়।

Questions

1. Discuss the place of English in Secondary and Primary schools in India.
2. How effectively the English language can be taught to the Indian children ?
3. Whether English should be retained in the Primary stage of Education or not ?

References :

1. Draft Syllabus for Higher Secondary Schools.
2. Sargeant Committee's Report.
3. J. M. Sen—History of Elementary Education in India.
4. K. D. Ghosh Committee's Report.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের নীতি

(The Principles of Curriculam Construction)

পাঠ্যসূচী অর্থে আমরা কি বুঝি ? সাধারণভাবে বলতে গেলে পাঠ্যসূচী মানে অনেকগুলি বিষয়সমষ্টি—যা পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত এবং যাকে বিদ্যায়তনের মধ্যে শিক্ষা দেওয়ার সুসঙ্গত ব্যবস্থা করা হয়। এর অর্থ আরো বোঝায় যে, আমরা কি কি বিশেষ ধরনের শিল্প উপাদান শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করবো। শুধু তাই নয়, সামাজিক জীবনের কি কি শিক্ষাপ্রদ অভিজ্ঞতা আমাদের কাজের উপযোগী—যা ব্যবহার না করলে চলবে না। আরো সংকীর্ণ অর্থে পাঠ্যসূচী বলতে বোঝায় কোনো এক বিশেষ পর্যায়ের শিক্ষাধারার জন্য ব্যবহৃত বিষয়াবলী।

পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করতে গেলে সর্বাগ্রে আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের শিক্ষার উপাদান প্রকৃতপক্ষে কি কি। আমরা জানি যে, শিক্ষার উপাদান হোলো—শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তু। শিক্ষার্থী অর্থে প্রধানত বুঝায় মানবিক উপাদান। আর, বিষয়বস্তু বলতে বোঝায় জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান-প্রকরণ। জাতির পুঞ্জীকৃত জ্ঞানের সমষ্টি হোলো শিক্ষার বিষয়বস্তু, আর তাতে প্রতিফলিত হয়ে উঠে মানুষের আত্মার সুসমঞ্জস প্রকাশ। পার্সিনান এ সম্পর্কে যথার্থই উক্তি করেছেন যে, পাঠ্যসূচী প্রকৃতপক্ষে জীবনের আদর্শকে প্রতিফলিত করবে কেননা, তাঁর মতে "Every scheme of education being, at bottom, a practical philosophy, necessarily touches life at every point."

এইবার আমরা পাঠ্যসূচী নির্বাচনের বিভিন্ন ভিত্তি পর্যালোচনা করে দেখবো। প্রথমত আমরা দার্শনিক দিক, তৎপরে মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং পরিশেষে সমাজতাত্ত্বিক দিক আলোচনা করে দেখবো।

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের দার্শনিক ভিত্তি হোলো এই যে, আমরা পাঠ্যসূচীর মধ্যে মানুষের জীবনাদর্শ প্রতিফলিত করে দেখবো। আমরা দেখবো যে,

অতীত ঐতিহ্যের মধ্যেই সভ্যতার সারবত্তা লুক্কায়িত রয়েছে। আর, পাঠ্যসূচীতে এমন সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে—যা ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নেবে। স্বভাববাদী দর্শনের মতে আমাদের বর্তমান অভিজ্ঞতা ও বর্তমান চাহিদাকে পাঠ্যসূচী নির্ধারণের সময় মনে রাখতে হবে। প্রয়োগবাদী দর্শন উপযোগিতামূলক বিষয় বা utilitarian subjects-কেই প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অ্যারিস্টটল এই সম্পর্কে উক্তি করেছিলেন, "Children should be taught useful things" অর্থাৎ শিশুদের শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিস শিক্ষা দেওয়া হবে। আদর্শবাদী দর্শনের মতে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে এমন সমস্ত অভিজ্ঞতার স্থান থাকবে - যা প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী ও সামাজিক জীবনকেও কেন্দ্র করবে। এই যদি আদর্শবাদীদের মত হয় তবে বুঝতে হবে যে, পাঠ্যসূচীতে আমরা বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যা উভয়কেই গ্রহণ করে নেবো। নয়া-আদর্শবাদী দর্শন (Neo-idealism) এই কথা বলে যে, আমাদের তিনটি সত্ত্বাকে প্রধানত স্বীকার করে নেওয়া উচিত—(১) স্বাভাবিক সত্ত্বা, (২) সামাজিক সত্ত্বা এবং ৩) আধ্যাত্মিক সত্ত্বা। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এই দিকটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে বলেছেন যে, স্বাভাবিক সত্ত্বাকে বিকশিত করে তোলার জন্য পাঠ্যসূচীতে আমাদের বিজ্ঞান, টেকনোলোজি প্রভৃতি বিষয়কে গ্রহণ করা উচিত। আমাদেব সামাজিক সত্ত্বাকে উদ্বোধিত করতে হলে ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় জানা দরকার। 'আর, আমাদের আধ্যাত্মিক সত্ত্বাকে জাগরিত করার জন্য আমাদের জানতে হবে নীতিবিজ্ঞান ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়কে। প্রয়োগবাদীদের মধ্যে পাঠ্যসূচী নির্ধারণের নীতি হওয়া উচিত 'উপযোগী' বা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি। জন ডিউঈ জোর দিয়েছেন শিশুব ওপর আর এজন্য তিনি শুধুমাত্র পুস্তকেব উপর গুরুত্ব দেননি। সক্রিয় কর্মবৃত্তিকে শিশুজীবনের মূল প্রেরণা বলে তিনি গ্রহণ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের তাই প্রয়োজন আছে শিশুর স্বাভাবিক কৌতুক ও অনুরক্তিকে ভালোভাবে জানার। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিশু মূল্যমান সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই মূল্যমানকে জাগ্রত করে তাকে পরিমার্জিত বা সংশোধিত করতে পারে। শিশুর মধ্যে যে সৃষ্টিশীল মনটি লুক্কায়িত রয়েছে তা যেমনি বস্তুকে সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি বস্তুকে অনুসন্ধানও করতে পারে, সৃষ্টির অনুপম সুন্দরকে প্রকাশ করতে পারে। তাই, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করতে গেলে প্রয়োজন আছে একটি

গতিশীল দর্শনের। প্রয়োজন আছে শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে কোনো জায়গায় যেন নিষ্ক্রিয়তা না থাকে, যান্ত্রিক কিছু না থাকে বা নিছক বুলি আওড়ানো যেন সে শিক্ষার প্রকৃত পরিচয় না হয়। আমরা দেখেছি যে স্বভাববাদ ও আদর্শবাদ—এই দুটি ভিন্ন মতের মধ্যে একমাত্র আদর্শবাদই আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা দিতে পারে। প্রাচীন ঐতিহ্যকে তাই একদিকে যেমন স্বীকার করে নিতে হবে, তেমনি প্রয়োজন হবে উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত এক গতিশীল জীবনদর্শন—যা আমাদের লক্ষ্যের প্রেরণাকে আরো উদ্বুদ্ধ বা অনুপ্রাণিত করে তুলবে।

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের এই দার্শনিক ভিত্তির কথা বাদ দিলে আর একটি জিনিস আমাদের চোখে পড়ে—তা হোলো মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি। মনস্তাত্ত্বিকরা অভিজ্ঞতার তিনটি পর্যায় ভাগ করেছেন—একটি হোলো জ্ঞান, আরেকটি ভাব। এছাড়া আর একটি আছে—তার নাম অনুভূতি। ইংরেজিতে এদের যথাক্রমে বলা হয়—Cognition, Conation এবং Emotion। শিক্ষা-সূচীতে আমাদের গ্রহণ করতে হবে বুদ্ধিগত জিনিস, ভাবগত জিনিস আর অনুভবের জিনিস। ফ্যাকাল্টি মনস্তত্ত্ব বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, এক জাতীয় জিনিসের জ্ঞান আহরণ করলে তাকে অন্য কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যায়। কিন্তু, এই মত গ্রাহ্য নয় এইজন্য যে, জ্ঞানের বিস্তৃত রাজ্যে আমরা বড়জোর একটি 'বুদ্ধিগত শৃঙ্খলা' বা intellectual discipline গড়ে তুলতে পারি মাত্র। অবশ্য কেহ কেহ জ্ঞানের রাজ্যে অনুবন্ধ বা Correlation নীতির যৌক্তিকতা দেখিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী চরকার মাধ্যমে এই অনুবন্ধ নীতির সার্থকতা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। আমরা জানি যে, শিশু বেড়ে ওঠে তার আবেগ, প্রবৃত্তি, অনুভূতি সকল কিছুকে কেন্দ্র করে—শুধুমাত্র জ্ঞানগত শৃঙ্খলা তার ধর্ম নয়। তাই, পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক নীতি হবে সমাজপ্রদ অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করা—সকল কিছু জ্ঞানের রাজ্যকে আমরা কোনো-না-কোনো ভাবে অনুবন্ধ নীতিতে সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি কেবলমাত্র তাদের সামাজিক মূল্যবোধকে স্বীকার করেই।

তাহ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মনস্তাত্ত্বিক নীতি আমাদের সমাজতাত্ত্বিক নীতিকে অস্বীকার করতে পারছে না। পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক নীতির কার্যকারিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। সমাজের

চাহিদা ও সমাজের পরিবর্তিত মানসিক অবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হবে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করবার সময়। এই প্রসঙ্গে আমরা হার্বার্ট স্পেনসার প্রবর্তিত কতকগুলি সামাজিক ফলপ্রদ ও অভিজ্ঞতামূলক কার্যের উল্লেখ করতে পারি।

তিনি সেগুলিকে বিভক্ত করেছেন নিম্নলিখিত ভাবে :—

(১) প্রত্যক্ষ আত্মসংরক্ষণ

(২) অপ্রত্যক্ষ আত্মসংরক্ষণ

(৩) অভিভাবকত্ব

(৪) নাগরিকত্ব

(৫) জীবনের বহুবিচিত্র রুচিবোধ।

আমাদের জীবনধারণের প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রয়োজনকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। যে-শিক্ষা জীবনের প্রয়োজনকে ও তার কার্যকারিতাকে স্বীকার করে না, সে-শিক্ষা শুধু তথ্যগতই হয়, বাস্তব ফলপ্রদ হয় না। জীবনের আরও উদ্দেশ্য থাকে—একাধারে আমরা শিক্ষার্থীদের যেমন ভবিষ্যৎ অভিভাবক হিসেবে গড়ে তুলি, তেমনি সমাজের নাগরিক হিসেবেও তাদের গড়ে তুলি। তাছাড়া, জীবনের বহুবৈচিত্র্য রুচিবোধ, কান্তভাব, মূল ধর্মগত প্রেরণা মানুষের জীবনের উপর এক বিশেষ 'উদ্দেশ্য' আরোপ করে। হার্বার্ট স্পেনসার প্রবর্তিত এই বিভাগগুলির সঙ্গে আমেরিকার National Education Association-এর বহুল প্রচারিত সাতটি নীতি বিশেষভাবে তুলনা করা যায়। এই কমিশনের মতে পাঠ্যসূচী নির্ধারণের মাপকাঠি হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কেন্দ্র করে :

(১) স্বাস্থ্য

(২) মূল বিষয়গুলি, যেমন—লেখাপড়া, অঙ্ককষা প্রভৃতি

(৩) গৃহগত যোগ্যতার্জন

(৪) বৃত্তিগত যোগ্যতার্জন

(৫) নাগরিকত্ব

(৬) বিশ্রামের সুযোগ

(৭) নীতিগত চরিত্র গঠন।

মুদালিয়র কমিশন পাঠ্যসূচী নির্ধারণের মূল নীতিহিসেবে যে-কথা বলেছেন তা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"It is more important to awaken him the methods and techniques of acquiring knowledge than to burden his memory with miscellaneous information." অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের প্রণালী ও কৌশল আয়ত্ত করবার কায়দা শেখানোই বড় কথা, তাদের মনকে তথ্যে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলা শিক্ষার কাজ নয়।

সেইজন্য আজকাল বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী নির্ধারণের সময় সামাজিক চাহিদা ও শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞানবোধ মেটানোর প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে সবদেশেই। তাই সবদেশেই পাঠ্যসূচী বহির্ভূত বিভিন্ন কর্মধারাকে পাঠ্যসূচীরই অন্যতম অংশরূপে বিবেচনা করা হচ্ছে।

পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যে ত্রুটি ধরা পড়েছে, সে সম্পর্কে 'মুদালিয়র কমিশন' যথার্থই বলেছেন, তা "…fails to prepare students for life. It does not give them a real understanding of, or insight into, the world outside school, into which they will presently have to enter." অর্থাৎ, পাঠ্যসূচী ছাত্রদের প্রকৃত জীবন গঠনে সাহায্য করে না—বাহিরের জগৎ সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা বা পরিজ্ঞান লাভে তা সাহায্য করে না কেননা পাঠ্যসূচী শুধুমাত্র পুঁথিগত বিষয়কে গুরুত্ব দেয়; ব্যক্তি-পার্থক্যের নীতি, ব্যক্তিত্ব সংগঠনের নীতি প্রভৃতিকে তা গুরুত্ব দেয় না। পাশ্চাত্ত্য দেশে এইজন্য পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের জন্য যে-সমস্ত মূলনীতি প্রধানত অনুসরণ করা হচ্ছে, তা হোলো এই—

(১) ব্যক্তিগত অনুরক্তি ও চাহিদার উপর ঝোঁক
(২) মানবক্ষা করা
(৩) যুগাদর্শের মাপকাঠিতে সমাজের চাহিদা পূরণ
(৪) সাংস্কৃতিক জীবনের স্থায়ী দিকটার ভারসাম্য রক্ষা
(৫) সমগ্র ভাবে পাঠ্যসূচী নির্ধারণের জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার
(৬) সহজলভ্য উপাদানকে সমতা রেখে সকলের সুবিধার জন্য নিয়োগ।

এ বিষয়ে Report of a Study by an International Team-এর মূল্যবান তথ্যগুলি আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করা যায়।

মুদালিয়র কমিশনও পুস্তককেন্দ্রিক পাঠ্যসূচীর পরিবর্তে নূতন নীতি নির্ধারণের সুপারিশ ক'রে বলেছেন—"In the past, our education has been so academic and theoretical and so divorced from practical work that the educated classes have, generally speaking, failed to make enormous contribution to the development of the country's natural resources and to add to national wealth. This must now change and with this object in view, we have recommended that there should be much greater emphasis on crafts and productive work in all schools, and in addition, diversification of courses should be introduced at the secondary stage so that a large number of students may take up agricultural, technical, commercial or other practical courses which will train their varied aptitudes and enable them either to take up vocational pursuits at the end of the secondary course or to join technical institutions for further training."

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী

প্রাথমিক শিক্ষাব যে পাঠ্যসূচী এতদিন গ্রহণ করা হোতো তা ছিল নিছক পুস্তককেন্দ্রিক, কর্মকেন্দ্রিক নয়। ওয়ার্ধা ও সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় প্রাথমিক পাঠ্যসূচী সৃষ্টিধর্মী ক'রে তোলার প্রস্তাব করা হয়। কোন একটি বিশেষ শিল্পকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণের যে নীতি ওয়ার্ধা প্রস্তাবে ছিল, সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় নীতিগতভাবে তার পরিবর্তে নানা কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিশীল কর্মসূচী গ্রহণের নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু, মুখ্যত এ দুটি কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য হোলো এই যে, প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী হবে সৃষ্টিধর্মী। আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সাধারণ জ্ঞান অর্জনের চেয়ে হাবভাব, সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি কতকগুলি নৈতিক সম্পদ আহরণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং সেখানে বিষয়বস্তুর তথ্য আহরণে খুব জোর দেওয়া হয় না। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োজন সেইসব পাঠক্রম গ্রহণের —যার মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা বর্তমান জীবনে এমন কতকগুলি সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর অধিকারী হয়, যা তাদের উত্তর জীবনকে আরো সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল,

পৌরনীতি প্রভৃতি বিষয়ে একটা সাধারণ জ্ঞান এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-ব্যবহার গ'ড়ে তোলাই হবে আসল কাজ।

মাধ্যমিক পর্যায়েও পাঠ্যসূচী ছিল নিতান্তই একঘেঁয়ে ও পুস্তককেন্দ্রিক। পাঠ্যসূচী এতই ভারাক্রান্ত ছিল যে, তার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান আহরণের কোনো সুযোগ ছিল না। মুখ্যত পরীক্ষায় পাশ করাই ছিল এই শিক্ষার লক্ষ্য। অথচ আজ সমাজ জীবনের চাহিদা পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এবং গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গ'ড়ে তোলার সঙ্গেসঙ্গে প্রয়োজন এমন এক পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের, যা অনুসরণ ক'রে শিক্ষার্থিগণ যেন বাস্তব শিক্ষার সুযোগ লাভ করে। আমরা দেখেছি যে, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সেজন্য শিক্ষার্থীদের কৌতুক জাগিয়ে তুলে নূতন নূতন জ্ঞান আহরণের মনোভাব গ'ড়ে তোলার জন্য পাঠ্যসূচীর এক মহান উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন—"It is more important to awaken interest and curiosity in the child's mind to teach him the methods and technique of acquiring knowledge than to burden his memory with miscelleneous information." মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী এতই বহুবিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন—যাতে ক'রে ব্যাপক নির্বাচনের সুযোগ থাকে, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও চাহিদা অনুসাবে পাঠ্যসূচী যেন সমাজজীবনের প্রয়োজন মিটিয়ে তোলার পক্ষে উপযুক্ত হয়। শুধু যে উৎপাদনাত্মক শিক্ষার উপর গুরুত্ব থাকবে তা নয়, যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রামমুখীন শিক্ষারও সুযোগ দিতে হবে এই পযায়ে। বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে সীমারেখা সংকুচিত না ক'রে তুলে সমাজজীবনের বহুমুখী প্রয়োজন অনুপাতে যাতে ব্যাপকভাবে সাধারণ জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়, সেদিকটি লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রণালী যে কর্মকেন্দ্রিক হবে তা স্বীকৃত হয়েছে, তা বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে হোক, আর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হোক। নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়েব পাঠ্যসূচী হবে কর্মকেন্দ্রিক, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষাধারার সঙ্গে তার নিখুঁত ঐক্য ও সঙ্গতি রক্ষা করা চাই। মাধ্যমিক শিক্ষার নিম্নপর্যায়ে কর্মকেন্দ্রিক ও সাধারণ জ্ঞান-কেন্দ্রিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ভাষা ও সাহিত্য, সমাজপাঠ, প্রকৃতি বিজ্ঞান, অঙ্ক। এ ছাড়াও শিল্প, সংগীত ও কলাবিদ্যায় শিক্ষাদানেরও সুযোগ রাখতে হবে। শিক্ষার এই পরিকল্পনায় শারীরিক চর্চা অপরিহার্য অঙ্গ

বলে যেন বিবেচিত হয়। ভাষা শিক্ষাদানের কর্মসূচীতে মাতৃভাষা, রাষ্ট্রভাষা এবং একটি বিদেশী ভাষা (ইংরেজি) অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে সংস্কৃত-উর্দু-পারসী প্রভৃতি ক্লাসিকাল ভাষাকেও শিক্ষার সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করে তোলার কথা বলা হচ্ছে। মনে রাখতে হবে যে, নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হোলো ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার উপরই, বিষয়বস্তুর দিকটি সেইভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে মাত্র।

উচ্চপর্যায়ের মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর বিশেষ অনুরক্তির দিকে ঝোঁক দেবার। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চপর্যায়ে বহুমুখী পাঠ্যসূচী অনুসরণ করতে হবে। তবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে কতকগুলি Core বা মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে হবে—

(১) ভাষাসমূহ
(২) সাধারণ বিজ্ঞান
(৩) সমাজপাঠ
(৪) শিল্প

বহুমুখী কর্মসূচী হবে প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণীর—

(১) মানবিক বিদ্যা (Humanities)
(২) বিজ্ঞান
(৩) কারিগরী
(৪) ব্যবসাবাণিজ্য
(৫) কৃষি
(৬) সুকুমার কলা
(৭) গার্হস্থ্যবিজ্ঞান

এই বহুমুখী পাঠ্যসূচী উচ্চ বা উচ্চতর বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়বর্ষে আরম্ভ হওয়া উচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন নিম্নলিখিত পাঠ্যসূচী পরিকল্পনা করেন—যা ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্য সরকার রূপায়ণের জন্য অগ্রসর হয়েছেন স্থানীয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে—

(ক) ভাষা: মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা বা সংস্কৃত ও মাতৃভাষার সংমিশ্রিত রূপ এবং হিন্দী, প্রাথমিক ইংরেজি, উন্নত ধরনের ইংরেজি,

হিন্দী ছাড়া একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা, ইংরেজি ছাড়া একটি বিদেশী ভাষা, ক্লাসিকাল ভাষা—এগুলির যে-কোনো একটি।

(খ) (১) সমাজ পাঠ : প্রথম দু'বৎসরের জন্য।

(২) সাধারণ বিজ্ঞান ও অঙ্ক : প্রথম দু'বৎসরের জন্য।

(গ) শিল্প : যে-কোনো একটি :

(১) তাঁতশিল্প ও বয়ন,

(২) কাঠের কাজ,

(৩) উদ্যান,

(৪) দর্জির কাজ,

(৫) টাইপ,

(৬) ওয়ার্কসপ অভ্যাস,

(৭) ছুঁচের কাজ প্রভৃতি,

(৮) মডেল তৈয়ারি,

(৯) মৃৎসংক্রান্ত কাজ।

(ঘ) যে-কোনো একটি শ্রেণী থেকে নির্বাচিত তিনটি বিষয় :

(১) মানবিক বিদ্যা : সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি, মনস্তত্ত্ব ও তর্কবিদ্যা, অঙ্ক, সংগীত, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান।

(২) বিজ্ঞান : রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, ভূগোল, অঙ্ক, শারীরবিদ্যা।

(৩) কারিগরী : ফলিত গণিত ও ড্রয়িং, ফলিত বিজ্ঞান, প্রাথমিক যান্ত্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

(৪) ব্যবসা-বাণিজ্য : বাণিজ্যগত অভ্যাস, বুক-কিপিং, বাণিজ্যিক ভূগোল বা অর্থনীতি ও পৌরনীতি, সর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ।

(৫) কৃষি : সাধারণ কৃষি, পশুপালন, রেশমের চাষ ও উদ্যান, কৃষি-বিষয়ক রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যা।

(৬) সুকুমার শিল্প : শিল্পের ইতিহাস, ড্রয়িং, ছবি আঁকা, মডেল নির্মাণ, সংগীত, নাচ।

(৭) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান : গার্হস্থ্য অর্থনীতি, রান্নাবান্না, মাতৃত্ববিষয়ক জ্ঞান ও শিশু পরিচর্যা, গার্হস্থ্য বিষয়ক পরিচালনা ও নার্সিং।

Questions

1. What are the general principles of curriculum construction ?
2. State the principles to be followed while formulating the curriculum of Secondary and Primary Schools in the changed context of the day.

References.

1. K. D. Ghosh Committee's Report.
2. The Secondary Education Commission.
3. The University Education Commission.
4. Report of a Study by an International Team.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মধারার উপযোগিতা
(Utility of Co-curricular Activities in School)

বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মবৃত্তিগুলির প্রয়োজনীয়তা মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনুভূত হয়েছিল শরীর ও মনের অখণ্ড সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য। নিতান্ত গতানুগতিক যে-শিক্ষায় কেবল পাঠ্যবিষয় ছাড়া ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্যান্য কোনো সজীব উপাদান ছিল না, সে শিক্ষা কোনো কাজের শিক্ষা নয়। ক্রমশ বিদ্যালয়ের পাঠ্যবহির্ভূত কর্মবৃত্তির উপযোগিতা এমনি বৃদ্ধি হোলো, যাতে আর সেইগুলিকে পাঠ্য-বহির্ভূত না রেখে পাঠ্য-অঙ্গীভূত কর্মবৃত্তি হিসেবেই তার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। যে কোনো গতিশীল পাঠ্য-তালিকায় তাই আজ জীবনের বৈচিত্র্য অনুগামী এমন সব কর্মবৃত্তির স্থান দেখা দিয়েছে, যাতে করে সেগুলিকে যথার্থই "পাঠ্য অঙ্গীভূত" বিষয় ছাড়া আর কিছু ভাবা যাবে না।

যে কোনো শিক্ষার কর্মসূচীতে তাই প্রয়োজন হয়েছে এমন সমস্ত জিনিস অন্তর্ভুক্ত করার, যেগুলি বাস্তব জীবনের সঙ্গে সত্যিকার সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। পাঠ্যতালিকা হবে তাই ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত। তা নিতান্ত পুঁথিগত ও গতানুগতিক হবে না। পাঠ্যতালিকা এমন ভারাক্রান্ত হবে না—যাতে জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ অভিজ্ঞতা আহরণে তা নিতান্ত অকেজো বলে প্রমাণিত হয়। সমগ্র ব্যক্তিত্ব সংগঠনের উপযোগী সর্বার্থসাধক পাঠক্রম প্রয়োজন হবে। শিশুমনের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা ও ক্ষমতা পূরণে তা হবে সহায়ক। আধুনিক যুগ বৃত্তিগত পেশা ও কারিগরী জিনিস শিক্ষা করার যুগ। পাঠক্রম এ গুলিকে অস্বীকার করলে শিক্ষা হবে নিতান্তই অকেজো। "জীবনের সঙ্গে জীবনের আশ্রয় স্থলটি" খুঁজে পেতে হবে। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য দেশে উদ্দেশ্যমূলক শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে প্রোজেক্ট প্রণালী, ডল্টন প্ল্যান প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাপদ্ধতির উদ্দেশ্য হিসেবে মুদালিয়ার কমিশনের বক্তব্য আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে।' এই কমিশন বলেছেন যে, শিশুর মনকে মৌলিক অনুপ্রেরণায় ও কৌতুকবোধের

প্রতি এমনভাবে জাগ্রত করে তুলতে হবে—যাতে তারা শুধুমাত্র বিষয় ভারাক্রান্ত না হ'য়ে পড়ে।

পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত বা বহির্ভূত কর্মপ্রবৃত্তির কিরূপ স্থান শিক্ষার ক্ষেত্রে হবে, এই নিয়ে কয়েকটি প্রতিশব্দের উৎপত্তি হয়েছে। পূর্বে একে Extra-curricular বলা হোতো। বর্তমানে কেহ কেহ Co-curricular, collateral, extra-class, non-class ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করছেন। শিক্ষকদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীর কর্মবৃত্তির যথার্থ ব্যাখ্যা খুবই কঠিন ব্যাপার। Encyclopedia of Educational Research (Chester W. Harnis with the assistance of Marie R. Libia: Third edition, 1960, Pp 506-511) এ সম্পর্কে বলেছেন—"The term extra-curricular which was among those used in the early period of the activities movement, is still perhaps the most commonly used today. The objection to it lies in its implication of something apart from, and even unrelated to, the curriculum. This fault applies of other terms which have been less often used but are still popular in some parts of the country. Such terms are *co-curricular*, *collateral*, *extra-class* and even *non-class* appear to set the field of student activities apart from the class-room" অর্থাৎ, এতদিন পর্যন্ত পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়ের কথা যা ব্যবহৃত হয়ে এসেছিল তা আজও সাধারণভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, এর সঙ্গে পাঠ্যসূচীর কোনো সংস্রব নেই। এই অভিযোগ এখন পর্যন্ত চালু অনেক প্রতিশব্দ যেমন—সহ-পাঠ্য, সম-পাঠ্য, শ্রেণী-অতিরিক্ত, শ্রেণীবিহীন ইত্যাদি নাম নিয়ে ব্যবহৃত হলেও আসলে এগুলিও শ্রেণীবহির্ভূত ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মধারাকে বুঝায়। কিন্তু, এখন আমরা co-curricular বা সহ-পাঠ্যকে বা "পাঠ্য-অঙ্গীভূত বিষয়বস্তু" শব্দকেই অধিকতর উপযোগী হিসেবে ব্যবহার করছি এইজন্য যে, পাঠ্যবস্তুর অঙ্গীভূত বিষয়গুলিই হবে এমন ধরনের যা শিক্ষার্থীকে জীবনের সত্যিকার সমস্যা সম্পর্কে পথের সন্ধান দিতে পারবে। ম্যাগাজিন পরিচালনা, বিতর্ক সভা, সাহিত্য সভা, বিজ্ঞান সভা, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ঋতু উৎসব, প্রদর্শনী, মিউজিয়াম গঠন, বিদ্যালয় ক্যান্টিন, বুক স্টল, দোকান পরিচালনা করা, যৌথ কর্মযজ্ঞ প্রভৃতি কর্মধারা শিক্ষার ব্যবহারিক ও জীবন্ত প্রয়োজনের

দিক থেকে এমনই মূল্যবান হ'য়ে দেখা দিয়েছে—যাতে ক'রে সমস্ত বিষয়বস্তুকে আর বিদ্যালয়পাঠ্য-বহির্ভূত বিষয় ব'লে চিন্তা করা যায় না। এই সমস্ত কর্মবৃত্তি এখন ছাত্রদের পাঠ্যগত মূল্যায়ন হিসেবেই গৃহীত হয়েছে বা হচ্ছে। পাঠ্য-ক্রমের উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই সমস্ত কর্মবৃত্তি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। 'It is the business of the school to organize the whole situation so that there is a favorable opportunity for everyone, teachers as well as pupils, to practice the qualities of the good citizen here and now with results satisfying to the one doing the practicing" (Ibid, P 507)।

শিক্ষকরা এ বিষয়ে অবহিত হবেন যে, একটি আদর্শ শিক্ষায়তন গ'ড়ে তুলতে হ'লে তার মর্মে মর্মে যেন শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রাণবন্ত কর্মধারার বিকাশ প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দেখা যায়, বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীদের স্বতঃপ্রবৃত্ত কর্মবৃত্তির অফুরন্ত স্থান রয়েছে। সেখানে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা পরিচালনা করছেন, যৌথ কর্মপ্রচেষ্টায় অনেককিছু জিনিস উৎপাদন করছেন, ধর্ম ও কল্যাণমূলক ক্লাব পরিচালনা করছেন, বড়ো বড়ো শিক্ষাবিদ্‌দের নিয়ে শিক্ষা-সংক্রান্ত সম্মেলন করছেন, বিদ্যালয়ে অর্কেস্ট্রা পার্টি গ'ড়ে তুলছেন, ক্যাম্প পরিচালনা করছেন, আরো কত-কিছু! সেখানে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন কর্মধারাকে শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল্য নির্ণয়ে বিশেষভাবে গণ্য করা হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি গণতান্ত্রিক ধাঁচে গড়ে উঠ্‌ছে। সেখানে শিক্ষার্থীরা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হচ্ছেন। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক সকলেই একই সমস্যা সমাধানে গভীরভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। শিক্ষার্থীদের বাস্তব কর্মধারা পাঠ্যবিষয়ে অঙ্গীভূত ব'লে বিবেচিত হওয়ায় সেখানে—"The concept that student activities should grow out of the open class-room and return to enrich it has gained momentum. Inclusion in the curriculum of music, speech and journalistic activities has demonstrated that there is no hard-and-fast line between the curriculum what was once called the "extra-curricular" (Ibid, P 509)। সেখানে বিদ্যালয়ের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কটা নানাভাবে গ'ড়ে তোলা হচ্ছে। সমাজ-সেবা, সংগীত-সম্মেলন, অভিভাবক-সম্মেলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সেখানে সমাজের সঙ্গে একটা সক্রিয়

সম্বন্ধ গ'ড়ে তোলা.হচ্ছে। যে কোনো প্রগতিশীল দেশেই যখন পাঠ্যক্রমকে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত, শারীরিক, ভাবগত, সাংস্কৃতিগত ও সামাজিক চাহিদার উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তোলা হয়েছে, তখন আমাদের দেশেও বিদ্যালয়ে এমন সমস্ত কার্যক্রম অনুসরণ করতে হবে—যাতে করে মুদালিয়র কমিশনের ভাষায় আমরা দিতে পারি ' practical training in the art of living and show him through actual experience how community life is organized and sustained"। বর্তমান যুগে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার' এতই সমৃদ্ধ হয়েছে—যাতে ক'রে সমস্ত বিষয়ই মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে "জোট" তৈরি ক'রে ব্যবহারিক ও বাস্তব কার্যধারার মধ্য দিয়ে তা শিক্ষা দিতে হবে। তাই, শিক্ষার্থীকে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের মধ্যে একটি নেতৃত্বদানের ক্ষমতা সৃষ্টি করতেহ্ বে শিক্ষককে। আদর্শ বিদ্যালয়ে কৃষি প্রদর্শনী, মিউজিয়াম, বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক চার্ট, মডেল তৈয়ারি, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সভা, ঋতু ও অন্যান্য সামাজিক উৎসব, "স্টুডেণ্টস্ কোর্ট", বিতর্ক ও বক্তৃতা সভা, প্রতিযোগিতা, ফ্রি-লাইব্রেরি সার্ভিস্, মনিহারী দোকান পরিচালনা, অভি-ভাবক সম্মেলন, ক্যাম্পলাইফ ও সমাজসেবা, পিকনিক প্রভৃতি সংগঠনের মাধ্যমে ছাত্রদের কর্মবৃত্তিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করতে হবে। কি শিক্ষক, কি অভিভাবক, কি শিক্ষার্থী সকলেই যদি এ বিষয়ে অবহিত হন যে, শিক্ষার্থীর বহুমুখী কর্মধারাই তার জীবনকে সত্যিকার আদর্শমণ্ডিত ও বাস্তব জীবনের উপযোগী ক'রে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে তাহলে আমরা আশা করবো আমাদের দেশের সর্বার্থসার্থক বিদ্যালয়গুলি সংগঠনের সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছে। শিক্ষককে সেজন্য logical ও pshychological methods অনুসরণ ক'রে চলতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, পাঠ্যাতিরিক্ত বিষয়াবলী যদিও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা হয় না, তথাপি যে-কোনো আধুনিক বিদ্যালয়ে এগুলি কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হিসেবে ধরা হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু কেতাবি শিক্ষা আহরণ করা নয় বলেই প্রয়োজন হয় শিক্ষার্থীর মধ্যে কতকগুলি মহৎ গুণ জাগ্রত করার—যেগুলি সুনাগরিক হওয়ার কাজে সাহায্য করবে। সেই গুণগুলি সাধারণভাবে বলতে গেলে :—

(ক) বহির্জীবনের সমস্যাকে বুঝবার ক্ষমতা আহরণ

(খ) জীবনে সত্যিকার বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষমতা অর্জন, (গ) আত্মনিয়ন্ত্রণ,

(ঘ) সততা

(ঙ) দেশাত্মবোধমূলক কাজে প্রেরণা ও সাহস

রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে, শুধুমাত্র আবশ্যকীয় জিনিসে আবদ্ধ থাকা মানুষের স্বভাবধর্ম নয়। মানুষের মধ্যে কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটা ভাব কাজ ক'রে থাকে। আর, এই ভাবধারায় সুষ্ঠুভাবে চরিত্র গঠনের কাজে সাহায্য করে বিভিন্ন কর্মবৃত্তি। শিক্ষক সেই কাজে সাহায্য করেন ব'লে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ মন্তব্য করেছেন—"The function of the teacher is to draw out the inner splendour of the student and to prove his practical utility to the world." পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া উচিত একটা Play-spirit যা শিক্ষার সমাজতান্ত্রিকরণ বিষয়ে সাহায্য করে এবং যা তার আনন্দ স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে জাগিয়ে তোলে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আমরা পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মসূচী গ্রহণের যে নীতির কথা পূর্বে আলোচনা করেছি, সেই একই নীতি প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী যেগুলি নির্দিষ্ট হবে সেগুলি হবে কর্মকেন্দ্রিক (activity centric)। তাই, এই পর্যায়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান বাস্তবের সঙ্গে যাতে মিল রেখে অর্জিত হয় সেজন্য পাঠ্যসূচীর অধিকাংশ শিক্ষণীয় জিনিস নানাধরনের কর্ম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই গ'ড়ে তুলতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার সমগ্র আবহাওয়ায় একটি play spirit কাজ করবে। সমাজ পরিচিতি, নানাধরনের সৃষ্টিমূলক কাজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয় যেন অভিজ্ঞতা-প্রসূত হয় প্রাথমিক শিক্ষার পর্যায়ে। সর্বদা দেখতে হবে যে, সুকুমারমতি শিক্ষার্থীরা যেন বাস্তব শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অভিজ্ঞতার দ্বারা অর্জন করে, নিছক মুখস্থ করে নয়।

Questions :

1. Discuss the nature of Extra-curricular or Co-curricular activities to be introduced in Secondary Schools.
2. Dicuss the principle of 'Activity Centric' education and its bearning upon the Primary Education.

References :

1. Encyclopaedia of Educational Research
2. K. K. Mookerjee—New Education and its Aspects.

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কার ও শিক্ষার পথনির্দেশ

(Reforms of Examination system and Problems of Educational guidance)

পরীক্ষা পদ্ধতি যাতে নিখুঁত হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ; কেননা এই ব্যবস্থাপনা এ দেশে যেভাবে চলে আসছে তা ঠিক যুগোপযোগী নয় বা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের উপযোগী নয়।

পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে আমাদের দেশে লর্ড কার্জন কিছু ভেবেছিলেন বটে, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে এই নিয়ে কোনো সুষ্ঠু কাজ আরম্ভ হয়নি। এই বিষয়ে স্যাডলার ও হার্টগ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেছিলেন—"No system in our national and structural of our national education occupies at the present moment more public attention than our system of examination." কিন্তু সাম্প্রতিককালে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন পরীক্ষা-ব্যবস্থাকে সমালোচনা ক'রে ব্যঙ্গোক্তি ক'রেছেন—"এই পরীক্ষা-ব্যবস্থা নিছক চাকুরী সংগ্রহের লটারী যোগাড়ের বাতিক'। এই কমিশন সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—"An unsound examination system continues to dominate instruction to the detriment of a quickly expanding system of education.." স্বাধীন ভারতে পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সমস্যা আরো গভীরভাবে অনুসন্ধানের বিষয় হওয়ায় এ বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য এবং প্রগতিশীল ধারণা পোষণ করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। মেকলে প্রবর্তিত পরীক্ষাপদ্ধতির লক্ষ্য ছিল কেরানী তৈয়ারি করা; কিন্তু স্বাধীন ভারত সে লক্ষ্য মেনে নিতে পারেনি বলে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন স্পষ্টই বলেছেন—"If we have to make any reform in the higher education, it is in the examination system."

পরীক্ষা গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ? স্যাণ্ডিফোর্ড বলেছেন যে, পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবর্তনটা নিখুঁত ও বিশ্বস্তভাবে পরিমাপ করা হয়। এইজন্য বিদ্যালয়ে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় তার নাম বিদ্যালয়-পরীক্ষা এবং

বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আওতার বাহিরে সাধারণভাবে যে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাকে বলা হয় 'পাবলিক একজামিনেশান'। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পাঠোন্নতি দেখা নয়, শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ জীবনের কতখানি উপযোগী, তা দেখাও এইরূপ পরীক্ষার উদ্দেশ্য। কেহ কেহ মন্তব্য করেছেন যে, এই জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা শুধু যে prognostic value পরিমাপ করা হয় তা নয়, diagonistic value'ও মাপ করা হয়। Odell তাঁর এক গ্রন্থে বলেছেন যে. এ জাতীয় পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নাকি অনুকরণ প্রবৃত্তি জাগানো হয় এবং পুনরাবৃত্তির ক্ষমতা পরীক্ষা করা হয়। যাহোক, এই জাতীয় পরীক্ষার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে নানাপ্রকার মন্তব্য শোনা যায়।

সমালোচকরা পাবলিক একজামিনেশানকে বলেছেন—'রক্ত শোষক', 'স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির কৌশল', 'আবশ্যিক দোষ' প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই বলেছিলেন—"মুখস্ত করিয়া পাশ করাই তো চৌর্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়। আর যে ছেলে তাব চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কী করিল, সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানা অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্ত করিয়া পাশ করে তারা অসভ্য রকমে চুরি করে, অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই ?" পাবলিক একজামিনেশানের ত্রুটি সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্রেরা পাঠ্য পুস্তক না প'ড়ে শুধু নোট বই পড়ে, আর ইতিহাস-ভূগোলকে কদর্থ করে থাকে, কেননা তারা মুখস্থ বিদ্যার আশ্রয়ে শেষ পর্যন্ত তোতাপাখিতে পরিণত হয়। এ জাতীয় পরীক্ষার আর একটি ত্রুটি হোলো এই যে, এর দ্বারা অত্ত অল্প সময়ে কারো দক্ষতা বা যোগ্যতা পরিমাপ সম্ভব হয় না। তা'ছাড়া যার যে বিষয়টা ভালো লাগে না তাকে জোর ক'রে পরীক্ষা পাশের জন্য সে বিষয়ে তৈরি হতে হয়। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বলেছেন যে. রামানুজম্ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় অঙ্কে পাশ করতে পারেননি বলে তাঁকে আটকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অথচ পরবর্তিকালে তিনি বিখ্যাত গাণিতিক হয়েছিলেন।" এই পরীক্ষা-ব্যবস্থার অন্যতম ত্রুটি হোলো যে, পরীক্ষকের খেয়ালখুসি মাফিক নম্বর দান অনেক সময় ছাত্রদের যথার্থ বুদ্ধি, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রভৃতির পরিমাপ করতে সমর্থ হয় না। Starch তাঁর Educational Psychology গ্রন্থে এক তথ্য দিয়ে

দেখিয়েছেন যে, জ্যামিতির খাতা দেখতে গিয়ে ১৪৪ জন শিক্ষকের মধ্যে কেহ কেহ একই লেখার জন্য ৮০%, ৪০%, ২০% নম্বর দিয়েছেন। Ballard অনুরূপ আর একটি উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, একটি ইতিহাসের খাতায় একটা প্রশ্নে প্রথমে পরীক্ষক ৫০নম্বর দিয়েছিলেন কিন্তু আবার যখন সেই প্রশ্নই নিখুঁতভাবে নির্ভুল বানানের সঙ্গে লেখা হোলো তখন তাকে দেওয়া হোলো ৭০ নম্বর। পাবলিক একজামিনেশানের আর একটি ত্রুটির কথা Board of Education-এর ১১০ নম্বর প্যামপ্লেটে উল্লিখিত হয়েছে—"এপ্রিল ও মে মাসে পরীক্ষায় চিন্তার জন্য নাভিতন্ত্রের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এতই দ্রুত হয়—যাব জন্য পরীক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি এসে উপস্থিত হয়।" এ জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো সৃজনীশক্তি বা মৌলিক চিন্তার স্থান দেওযা হয় না, পরীক্ষা শুধু 'পরীক্ষা পাশের' জন্যই নির্দিষ্ট হয়। বর্তমান পবীক্ষাপদ্ধতি শুধুমাত্র বুদ্ধিগত কাজের পরিমাপ করে, অথচ শিক্ষার্থীর অন্যান্য কর্মমূল কদিক ও রুচি-প্রবণতাকে আদৌ বিচার করে না। ভারত সরকার সেজন্য এই চিরাচরিত পরীক্ষাধারায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যথার্থভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয় ব'লে নতুন ব্যবস্থাপনায় ছাত্রদের যাবতীয় কর্মের একটা মূল্য বিচার বা evaluation এর কথা বলেছেন। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন দেখিয়েছেন যে, পরীক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের জন্য নতুন কায়দা অনুসরণ করা প্রয়োজন। কেননা পাবলিক একজামিনেশান বা external examination একমাত্র বিচারেব মাপকাঠি হোতে পারে না। এই কমিশন সুস্পষ্টভাবে বলেছেন—"The external examination gives a teaching standard common for all teachers and therefore universal and uniform in character. It also releases him from the responsibility of making wrong judgments about the work of his pupils." সেইজন্য যদিও আমরা পাবলিক একজামিনেশানকে একদম উড়িয়ে দিতে পারি না, তথাপি আমাদের দেখতে হবে যে এর ত্রুটিগুলোকে নতুন ব্যবস্থাপনায় কিভাবে সংশোধিত করা যায়। প্রচলিত পবীক্ষা পদ্ধতিব আর একটা ত্রুটি হোলো এই যে, এই ব্যবস্থাপনায় পরীক্ষার ফলের উপর খুব বেশি জোর দেওয়া হয়। হাণ্টার কমিশন ১৮৮২ সালে এই সুপারিশ করেন যে, শিক্ষকদের মাহিনা দেওয়া হবে যেমন তাঁরা শিক্ষার্থিদের পরীক্ষার ফল ভালো বা মন্দ দেখাবেন। অভিভাবক, কমিটি, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সকলেই

পাবলিক একজামিনেশানের ফলাফলকে শিক্ষকের যোগ্যতার নিদর্শন হিসেবে ভেবে থাকেন। এই পরীক্ষা পদ্ধতির আর একটা ক্রটি এই যে, নানা কারণে ছাত্ররা সমস্ত পরীক্ষায় এক ধরনের ফলাফল দেখাতে পারে না, অথচ তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে শেষ একটি পরীক্ষার মাপকাঠিতে ফলাফল বিচার ক'রে বলে দেওয়া হয়। এর ফলে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় ৩৮%—৬০% এবং ডিগ্রী পরীক্ষায় ২০%—৬২% ছাত্র ফেল করে এবং জাতীয় অপচয় অনেকখানি হয়। পরীক্ষাকে মূলকেন্দ্র ক'রে ছাত্রদের পাঠ্যবস্তু এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে অন্য কোনো সৃজনী শক্তির মূল্য স্বীকৃত হয় না। এজন্য Calcutta University Commission বলেছিলেন—"All instructions are imparted within the narrow limits of the syllabus, all other education does not come under the period of the examination and which cannot be asked in question papers is badly neglected Both the teachers and the taught pay more attention and centre all their energies to the probable questions expected in examinations, rather than to the real teaching and studies."

পরীক্ষা পদ্ধতির যে সমস্ত ক্রটি উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি কথাই সত্য। সত্যই পরীক্ষাকে আমাদের চাকুরী সংগ্রহের পাশপোর্ট হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, 'a test of efficiency' হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি। অথচ স্যাণ্ডিফোর্ডের ভাষায় পরীক্ষার উদ্দেশ্য হবে—"to measure the changes more accurately and reliably." রাধাকৃষ্ণণ কমিশন সেইজন্য "উদ্দেশ্যমূলক বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী" নিয়ে পরীক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের কথা বলেছেন। এই কমিশন পরীক্ষাকে "ব্যবহারিক" করে তোলার জন্য সুপারিশ ক'রে বলেছেন যে, পরীক্ষার জন্য বুদ্ধিমাপ সংজ্ঞা নির্ধারক কতকগুলি প্রশ্নাবলী রচিত হওয়া উচিত যা "হাঁ" বা "না" এই উত্তরের সাহায্যে পরীক্ষার্থীর আসল তথ্যজ্ঞান ও বাস্তববুদ্ধি পরিমাপ করবে। তবে শুধুমাত্র "হাঁ" বা "না" জ্ঞাপক তথ্য পরিমাপ করা হ'লে শিক্ষার্থীর বস্তুগত জ্ঞান, রচনাশৈলী, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি পরিমাপ সম্ভব হবে না ব'লে এর সঙ্গে কিছুটা 'রচনামূলক" পরীক্ষাও চালু থাকা উচিত। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন পরীক্ষাকে এজন্য দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—(ক) ব্যবহারিক শব্দ জ্ঞানের পরীক্ষা এবং (খ) মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা। এ পরিকল্পনা গ্রহণ করলে অর্থের

সাশ্রয়, সময়ের অপচয় নিবারণ, মৌলিক চিন্তার ফুরসুৎ, অনুশীলন প্রবৃত্তির বিকাশ প্রভৃতি নানা দিক থেকে ভালো কাজ পাওয়া যেতে পারে ব'লে শিক্ষাবিদ্‌গণ এ জাতীয় পরীক্ষা পরিকল্পনাকে সাদর অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ভারত সরকার পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য দশ বৎসরের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। ডঃ শ্রীমালী এই প্রসঙ্গে বলেছেন—"When we talk of examination reform, few of us realize that any change in this time-honoured mechinery actually involves a revolutionary education. In trying to replace the present examination system, we have to re-define our educational objectives and then fashion our educational objectives and then fashion appropriate evaluation tools." ডঃ শ্রীমালী দেখিয়েছেন যে, প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতি এত বেশী বুদ্ধিগত দিকটার উপর জোর দেয়—যাতে ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব জিনিসটা সঠিক পরিমাপের কোনো সুযোগ তাতে থাকে না। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ বি. এস. ব্লুম পরীক্ষা সংস্কার সম্পর্কে ভারতের আগ্রহকে প্রশংসা করে বলেছেন যে, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন যথার্থ পরীক্ষা পদ্ধতিরই সুপারিশ করেছেন। ডঃ সি. ডি. দেশমুখ পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার সম্পর্কে তিনটি দিক দেখিয়েছেন—

(১) প্রয়োজনীয় সংস্কারের জন্য ক্রমশ একটা পরিবর্তন আনবার প্রক্রিয়া গ্রহণ,

(২) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিভার অপব্যয় ও সময়ের অসদ্‌ব্যবহারকে নিবারণ করা,

(৩) বিষয়বস্তুকে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য অনুযায়ী বহুবিস্তৃত ক'রে তোলা।

ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষাগত মান পরিমাপের জন্য নানাধরনের পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে। তন্মধ্যে অধুনা প্রবর্তিত Cumulative Record Card প্রথা অন্যতম। পরিমাপ করার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রস্ মন্তব্য করেছিলেন—"From birth to death, almost every aspect of our dirty lives is touched by its numerous forms." উইলিয়াম এ. ম্যাকল বলেছেন—"Measurement, is just as immanent in the whole educational process as in life in general. There are other things in education besides measurement, but they have no value so long as they are dissociated from it." থর্নডাইক বলেছিলেন যে, "If anything exists at all, it must

exist in some amount, and if anything exists in some amount, it is measurable." একথা সত্য যে শিক্ষকগণ যে পরিমাপ ব্যবহার করবেন তা কখনো গাণিতিক সূক্ষ্ম বিচারের আওতায় পড়তে পারে না। কেননা, তাঁদের বিচার্য বিষয় হো'লো পাঠ্যোন্নতি ও অন্যান্য ব্যক্তিত্ব-বিকাশ পরিমাপ ক'রে তোলা। শিক্ষকের কার্যের সুবিধার জন্য আজকাল নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক পদ্ধতি বা testing tools আবিষ্কৃত হয়েছে, যেমন—মৌখিক পরীক্ষা, রচনাধর্মী পরীক্ষা, ছকবাঁধা বা ছকবাঁধাহীন পরীক্ষা, standardized বা non-standardized tests, essay-type বা objective type tests, achievement, intelligence, personality tests, ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত test, prognostic বা diagonistic tests ইত্যাদি। নতুন ধরনের প্রশ্নাবলী পরীক্ষার একটা ভালো দিক হোলো যে, এর সাহায্যে ছাত্রদের শিক্ষাগত মান অর্জন সুষ্ঠুভাবে পরিমাপ করা যায় এবং বিশ্বস্ত ও নিখুঁত ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এও ঠিক যে, রচনামূলক পরীক্ষাপদ্ধতির অনেক ভালো দিকও আছে। যেমন, এর সাহায্যে আমরা তথ্যগত জ্ঞানের পরিচয় জানতে পারি, উচ্চগত মানসিক কর্মের পরিচয় পাই। অথচ নতুন পরীক্ষাপদ্ধতিতে যে সমস্ত sampling পাওয়া যায় তা খুব সীমাবদ্ধ এবং টেষ্ট তৈয়ারীর ব্যাপারটা বড়ো কঠিন। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন এই দিক দিয়ে বিচার ক'রে দেখেছেন যে, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থাকে একদম সমূলে বিনাশ না ক'রে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধন মেনে নেওয়া ভালো। কতগুলি নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি এমনভাবে জুড়ে দিতে হবে যাতে ক'রে ছাত্ররা নির্বাচনের সুযোগ পায়, পথনির্দেশ ও উপদেশ পায়, তাদের উন্নতি ঠিক মাপা যায়, মান পরিমাপ ক'রে তার ত্রুটি সংশোধন ক'রে শিক্ষার্থীর উন্নতিকে পরিমাপ করা যায়। মুদালিয়ার কমিশনও পরীক্ষাপদ্ধতির বিষয়টি পর্যালোচনা ক'রে বাস্তবসম্মতভাবে বলেছেন যে—"the objective type of tests should be widely used to supplement the essay-type tests." এই নীতি কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য বর্তমানে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে—Evaluation unit স্থাপন ক'রে, Evaluation officer নিয়োগ ক'রে এবং অসংখ্য সেমিনার ও ওয়ার্কসপ গঠন ক'রে। আজকের দিনে আমাদের সেণ্ট অগাস্টাইনের মন্তব্য মনে রাখা উচিত। তিনি বলেছিলেন—"A thing is not necessarily true because it

is uttered badly, nor falsebecause spoken magnificently." আমাদের উচিত নতুন ব্যবস্থাপনা গ'ড়ে তুলে তার সার্থকতা প্রতিপন্ন করা। পি. সি. রেন্ যথার্থই বলেছেন—"Let us regard education as a wholly beneficial journeying through the delightful fields of learning, and an examination as an interesting, helpful, wayside incident and nothing more."

মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ সম্প্রতি ছাত্রদের internal assessment-এর জন্য Cumulative Record Card প্রথা প্রবর্তন করেছেন। এই Record Card-এর প্রথম অংশ স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিমাপ জ্ঞাপক এবং দ্বিতীয় অংশ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্ম অনুষ্ঠানে অর্জিত পুরস্কার প্রভৃতি পাওয়ার বিবরণ নির্দেশক। তৃতীয় অংশে ছাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবণতা পরিমাপের ব্যবস্থা হয়েছে। কোন ছাত্র সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, কারিগরী বিদ্যায়, শিল্পে, সংগীতে, কৃষিকর্মে, ব্যবসায়, গৃহস্থালী কর্মে ও অন্যান্য বিষয়ে কিরূপ রুচির পরিচয় দেয় তা এই অংশে পরিমাপ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বহুমুখী প্রবণতা পরিমাপ ক'রে ছাত্রদের Counselling ও Guidance দেওয়া হবে তারা কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে ভবিষ্যতে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ও জীবিকায় অংশ গ্রহণ করবে। চতুর্থ অংশ শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়গত উন্নতির পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট। একই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময় ছাত্ররা কিরূপ উন্নতি করে তার একটা গড় হিসেব এই পরিমাপে পাওয়া যায়। পঞ্চম অংশটি বিদ্যালয় বহির্ভূত বিভিন্ন বিশ্রামমুখীন, সামাজিক, বুদ্ধিগত ও সাহিত্যগত কর্মমূলক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের পরিমাপ করে। ষষ্ঠ অংশে ছাত্রের ব্যক্তিত্ব পরিমাপের ব্যবস্থা আছে। এই অংশে ছাত্রের উদ্যম, পরিশ্রম-ক্ষমতা, দায়িত্ববোধ, সহযোগিতা-মূলক মনোভাব, ভাবগত পরিচয়, আত্মবিশ্বাস, কর্মমূলক অভ্যাস প্রভৃতি গুণাবলী পরিমাপ করার ব্যবস্থা সংরক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়াও আরো অনেক তথ্য এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মন্তব্য সন্নিবিষ্ট করবার সুযোগ রাখা হয়েছে।

অধ্যাপক অনাথনাথ বসু মহাশয় "School Record" নামক পুস্তিকায় Record Card সম্পর্কে অনেক সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এই রেকর্ড চালু করার কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে, পরীক্ষাপদ্ধতি যে ভাবে আমাদের দেশে আছে তা শিক্ষার্থীর সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিমাপসূচক

নয়। এইজন্য তিনি বলেছেন—"The only way to mitigate these evils of external examination is not to abolish them altogether as some advocate (for external examinations too have their value), but to put them in their proper place and to find the means to take into consideration and give due credit for the work done in the classroom and for the progress made by a child throughout the school course." এই ক্ষেত্রে School records খুবই কার্যকরী হতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও বলেছেন যে, এই জাতীয় রেকর্ড কার্ড প্রবর্তনের দ্বারা শিক্ষার্থীর বিভিন্ন সময়ের কার্যদক্ষতা ও অনুরক্তি, রুচি ও প্রবণতাকে এমনভাবে পরিমাপ ক'রে তুলবে যা তার সমগ্র জীবনটিরই এক নিখুঁত পরিচয় তুলে ধরবে। এইজন্য বর্তমানে শিক্ষাবিদ্‌গণ New-type Examination, Essay-type Examination, Tutorial work, Extra-curricular activities প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। পাব্লিক একজামিনেশান এই সমস্ত কিছুকে মূল ভিত্ত ক'রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আমাদের বিবেচনায় এই সঙ্গে শিক্ষার্থীর প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতা পরিমাপের জন্য viva voce ও মৌলিক প্রবন্ধ রচনাকেও পরীক্ষাব্যবস্থার অন্যতম সূচী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত হবে।

আমরা পরীক্ষাপদ্ধতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটিবিচ্যুতি এবং তা প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করেছি। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য আমরা অনেক আলোচনা করেছি। প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রেও উপরিবর্ণিত নীতিগুলি মূলত প্রযোজ্য। তবে প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষাব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র ধরনের হওয়া সমীচীন। অনেকে প্রাথমিক শিক্ষার শেষে Public Examination-এর প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন এই Public Examination প্রথা রহিত ক'রে দিয়ে শিক্ষকগণের উপর শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ণয়ের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু, এতে ফল ভালো হয়নি বলে পুনরায় Public Examination ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষার সমাপন শেষে একটি public examination প্রয়োজন। তবে এ বিষয়ে শিক্ষকগণের দ্বারা সংগৃহীত Record Card-এর উপর নির্ভর ক'রে শেষ সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হবে। এই Record Card-এ শিক্ষার্থীর নানা

বিষয়ে দক্ষতা ও কর্মক্ষমতার নিদর্শন থাকবে যা তাদের পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষাগ্রহণে সহায়ক হয়। Public examination-এ নিছক বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক প্রশ্নাবলী রচনা না ক'রে সহজ সরলভাবে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নাবলীর ব্যবহার খুব বেশী প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের সুপরিচিত পরিবেশের মধ্য থেকে আহৃত জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে এই জাতীয় প্রশ্নাবলী হওয়া উচিত। তাই, মাধ্যমিক শিক্ষার পরীক্ষা সংস্কারের মূলনীতি স্মরণ রেখে প্রাথমিক শিক্ষার পরীক্ষাপদ্ধতি আরও সহানুভূতির সঙ্গে সহজ সরল করে তুলতে হবে।

Questions :

1. What are the defects of the present primary and Secondary Examination systems ? Suggest some remedial measures.
2. State clearly the merits and demerits of Essay-Type and New-Type Examinations.
3. Discuss the utility of Cumulative Record Card in modern Secondary Schools.

References :

1. A. N. Basu—Cumulative Record card.
2. The Secondary Education Commission's Report.
3. Starch—Educational Psychology.
4. The University Education Commission.

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যা

(The Problem of Teachers' Training)

শিশু-শতাব্দী (Children's Century) ঃ পূর্বে শিক্ষা, বিশেষ ক'রে শিশুর জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষা ছিল পুস্তক-কেন্দ্রিক। বর্তমানে রুশোর প্রভাবে তাহা দাঁড়িয়েছে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায়। ইংরেজিতে এই অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে paedo-centricism। এখন শিক্ষাক্ষেত্রে জন অ্যাডামস্ প্রবর্তিত শিক্ষানীতিই অধিকমাত্রায় গৃহীত হয়েছে—তিনি বলেছেন যে, শিক্ষক জনকে ল্যাতিন শিক্ষা দেন ('The master taught John Latin'—Magister Johannem Latinam docuit)। চিরাচরিত শিক্ষাধারা শুধু শিক্ষক ও বিষয়বস্তুর উপর জোর দিত কিন্তু যার জন্যে শিক্ষার এত আয়োজন সেই শিশুকেই একেবারে অবহেলা করা হোতো। বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ ক'রে তাই প্রবণতা দেখা দিয়েছে শিশু কল্যাণ আদর্শের—আর, এইজন্যই তো শিক্ষাবিদ্‌রা এ যুগকে আখ্যা দিয়েছেন যথারীতিভাবে "শিশু-শতাব্দী" রূপে।

শিশুকে সম্যক্‌রূপে জানবার বা তাকে উপলব্ধি ক'রে শিক্ষারীতিকে ঠিক সেইভাবে কাজে লাগানোর জন্যে যে চেষ্টা চলেছে তাকে আমরা ব'লে থাকি "মনস্তাত্বিক প্রবণতা।" শিশু-প্রকৃতিকে না জানলে শিক্ষার কার্যই অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে ব'লে আধুনিক কাল পর্যন্ত মনস্তাত্বিকগণ এ বিষয়ে সম্যক অবহিত হয়েছেন। এই ব্যবস্থাপনার জনক হলেন পেষ্টালজী। অবশ্য এঁর পূর্বে রুশো তাঁর 'এমিলের' মধ্যে এই সংক্রান্ত বিষয়ের অবতারণা করেছিলেন তা পূর্বেই বলেছি।

এতদিন পর্যন্ত শিশু-শিক্ষার ইতিহাসে দেখা গেছে যে, শিক্ষা অর্থে শুধু তথ্য ভারাক্রান্ত ক'রে তোলা। কিন্তু রুশো-পেষ্টালজী-মন্টেইন-লক প্রমুখ শিক্ষা-গুরুরা শিক্ষার অসম্পূর্ণতার কথা দেখিয়ে দিলেন। অবশ্য প্লেটো ও সক্রেতিসের যুগে শিশুর প্রকৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। আমরা দেখেছি প্লেটো মনস্তাত্বিক প্রবণতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছিলেন—মানুষের স্বভাবকে বিকশিত ক'রে তোলার জন্য পরিচর্যাই

হোলো শিক্ষার কাজ, আর এজন্য পরিচর্যার চেয়ে শিশু প্রকৃতিই খুব বড়ো জিনিস। ফেল্টার, কমেনিয়াস প্রমুখ রেনেসাঁস যুগের শিক্ষাবিদেরা, লক, রুশো, ফ্রোয়েবেল, পেষ্টালজী, হার্বার্ট প্রমুখ পরবর্তী শিক্ষাবিদেরা সকলেই দেখাতে চেয়েছেন যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে আর কোনোমতেই গৌণ করে রেখে দেওয়া চলবে না। শিক্ষা অর্থে যে শুধু নিছক শিক্ষাদান নয়, শিক্ষা অর্থে যে জ্ঞান বিতরণ নয়, এর যে গূঢ় দর্শনগত, মনস্তত্ত্বসম্মত ও সমাজতত্ত্বগত অর্থ লুক্কায়িত রয়েছে তা ক্রমশই শিক্ষাবিদের দৃষ্টিপথে পড়ায আধুনিক শিক্ষা এক যুগান্তকারী পর্যায় অতিক্রম করে চলেছে। এতদিন পর্যন্ত শিক্ষার ভাবগত যে দিকটার কোনো মূল্যই দেওয়া হোতো না, নূতন শিক্ষায় তা বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করল—শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুদের কল্পনাপ্রবণতা, ভাবাবেগ, উদ্দেশ্য, উদ্দীপনা সবকিছু নতুন ভাবে বিকশিত হওয়ার এক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা গেল। রুশো এই প্রবণতার জন্য বিশেষ ভাবে দায়ী, আর তিনিই না বলেছিলেন "শিক্ষা মানে ভাবের মধ্য দিয়ে শিক্ষা"। শিশুর পরিপূর্ণ সত্ত্বা, তার ব্যক্তিত্ব সব কিছুকে বিকশিত ক'রে তুলতে হ'লে প্রয়োজন সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন। কেননা, ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠে সমাজকে কেন্দ্র করেই, তার ঘাত-প্রতিঘাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। আর, ব্যক্তিত্ব কেবলমাত্র "সামাজিক অবস্থার" মধ্য দিয়ে গড়ে উঠ্‌তে পারে—'Individuality develops only in a social atmosphere where it can feed on common interests and common activities." এই ব্যক্তিত্ব মানেই শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় তার সামগ্রিক সত্ত্বার পরিপূর্ণ বিকাশ। সমাজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে উদ্বোধিত ক'রে তোলার জন্য সাহায্য করবে আর ব্যক্তি সমাজের কল্যাণের জন্য কিছু অবদান রাখবে। শিক্ষা ব্যক্তির নিম্নলিখিত সত্ত্বাগুলিকে উদ্বোধিত করে তুলবে:

(১) শারীরিক (physical)

(২) প্রানিক (vital)

(৩) মানসিক (mental)

(৪) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক (psychic and spiritual)

যে কোনো সুষ্ঠু শিক্ষা কার্যের ক্ষেত্রে চাই মূল্যবোধ ও লক্ষ্য সম্পর্কে ধারণা। তা কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে মুদালিয়র কমিশন বলেছিলেন দুটি বিস্তৃত স্বচ্ছ ধারণার কথা। একটি হোলো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব

বিকাশ, অন্যটি ব্যক্তির অতীত কোনো পরিচয়ের কথা। আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি গোষ্ঠির সুপারিশের মধ্যে এই মতামতের সমর্থন পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে—

"The first arises out of concern for the individual the second out of concern for somthing beyond the individual"। প্রথম লক্ষ্য অনুসারে শিক্ষাতন্ত্র ব্যক্তির ব্যক্তিগত সত্বার বিকাশের প্রতি বিশেষ নজর দেবে যেমন তার শারীরিক, বুদ্ধিগত, ভাবগত সত্বার কথা। কমিশন যথার্থই বলতে চেয়েছেন যে, শিক্ষার লক্ষ্য কেতাবী হবে না—তা হবে শরীর ও মনের স্বাস্থ্যগত বিকাশ, চরিত্র ও সামাজিক দায়িত্বের বিকাশ, সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য তা উদ্‌গ্রীব হওয়ার কাজে সাহায্য করবে, জ্ঞান ও বোধের ক্ষেত্রে আনবে বুদ্ধিগত বিকাশ, স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, চিন্তার স্বাধীনতা, গঠনধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি, সৃজনী শক্তির স্ফূরণ বা "the development of the artist in each human being"। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে যাতে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত ক'রে তোলা যায় সেজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশুদের চাহিদা ও প্রয়োজনের দিকে বিশেষ নজর দেওযার প্রয়োজন সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন। কিন্তু, আর একটি লক্ষ্যের কথা আমাদের ম'নে রাখতে হবে—তা হোলো শিক্ষার সত্যিকার বিস্তৃত লক্ষ্য কি বা কোন্ পরিণতির দিকে শিক্ষা আমাদের নিয়ে যাবে। আর এই বিস্তৃত লক্ষ্যের কথা ভাবতে গেলে আমাদের চিন্তা করতে হয় যে, শিক্ষা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে করে তুলবে ধর্ম-নিরপেক্ষ (অধর্মীয় নয়)। তা নাগরিক ক'রে তুলবে, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য "উৎপাদন ক্ষমতার" বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে এবং সারা দেশব্যাপী একটা "সাংস্কৃতিক জাগরণ" এনে দেবে। ব্যক্তি এখানে জাতীয় ও সামাজিক সত্বা নিয়ে কাজ করবে, আর তার মধ্যে থাকবে অকৃত্রিম জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধ কোনক্রমে সংকীর্ণ হবে না—তা হবে আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের পরিপূরক। আমাদের সামাজিক আদর্শবাদ সম্পর্কে যে ধারণা শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিতে হবে তা হবে শাশ্বত মূল্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে। একে মানতে গিয়ে আমাদের কোনক্রমে ভুললে চলবে না যে, শিক্ষার লক্ষ্য হবে সংস্কৃতিমূলক। বর্তমান চাহিদা ও প্রয়োজনকে যেমন আমাদের মেনে নিতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে—তেমনি মেনে নিতে হবে যে শিক্ষা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্বীকার ক'রে নিতে ব'লে।

The Report of a Study by an International Team শিক্ষার প্রণালী ও উপাদান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যে যে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই রিপোর্ট প্রধানত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কীয় হ'লেও আমরা তাঁদের সিদ্ধান্তের মধ্যে কতকগুলি সার্বজনীন নীতির সন্ধান পেয়ে থাকি—

(১) মানুষ ব্যক্তি হিসেবে আর সামাজিক সত্ত্বা হিসেবে পৃথকভাবে কাজ করতে পারে না। সমাজ সমৃদ্ধ হ'তে পারে ব্যক্তির স্বাধীন কর্মবৃত্তির মাধ্যমে। সমাজের প্রতি অনুরক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ—এ দুটোকেই মেনে নিয়ে চলতে হয়। এই দুটোর সম্মেলনে বিদ্যালয়ের আবহাওয়া হ'য়ে উঠ্‌বে উদ্দেশ্যমূলক ও আনন্দজনক।

(২) দৈনন্দিন রুজিরোজগারের প্রশ্নকে আমরা একদম বিস্মৃত হো'তে পারি না। কেননা, পারিপার্শ্বিক অবস্থানুযায়ী অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের জন্য বৃত্তিগত ঝোঁক নিয়ে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আমরা একদম অস্বীকার করতে পারি না। নিছক বৃত্তিগত আদর্শকে আমরা সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে উন্নীত ক'রে তাকে গ্রহণ করতে পারি, আর শিক্ষক যতই উচ্চধরনের আদর্শবাদ পোষণ করবেন ততই তিনি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জীবন-বোধ সম্পর্কে সচেতন ক'রে তুলতে পারবেন তাঁর কাজের মাধ্যমে।

(৩) শিক্ষা মানুষকে অজ্ঞতা ও পরাধীনতা থেকে বাঁচিয়ে তুলবে। সংকীর্ণ দেশপ্রেমের আদর্শকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করতে হবে এক মানবতার আদর্শ, যাকে one world allegiance বলেছেন International team। প্রত্যেক জাতির সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করতে হবে এই মাপ কাঠিতে যে, তার মধ্যে অনেক সার্বজনীন উপাদান লুক্কায়িত রয়েছে।

(৪) শিক্ষাতন্ত্রের যাঁরা চালক হবেন তাঁদের মধ্যে যদি উচ্চাদর্শ থাকে তবে তার প্রভাব সমগ্র শিক্ষাতন্ত্রে গিয়ে পৌছুবে। শিক্ষার লক্ষ্য যদি বিস্তৃত ভাবে গ্রহণ করা হয় তবে তার প্রভাব পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রেও গিয়ে পৌছুবে। যদি লক্ষ্যবোধটা সুনির্দিষ্ট হয় তবে তার প্রভাব যুগোপযোগী পাঠ্যসূচীর পরিবর্তনের নীতির উপরও প্রভাব রাখতে সাহায্য করবে।

এই আন্তর্জাতিক ভ্রমণকারীর দল আট বৎসর প্রথম মাধ্যমিক পর্যায় ও তৎপরের মাধ্যমিক পর্যায়ে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণের সুপারিশ করেছেন—

(ক) প্রথম আট বৎসরের মাধ্যমিক পর্যায়ে শিশু লেখাপড়া, অঙ্ক কষা সম্পর্কে ভালভবে জ্ঞান আহরণ করবে—প্রাথমিক হিসেবে কিছু স্বাধীন মন্তব্য গ্রহণ করতে পারবে ও পর্যবেক্ষণ থেকে কিছু তথ্য আহরণ করতে পারবে—সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও গানের মধ্য দিয়ে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরিজ্ঞান আহরণ করতে পারবে—কিছু কিছু স্বাধীন চিন্তাশক্তিওকর্মমূলক বিষয়ে তারা তাদের নিজেদের আত্মপ্রকাশ করতে শিখবে—অন্তত একটি শিল্প বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান ও অন্য আর একটি সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা গ্রহণ করবে—নাগরিকত্ব বোধ সম্পর্কে কিছু সক্রিয় ভাবে কাজ করবে—আর এ জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী, নির্দেশ ও পরামর্শ যা তার বিষয়াবলীর মধ্যে pre-· vocational আকারে তা ঐচ্ছিক নীতিতে গ্রহণের সুযোগ এনে দেবে।

(খ) পরবর্তী পর্যায়ে নাগরিক হিসেবে সকলের জন্য কতকগুলি 'core' বিষয়াবলী ও কিছু বৃত্তিগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার যা পরবর্তী জীবনে কাজে লাগবে। এই পর্যায়ের শিক্ষা হবে বহুমুখী ধরদের।

আমরা উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি যে, শিক্ষা প্রধানত তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে —

(ক) শিক্ষক

(খ) বিষয়বস্তু

(গ) শিশু

এতদিন পর্যন্ত এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে শিশুকে কোনঠাসা ক'রে রাখা হোতো ঠিক রবীন্দ্রনাথের "তোতাপাখির" মতো সোনার খাঁচা বানিয়ে তার স্বাধীনতটুকুকে খর্ব করে। কিন্তু নতুন শিক্ষায় শিশু, শিক্ষক এবং বিষয়বস্তু —এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়কেই বড়ো করে দেখা হয়।

শিশুশিক্ষা ও তার উপাদান সম্পর্কে আধুনিক ধারণার পরিচয় আমরা পেয়েছি। এই ধারণাকে প্রারম্ভিক ম'নে করে নিয়ে শিক্ষক শিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যা জটিল। শিক্ষককে কতকগুলি আদর্শ গুণাবলীর অধিকারী হ'তে হবে সুনিশ্চিত ভাবে। সেই আদর্শগুলি থাকলে তবেই তো শিক্ষক সত্যিকার শিক্ষকতার যোগ্য ব'লে গণ্য হবেন।

শিক্ষকের আদর্শ সম্পর্কে এক ইংরাজ কবির বাণী আমাদের পথনির্দেশ করতে পারে—

"How shall we teach
A child to reach
Beyond himself and touch
The stars,
We, who have stooped so much?
How shall we tell
A child to dwell
With honour, live and die
For Truth,
We, who have lived a life?
How shall we say
To him, "The way
Of Life is through the gate
Of Love".
We, who have learnt to hate?
How, shall we dare
To teach him prayer
And turn him toward the way
Of faith,
We, who no longer pray!"

শিক্ষকদের আমরা প্রায়ই ব'লে থাকি সমাজ প্রগতির আলোকবর্তিকাবাহক হিসেবে। সত্যিই তাঁরা সমাজের নেতা, কেননা তাঁদের উপর নির্ভর করছে উপযুক্ত ব্যক্তি ও জাতিগঠন দুই-ই। কিন্তু, যতক্ষণ না শিক্ষক-সম্প্রদায় তাঁদের পেশাগত গুণ হিসেবে সততা ও দরদ এ'দুটো জিনিস অনুধাবন করছেন ততক্ষণ তাঁদের শিক্ষালাভ সম্পূর্ণ হবে না। অবশ্য যাঁরা জন্মগতভাবে শিক্ষাগত পেশায় নিযুক্ত হতে চেয়েছেন, তাঁদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তবে একথা আমাদের ব্যঙ্গ করেই বলতে হয় যে, এই দুটো গুণ শিক্ষকদের দু এক বৎসর শিক্ষণ বিদ্যালয়ে যোগ দিয়েই তা আয়ত্ত করতে হবে!

বাস্তব দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই কথা বলতে হয় যে, যদি আমাদের শিক্ষকদের বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি করতে হয় এবং সমগ্র দেশব্যাপী সুশিক্ষিত শিক্ষক-সম্প্রদায় পেতে হয় তবে আমাদের সাক্ষাৎ কাজ হবে জাতীয় পর্যায়ে বিশ্বযুদ্ধকালীন ইংরেজদের মতন জরুরী শিক্ষক-

শিক্ষণ পরিকল্পনা নিয়ে সমগ্র শিক্ষক-সম্প্রদায়কে শিক্ষাদান ও শিক্ষা-সমস্যার মূলতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান প্রদানের ব্যবস্থা করা।

শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে বহুপূর্বে পেষ্টালজী যা বলেছিলেন আধুনিক যুগেও আমাদের সে কথা মনে রাখতে হবে। ভারত সরকারের শ্রী কে. জি. সেদাঈন বি. এড্ পাঠ্যসূচী পরিবর্তন কমিটির সম্মুখে প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই কথা বিশেষভাবে তিনি উল্লেখ করেছিলেন। Profession অবহেলা ক'রে শিক্ষক কিছুতেই টিকতে পারেন না। সেইজন্য World organization of the Teaching Pr ofession বারবার সমগ্র শিক্ষার স্বার্থে শিক্ষকদের সুযোগ্যভাবে সুশিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য বলেছেন।

ফিল্ড্লে বলেছিলেন যে, শিক্ষক হলেন 'Ever learner'। অতএব তিনি যদি সমকালীন প্রবণতার সঙ্গে পরিচিত না হন তবে তিনি শিক্ষা দেবেন কি করে? সমকালীন জ্ঞানের প্রবাহ সম্পর্কে তাঁকে পরিচিত হতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষা-পরিকল্পনা হো'লো বয়স্ক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের জন্য যাঁরা তাঁদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন শিশু শিক্ষার কল্যাণে এবং যাঁরা মানুষের সগোত্র ও বিশ্বের শিক্ষাগুরু। শিক্ষক-শিক্ষণ কর্মসূচীর এই যদি বিস্তৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই পরিকল্পনাকে জয়যুক্ত করতে হ'লে কতকগুলি প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে। সেই শর্তগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ—

শুধুমাত্র শিক্ষকদের শিক্ষাদান করলে কিছু ফল হবে না যদি আমরা স্থায়ী সমাজে তাঁদের নিরাপত্তা ও সংস্কৃতিচর্চার অত্যাবশ্যক শর্ত পূরণের জন্য সুখী ও পরিতৃপ্ত শিক্ষক শ্রেণী তৈরি করতে না পারি।

(২) বিদ্যালয়ের অবস্থা বিশেষ ক'রে তার পাঠাগার, ল্যাবরেটারী, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি এমন করতে হবে যাতে ক'রে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ যথাযথভাবে সম্ভব হয়।

(৩) শিক্ষকবৃত্তিতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করতে হবে। বৃত্তিতে প্রবেশের সময় উপাধিকেই বিবেচনা করতে হবে। তারপর স্বল্পকালীন শিক্ষণের ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষাভাবধারা আদান প্রদানের ব্যবস্থা করলে ফল ভালো হবে। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ব্যবস্থাপনা চালু আছে।

(৪) শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় গুণ হিসেবে সততা ও দরদ এই দুটো নৈতিক গুণ থাকা দরকার। এই সমস্ত গুণাবলীর বিকাশ সাধনের জন্য যে সামাজিক অবস্থা দরকার সেই ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনা বললে সত্যিকার কী বোঝায়? এর অর্থ শিক্ষকদের আত্ম-শিক্ষণ। আর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলি এই আত্ম-শিক্ষণের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে। তবে, এই আত্ম-শিক্ষণের সময় খুব সংক্ষিপ্ত হওয়া ভালো। একটা বাঁধাধরা ধরনের শিক্ষাদান প্রণালী তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য উপযুক্ত উৎসাহ সৃষ্টি করতে হবে। কেবলমাত্র গবেষণা, পরীক্ষামূলক বিষয়, শিক্ষানীতি ও শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় তাঁদের শিক্ষা দিতে হবে এবং সব সময় ভেবে দেখতে হবে যে, সেগুলি শিক্ষকদের রুচি-অভিরুচি ও আদর্শের উপযোগী হয়েছে কি না। শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনার অপরিহার্য অংশ হবে প্র্যাকটি্স টিচিং, পরীক্ষামূলক পাঠদান (Demonstration lessons), সমালোচনা, আলোচনা সভা প্রভৃতি। কোন ক্ষেত্রেই শিক্ষাদানের খুঁটি-নাটির উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়া সমীচীন নয়। অনেকে একথা যথার্থই বলে থাকেন যে, অবাস্তব ও অপদার্থ শিক্ষণ আয়ত্ত করার চেয়ে কোনো শিক্ষণই দরকার নেই। কেননা, অবাস্তব শিক্ষণ শিক্ষকদের মানসিক ও নৈতিক শক্তি সম্পদকে নষ্ট ক'রে দেয়। শিক্ষক-শিক্ষণের পর শিক্ষক যখন বাইরে আসবেন তখন শতকরা ৯৫ ভাগ শিক্ষণহীন শিক্ষকরা তাঁদের নতুন শিক্ষা চিন্তাকে কাজে লাগানোর পক্ষে এক সংকটজনক অবস্থা সৃষ্টি করে তোলেন। ফলে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের রঙীন আশা নির্মূল হ'য়ে যায়। এখন, সেইজন্য কি ধরনের শিক্ষণ-পরিকল্পনা তাঁদের পক্ষে উপযুক্ত হবে তা নির্ণয় করা একটা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠ্বে।

ভারতবর্ষে শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যা বহুবিধ প্রকারের। প্রথমত, শিক্ষা মনস্তত্ত্বের আধুনিক বিকাশকে আমাদের বেশি ক'রে গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষককে শুধু মাত্র তথ্য হজমকারী ক'রে না তুলে তাঁকে জাতি ও ছাত্রদের সংগঠক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত, এটা স্বীকার ক'রে নিতে হবে শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনা এইজন্যে প্রয়োজন যে, শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব শিক্ষকদের জানা উচিত। চতুর্থত, এটাও বিচার ক'রে দেখতে হবে যে, শিক্ষণ পরিকল্পনার জন্যে ভারতে শিক্ষার মানগত কোনো সত্যিকার মূল্য পরিবর্তিত হচ্ছে কি না।

শিক্ষক শিক্ষণ পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলি এবার আমাদের বিচার ক'রে দেখতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

আমাদের বর্তমান শিক্ষণ পরিকল্পনায় খুব বেশি টুকিটাকীর উপর জোর বেশি দেওয়া হয়। বিশেষ-ধরনের শিক্ষাদান নীতি অপেক্ষা খুঁটিনাটিসর্বস্ব ক'রে শিক্ষাদান নীতি শেখানো হয়। ফলে বিচিত্র ধরনের শিক্ষাদান প্রণালী উৎসাহিত করা হয় না। শিক্ষকের মধ্যে যে শিল্পী লুক্কায়িত রয়েছেন তাঁকে অবহেলা করা বর্তমান শিক্ষণ পরিকল্পনার একটা মস্ত দোষ। শিক্ষকদের শুধুমাত্র যান্ত্রিক নীতিতে না ভেবে তাঁদের প্রগতির আলোকবর্তিকাধারী ব'লে গ্রহণ করতে হবে। পাশ্চাত্যে যে সমস্ত শিক্ষা নীতি ও প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়, তাকে ভারতীয় অবস্থানুযায়ী খাপ খাইয়ে নিয়ে নতুন পথ আবিষ্কার ক'রে তুলতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনায় পরীক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ, নৈর্ব্যক্তিক ও উন্নতি পরিমাপসূচক অভীক্ষাকে (Objective and Attainment Tests) রচনামূলক পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চালু করতে হবে। তাছাড়া, আমাদের দরকার হবে উপযুক্তভাবে জ্ঞান সমৃদ্ধ ও পরিতৃপ্ত শিক্ষক সম্প্রদায় তৈরি করা। শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকরা যেন ব্যর্থহীন সংখ্যা-লঘিষ্ঠরূপে প্রতিভাত না হন। বিদ্যালয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের একটা শ্রেণী গড়ে তুলতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষণ পরিকল্পনার সুযোগ-গুলিকে আরো প্রসারিত করতে হবে যাতে শিক্ষকরা আকৃষ্ট হতে পারেন। শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র শিক্ষাবিদ্‌দের একটা সুসম্মত সেমিনারের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক সামাজিক শিক্ষা ও প্রচার করতে হবে।

শিক্ষক ও শিক্ষাদানের নীতি নির্ধারণের ভার বিশেষজ্ঞদের উপর অর্পণ করতে হবে। শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আসনসংখ্যা ও শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষাব্যবস্থা, অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্য ঘনীভূত বি. টি. কোর্স, ডিগ্রীপর্যায়ে শিক্ষাতত্ত্বকে একটি বিষয় হিসেবে শিক্ষাদান প্রভৃতি পরিকল্পনা গ্রহণ ক'রে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাকে এমন প্রসারিত ক'রে তুলতে হবে যেখানে শুধু খোলসের উপর জোর থাকবে না, আভ্যন্তরীণ শক্তির উপরই জোর থাকবে।

দশ বৎসরের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের নীতিগতভাবে বিষয় পরীক্ষা থেকে বাদ দিতে হবে। দশ বৎসরের অভিজ্ঞতার নিম্নে যে সমস্ত শিক্ষক থাকবেন তাঁদের জন্যে প্রতি জেলায় ভ্রাম্যমান শিক্ষণ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত ক'রে শিক্ষণ শিক্ষার স্বল্পকালীন ব্যবস্থা, রিফ্রেসার কোর্স, অবসরকালীন শিক্ষণ পরিকল্পনা প্রভৃতির ব্যবস্থা

করতে হবে। প্রত্যেক অঞ্চলের শিক্ষণ-বিদ্যালয়গুলির এক্সটেনসান বিভাগ তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন। আমাদের নিকট দুটি সমস্যা বিশেষ ক'রে দেখা দিয়েছে—এক হোলো শিক্ষক-পেশায় নতুন নতুন ব্যক্তিদের আকৃষ্ট ক'রে তোলা, আর শিক্ষণপ্রাপ্ত নন এমন শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা। আর, এজন্য একটা লক্ষ্য নির্দিষ্ট ক'রে ফেলতে হবে। শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের জন্য কতকগুলি পন্থা নির্দেশ করা যায়। আমাদের বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষণ পরিকল্পনা পরিবর্তনের জন্য কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগ একটা কমিটি নিযুক্ত করেছিলেন। এই কমিটি নিম্নলিখিত বিষয়ে জোর দেওয়ার জন্য সুপারিশ করেছেন— (১) শিক্ষানীতি ও বিদ্যালয় সংগঠন, (২) শিক্ষা-মনস্তত্ত্ব ও স্বাস্থ্য-শিক্ষা (৩) দুটির অনধিক বিষয়ে শিক্ষাদান প্রণালী শিক্ষা, (৪) ভারতীয় শিক্ষার আধুনিক সমস্যা। নীতি ও ব্যবহারিক শিক্ষণের উপর সমধিক গুরুত্ব এই কমিটি আরোপ করেছেন। ব্যবহারিক শিক্ষাদান প্রণালীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে পাঠ্যদান পর্যবেক্ষণ, সমালোচনা, বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় পর্যালোচনা, সহ-কর্মবৃত্তির দিকে ঝোঁক, ছাত্রদের follow up কাজ ও বাড়ীর কাজ সংশোধন, case study তৈরি, audo-visual সাহায্য কাজে লাগানো ইত্যাদি। এই কমিটি শিল্প-শিক্ষকের ন্যায় বিশেষজ্ঞ শিক্ষক তৈরিরও সুপারিশ করেছেন। বিদ্যালয়গুলির মান উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে অনেক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। কমিটি ইঞ্জিনিয়ারিং, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের উপাধিধারী শিক্ষকদের নিয়োগের সুপারিশ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য বিশেষ বিষয় যেমন—ভূগোল, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতির বেলায় এই নীতি প্রযুক্ত হবে না কেন এ সম্পর্কে কথা উঠতে পারে। তাছাড়া, কলেজের শিক্ষকরা কোনো শিক্ষণ না নিয়েই যেখানে পড়াতে পারেন তখন উচ্চ উপাধিধারী বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ শিক্ষকগণ বিনা শিক্ষণে কেন পড়াতে পারবেন না এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। সেইজন্য আমাদের বিবেচনায় শিক্ষাদান, তা যে স্তরের হোক, পেশায় যাঁরা আসবেন তাঁদের সকলের জন্য স্বল্পকালীন শিক্ষানীতি ও শিক্ষামনস্তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা ক'রে জেলায় জেলায় আঞ্চলিক ভ্রাম্যমান বিশেষজ্ঞদের দিয়ে শিক্ষাসম্মেলন, শিক্ষাসভা প্রভৃতির ব্যবস্থা করলে ভালো হয়।

একথা আজকের দিনে ভেবে দেখতে হবে সারা শিক্ষকসমাজেরই দৃষ্টিভঙ্গির একটা আমূল পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক ও বহুবিস্তৃত শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা প্রয়োজন। আজকের দিনে শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যা শুধুমাত্র মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষকদের বেলায় প্রযুক্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। সমগ্র দেশজোড়া সুশিক্ষিত শিক্ষক শ্রেণী ও সমপর্যায় ক্রমিক শিক্ষকদের যোগ্যতামানের এক ভিত্তি-প্রাকার গড়ে তুলতে হবে।

Questions :

1. Discuss the role of a teacher in modern education.
2. 'No bad man can be a good teacher'—Discuss.
3. Discuss the problems of Teachers' training in Primary and Secondary Education of our country.

References .

1. রবীন্দ্রনাথ—শিক্ষা।
2. Nunn—Education—its Data and First Principles.
3. K. K. Mookerjee—New Education and its Aspects.
4. The Secondary Education Commission.

নবম পরিচ্ছেদ

শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা

(Control and Administration of Education)

প্রাথমিক শিক্ষার অর্থনৈতিক দায়িত্ব ও পরিচালনা

(Financial Responsibility and Administration of Primary Education)

ভারতের শিক্ষা কমিশন, ১৮৮৪ (Indian Education Commission) সর্বপ্রথম প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ হোক। এই কমিশন আরো প্রস্তাব করেছিলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মিউনিসিপ্যাল ফাণ্ড ও গ্রাম্য ফাণ্ড আলাদা আলাদা হোক। এতদিন পর্যন্ত গ্রাম্য ফাণ্ডের অর্থে মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় বহন করা হোতো। কমিশন সুস্পষ্টভাবে এ দুটি ফাণ্ডের পৃথক নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করেছিলেন। স্থানীয় অর্থসংগ্রহের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে হবে ব'লে কমিশন দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করেছিলেন। কমিশন আরো বলেছিলেন যে, সরকার এই স্থানীয় ফাণ্ডে অর্থ সাহায্য ক'রে তা পরিপুষ্ট করে তুলবেন। অবশ্য প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে এজন্য অত্যধিক ব্যয়ভার বহনের দাবীর ব্যাপারে কমিশন কোনো সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করতে পারেননি—তার কারণ বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থা এক ধরনের ছিল না। বোম্বাই-এ প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের এক বিপুল অংশ সেসের (cess) মারফত আদায় করা হোতো। কিন্তু বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকার কোনো কর (cess) নির্ধারণ করেননি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বাধ্যতামূলক ভাবে এই সেস আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে। কমিশন এ সম্পর্কে যে কথা বলেছিলেন তা হোলো—

"The main responsibility for the spread of primary education rests upon the local funds and the Provincial Government plays only a subordinate role by giving suitable grant-in-aid to local funds, even when raised by legislative sanction, are really equivalant to funds raised by the people themselves and are

therefore entitled to claim a grant-in-aid from Government. The levy of the local funds does not diminish, but rather increases the obligation of the state to help those who are least able to help themselves and yet come forward to supply local resources for their education. The ideal to be kept in view by the Provincial Governments in aiding local funds is that Government grant to local funds should be at the rate of half the local assets or one third of the total expenditure."

১৮৮২ সালে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়েছিল প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে ১৬·৭৭ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় ফাণ্ড থেকে ২৪·৮৮ লক্ষ টাকা। কমিশনের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের খরচ ১৭ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১১২ লক্ষ টাকা এবং স্থানীয় ফাণ্ডের খরচ ২২৪ লক্ষ টাকা হওয়া উচিত। অবশ্যই কমিশনের এই সুচিন্তিত প্রস্তাব কার্যকরী করবার জন্য উপায় নির্ধারিত হওয়া উচিত ছিল। তবে এজন্য তেমন কোনো আগ্রহ লক্ষিত হয়নি—কমিশন এ ব্যাপারে "greater efforts are generally demanded" ব'লে দিয়ে খালাস হয়েছিলেন।

কার্জনের সময় সাহায্য (grant-in-aid) যে ভাবে দেওয়া হোতো তার ভিত্তি ছিল নিম্নরূপ—

(১) শিক্ষকের সংখ্যা
(২) শিক্ষকের যোগ্যতা
(৩) ছাত্রসংখ্যা
(৪) ছাত্র উপস্থিতি সংখ্যা
(৫) ছাত্র উপস্থিতির নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ
(৬) বিষয়াবলী পঠন-পাঠন
(৭) পরিদর্শনের মারফত শিক্ষাদান যোগ্যতা পরিমাপ
(৮) উচ্চশ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষাদান যোগ্যতা নির্ণয়
(৯) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ও যন্ত্রপাতি
(১০) বিদ্যালয়ের সাধারণ চাহিদা ও যোগ্যতা
(১১) বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি
(১২) থোক সাহায্য পায় যে কেন্দ্রীয় পরিচালক সমিতি তার যোগ্যতা

প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য এই সমস্ত শর্ত খুবই সহায়ক ছিল সন্দেহ

নেই। কিন্তু যে পরিমাণ আর্থিক সাহায্য করা হোতো তা পর্যাপ্ত ছিল না। ১৯০২-৭ সালের কুইনকোয়েনিয়াল রিভিউতে ভারতের শিক্ষার প্রগতি সম্বন্ধে বলা হয় যে, সরকারী সাহায্যদানের দ্বারা উদ্দীপনা সৃষ্টিই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে বিবেচিত হয় এবং "the charge to a greater stability in the rates of grant had been generally beneficial" বলে বিবেচিত হয়। লর্ড কার্জন প্রাথমিক শিক্ষার আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রভূত উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের মূল লক্ষ্য গিয়ে দাঁড়ায় প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধন করার ব্যাপারে। ফলে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি গৃহীত হতে পারেনি। ১৯১১-১২ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৪৫,২৯০০০ টাকা সাহায্য করেন এবং স্থানীয় বোর্ড ৬৪,০০৩ টাকা ও মিউনিসিপ্যালিটি ১৬,৯০৪ টাকা ব্যয় করতে এগিয়ে আসেন। এই থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, সরকার যদি আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে রাজী হতেন, তবে সরকারকে অধিকমাত্রায় ব্যয় করতে হোতো। ১৯৩০ সালের স্কুলবোর্ড আইন চালু হোলে পর বোর্ডের হাতে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের অধিকার দেওয়া হয়। বোর্ড যাতে শিক্ষাকর ও সরকারী সাহায্য নিয়ে এই কর্মসূচী কার্যে পরিণত করতে পারেন তজ্জন্য জেলা স্কুলবোর্ডগুলিকে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

স্বাধীন ভারতের সংবিধানে প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক ক'রে তোলার যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা কার্যকরী করবার জন্য অর্থনৈতিক দায়িত্ব মুখ্যত কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। এ বিষয়ে রাজ্যসরকার স্থানীয় সংস্থা মারফত সেস্ ও অন্যান্য বাজার থেকে আয় সংগ্রহ ক'রে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু, ভারতের মতন বিরাট দেশে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে মুখ্যত এ বিষয়ে সরাসরি দায়িত্ব বহন করতে হবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাহায্য দান নীতি
(Grant-in-aid policy in Secondary Schools)

উডের ডেস্প্যাচে (Wood's Despatch) বলা হয়েছিল যে, ব্যক্তিগত উদ্যমকে উৎসাহিত করবার জন্য যথোপযুক্তভাবে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এজন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে বলা হয় নিজস্ব

সাহায্য দান নীতি তৈরি করতে। সেই সব বিদ্যালয়ে সাহায্য দান করা উচিত ব'লে বিবেচিত হয় যেগুলিতে—

(ক) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা সুচারুভাবে দেওয়া হয়—ধর্মীয় যে-কোন প্রকার শিক্ষা দেওয়া হ'লে তা মোটামুটি গুরুত্ব দেওয়া হবে না।

(খ) স্থানীয় পরিচালনার ব্যবস্থা অতি সুন্দর।

(গ) সরকারী কর্মচারী পরিদর্শন করতে পারেন এবং যেখানে সরকার-নির্ধারিত নিয়মকানুন অনুসরণ করা হয় যোগ্যতার সঙ্গে

(ঘ) শিক্ষার্থীর উপর ফি ধার্য করা যায়।

প্রাদেশিক সরকারগুলিকে বলা হয় যে, তাঁরা সাহায্যদানের যে নীতি অনুসরণ করবেন তা যেন ইংলণ্ডের মতো বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। এই উদ্দেশ্য-তালিকায় শিক্ষকদের মাহিনা বৃদ্ধি, স্কলারসিপ প্রদান, বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমন এক সংগঠিত সাহায্য প্রদান নীতি গ্রহণের কথা বলা হয় যাতে ক'রে সেই সাহায্য গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ ক'রে উচ্চশিক্ষার স্তর পর্যন্ত সর্বত্র প্রযুক্ত হয়। এই ডেস্‌প্যাচে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, "We look forward to the time when any general system of education entirely provided by Government may be discontinued, with the gradual advance of the system of grant-in-aid and when many of the existing Government institution especially those of the higher order, may be safely closed, or transferred to the management of local bodies under the control of, and aided by, the state." এই নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দেখা গেল যে, মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য আরো অধিক উৎসাহের সঙ্গে কাজকর্ম শুরু হোলো। উডের ডেস্‌পাচের সময় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বলতে শুধু বোঝাতো মিশনারী বিদ্যালয়-গুলিকে। এই সব বিদ্যালয়ে কি ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তার উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে পরিদর্শকদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে খুব বেশি প্রাধান্য দেবেন না তাঁদের রিপোর্টে।

১৮৮২ সালের ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (Indian Education Commission) যে নীতি অনুসরণ করেন তার পূর্বে দেখা গেল যে, সরকারী ও মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্যের পরিমাণ বেশি ছিল কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যমের দিকে খুব বেশি নজর দেওয়া হোতো না। সরকারী সাহায্য যেটুকু

দেওয়া হোতো তার বেশির ভাগ অংশ সরকারী ও মিশনারী বিদ্যালয় পেতো'। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন এই মর্মে সুপারিশ করলেন যে, ব্যক্তিগত উদ্যমকে যদি শিক্ষাপ্রণালীর সাধারণ অঙ্গ হিসেবে গণ্য না করা হয় তাহলে শিক্ষার কোনো পরিকল্পনা সার্থক হোতে পারবে না। সরকারী বিদ্যালয়কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় ব'লে সেই কারণে প্রাইভেট বিদ্যালয়কে সাহায্য দেওয়া হবে না এ যুক্তি কমিশন স্বীকার করলেন না। কমিশন সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করলেন যে, প্রাদেশিক সরকারদের উচিত হবে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালকদের মধ্যে আলোচনা ক'রে সাহায্যদানের নীতিকে সংশোধিত ক'রে তোলা। কমিশন আরো বললেন যে, সরকারী সাহায্যদান নির্ভর করবে মুখ্যত কয়েকটি নীতির উপর—সেই সব এলাকায় সাহায্য বেশি দিতে হবে যেসব এলাকা অনগ্রসর এবং বিশেষ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন যেসব এলাকায় স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেজন্য প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারকে শিক্ষার বরাদ্দের মধ্যে সাহায্য প্রদত্ত বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতে হবে। সাহায্যদান নীতির মধ্যে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ ধরনের বিষয় পাঠ্যদানের জন্য যেন অর্থ বরাদ্দ করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে বিষয় নির্বাচন ও ভাষার বাহন ব্যবহারে স্বাধীনতা দানের নীতি বহন করতে হবে ব'লে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেন।

১৮৬১ সালে ইংলণ্ডে পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি ক'রে অর্থ সাহায্যদানের নীতি গৃহীত হয়েছিল।' ভারতে ১৮৬৫ সালে তা অনুকরণ করা হয়। ১৮৮১-৮২ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সরকারী সাহায্যদানের নীতি অনুসরণ করা হয়। মাদ্রাজে মাহিনা সাহায্যদান নীতি (salary grant system) চালু হয়। মধ্য ও উত্তর ভারতে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে, পাঞ্জাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের ভিত্তিতে সাহায্যদানের নীতি গৃহীত হয়। যতক্ষণ পরিচালকবৃন্দ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দিক দিয়ে সততার মধ্যে কাজ করবেন ততক্ষণ সাহায্য প্রদান করা হবে। পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি ক'রে সাহায্যদানের নীতি ভারতীয় শিক্ষা কমিশন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পরিষ্কার ভাবে বর্জন করেন এবং সাধারণভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা অনুসরণের সুপারিশ করেছিলেন। তবে এই নীতি লর্ড কার্জনের আমলে একেবারে পরিত্যাগ করা হয়। লর্ড কার্জন এই নীতি গ্রহণ করেন যে, সরকার অবশ্যই সাহায্য-

প্রাপ্ত ও সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়কে নিয়ন্ত্রণ করবেন। বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব নির্ভর করবে নিম্নলিখিত কয়েকটি নীতির উপর :—

(ক) আর্থিক স্থায়িত্ব
(খ) সুসংগঠিত পরিচালক সভা
(গ) উচ্চাঙ্গের শিক্ষাদান ব্যবস্থা
(ঘ) স্বাস্থ্য, বিশ্রাম ও শৃঙ্খলার উপযুক্ত ব্যবস্থা
(ঙ) যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা
(চ) অনুমোদিত বিদ্যালয়ের মর্যাদা পাওয়ার উপযোগী অন্যান্য শর্তাবলী।

লর্ড কার্জন চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার ও গুণগত উৎকর্ষসাধন। তিনি শিক্ষার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব সর্বাধিক হওয়া উচিত মনে করেছিলেন এবং এজন্য তিনি ভারত সরকারের অধীনে শিক্ষাবিভাগ গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন। ১৯১৯ সালে শিক্ষাবিভাগকে ভারতীয়দের হস্তে অর্পণ করা হয় এবং এর ফলে শিক্ষার ব্যাপারটি আংশিক সর্ব ভারতীয়, আংশিক সংরক্ষিত, আংশিক শর্তাধীনে ভার অর্পিত, আংশিক শর্তাধীন ব্যতীত ভার অর্পিত হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারতীয় আইনে শিক্ষার কাজকে ফেডারেল ও প্রাদেশিক পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। ১৯৪৪ সালের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের রিপোর্টে বলা হয় যে, প্রাদেশিক সরকার মুখ্যত শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করবে অবশ্য উচ্চশিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার ব্যাপারটি বাদ দিয়ে। জাতীয় শিক্ষার প্রসারের জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারকে আর্থিক ও অন্যান্য ব্যাপারে আরো অধিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হবে ব'লে এই রিপোর্ট মন্তব্য করেন। শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর দিক দিয়ে প্রাদেশিক সরকারকে সংশোধন করবার নীতি গ্রহণের অধিকার দিতে বলা হয়। প্রাদেশিক সরকারকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন পরিচালিত অসংলগ্ন শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণের ভার নিতে বলা হয়। অবশ্য যেখানে ভালভাবে কাজ হচ্ছে সেখানে এই দায়িত্ব না নিলেও চলবে। স্থানীয়ভাবে শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ জাগিয়ে তোলার জন্য স্থানীয় বিদ্যালয় পরিচালক সমিতি, জেলা স্কুল বোর্ড, জেলা শিক্ষা কমিটি প্রভৃতি পুনর্গঠিত ক'রে তোলার কথাও রিপোর্টে বলা হয়। কেন্দ্রে শিক্ষাবিভাগ এবং সমগ্র প্রদেশে শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদ গঠনের কথা এই রিপোর্ট উল্লেখ করেছেন। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চালু হওয়ার পর

মাধ্যমিক শিক্ষা মুখ্যত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মাধীনে ছিল এবং এদিক দিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে কলেজীয় শিক্ষার দৃষ্টিতে বিচার করা হোতো। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পর্ষদের রিপোর্টে বলা হয় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় নিছক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ নয়, এই স্তরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তুলতে হবে। এই রিপোর্টে দৃঢ়ভাবে মন্তব্য করা হয়—

"The High School is in one sense the backbone of a national educationel system for it is to the High School that the country must look for the preparatory training of its leaders and experts in all walks of life."

রাধাকৃষ্ণণ কমিশনও সুস্পষ্টভাবে মন্তব্য করেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় শুধুমাত্র "anteroom to the University" হবে না—তা হবে "complete in itslf" বা স্বয়ংসম্পূর্ণ। কমিশন একথাও বলেছিলেন—"Our pronvincial Governments are naturally keen on basic education but unfortunately they do not seem to be equally keen on Secondary education which is the real weak spot in our entire educational machinery."

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষাব পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনৈতিক সাহায্যদানেব নীতি সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ কবেছেন যা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র একক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে, যে-সংস্থা বিদ্যালয়ের অনুমোদন, আর্থিক সাহায্য দান, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ ইত্যাদি কাজ করবার ভার গ্রহণ করবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের বিবেচনায় 'ডিরেক্টার অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' হবেন এমন একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যিনি মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ে গঠিত সংস্থার সভাপতি হবেন। কেন্দ্রে ও প্রদেশে এমন এক কমিটি গ'ড়ে তোলা দরকার যে কমিটি সর্বস্তরেব শিক্ষা নিয়ে আলাপ আলোচনা ক'রে সর্ববিষয়ে এক সংস্থা গড়ে তুলবেন। একটি সমবায় কমিটি (Co-ordinating Committee) গড়ে তুলতে হবে যা শিক্ষার প্রসার ও উন্নতি নিয়ে বিবেচনা করবেন। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটি বোর্ড গঠিত হওয়া উচিত অন্তত ২৫ জন সভ্য নিয়ে এবং এই সংস্থার সভাপতি হবেন ডি. পি. আই। এই সংস্থা মাধ্যমিক শিক্ষার নীতি ও কর্মসূচী নির্ধারণ করবেন। কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ সর্বভারতীয় সমস্যা বিবেচনার জন্য সর্বপ্রকার শিক্ষার

মাধ্যমকে সমবায় করে তুলবেন এবং এই ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যেও উপদেষ্টা পরিষদ গ'ড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি প্যানেল গড়ে তুলতে হবে। বিদ্যালয়ের মঞ্জুরীদানের শর্ত সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করে দিতে হবে। স্থানীয় পরিচালক সমিতি রেজেষ্ট্রীকৃত করতে হবে এবং এই সমিতি বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ করবেন না। বহুমুখী বিদ্যালয় সংগঠনের জন্য পুরাতন ও নূতন বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য ও উদ্দীপনা যোগাতে হবে।

সংবিধানে মাধ্যমিক শিক্ষাকে রাজ্যসরকারের দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের যুক্ত সাহায্য দানের নীতি অনুসরণ করতে হবে। কমিশন বলেছেন—"In all matters connected with the improvement of secondary education, there should fullest co-operation between the States and the Centre both in regard to the lines on which education should develop as well as the manner in which the recommendations should be implemented."

বর্তমানে যে যে সূত্র থেকে শিক্ষার জন্য অর্থ সংগৃহীত হয় তা হোলো—

(১) রাজ্য সরকারের সাহায্য

(২) মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য স্থানীয় সংস্থা কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে বা শিক্ষাকরের দ্বারা সংগৃহীত অর্থ

(৩) প্রাইভেট সংস্থা কর্তৃক সাহায্যদান

(৪) বিদ্যালয়ের মাহিনা

রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্নভাবে অর্থ সাহায্য করে থাকেন। প্রাইভেট সংস্থা পরিচালিত বিদ্যায়তনে সরকারী সাহায্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়—

(১) শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ভাতা

(২) চিকিৎসা ব্যাপারে চিকিৎসকদের অর্থ সাহায্য

(৩) অনাথ আশ্রমের জন্য সাহায্য

(৪) বিদ্যালয় গৃহ ও বোর্ডিং-এর জন্য গৃহ নির্মাণে অর্থ সাহায্য

(৫) আসবাব, সাজ-সরঞ্জাম, পাঠাগার প্রভৃতির জন্য সাহায্য

(৬) বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণের জন্য জমি সংগ্রহ, বোর্ডিং ও খেলাধূলার মাঠের জন্য জমিসংগ্রহের জন্য অর্থ সাহায্য

(৭) শিল্পশিক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য

(৮) পরিচালনার জন্য অর্থ সাহায্য

কিন্তু এই সব উদ্দেশ্যে অর্থব্যয় সকল সরকার করেন না ব'লে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন সাহায্যদান-নীতিতে সংশোধন চেয়েছেন এই সব উদ্দেশ্যগুলিকে সার্থক করে তোলার জন্য।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার লাঘবের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পাঠাগারের গ্রন্থ, ওয়ার্কসপ, সরঞ্জাম প্রভৃতির উপর শুল্ককর ধার্য না করার প্রস্তাব করেছেন। কমিশনের মতে মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকতর দায়িত্ব বহন করা উচিত। কেন্দ্রের উচিত হবে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে সাহায্য করা—

(১) বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে বহুমুখী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য,

(২) শিশু ও শিক্ষকদের উপযোগী উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার জন্য,

(৩) শিল্পগত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাদানের উপযুক্ত বিদ্যালয় গ'ড়ে তোলার জন্য,

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠ্যসূচী, বৃত্তিগত নির্দেশ, শারীরিক চর্চা, শিক্ষা-প্রণালী, পাঠ্যপুস্তকপ্রণয়ন, পরীক্ষাপ্রণালীর উদ্ভাবন প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য করার জন্য,

(৫) রিফ্রেসার কোর্স, সেমিনার, সম্মেলন প্রভৃতির ব্যবস্থা করার জন্য,

(৬) শিক্ষাপ্রদ ফিল্ম ও অডো-ভিস্যুয়েল সাহায্যদানের জন্য,

(৭) সুনির্বাচিত পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় গঠনে উৎসাহ দেওয়ার জন্য।

মাধ্যমিক কমিশন শেষে মন্তব্য করেছেন—"We feel that the active Co-operation of the Centre with the States is essential to promote education in the country, to improve its quality and to carry on the necessary research in the different fields of education which may ultimately be incorporated in the educational system."

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান পরিচালনা (Administration of Secondary Education):

শিক্ষাদান ব্যাপারটি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মূল জিনিস। শিক্ষাদানের কলাকৌশলের উন্নতি অপরিহার্য ব্যাপার। এজন্য নানাধরনের শিক্ষাদান

পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। দেখতে হবে শিক্ষাদানের মান উন্নত হচ্ছে কি না। এজন্য শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক স্তর, বুদ্ধিগত ও অন্যান্য যোগ্যতা, ব্যক্তিত্বমণ্ডিত শিক্ষাদান প্রণালী, ল্যাবরেটারী পদ্ধতির প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে খুব সযত্ন প্রচেষ্টা নিতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি যোগ্য শিক্ষকদের সহযোগিতা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করবেন। শিক্ষকের এজন্য চাই প্রকৃষ্ট যোগ্যতা। তাঁর অভিজ্ঞতা, সজীব ব্যক্তিত্ব, সামাজিক বুদ্ধি, বৃত্তিগত স্পৃহা, নেতৃত্ব, উপযোজন শক্তি, দরদ, বাগ্মিতা, হাস্যরস, জীবনবোধ সম্পর্কে গভীর দরদ, শিক্ষাতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ আধুনিক জ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলীর অধিকারী হ'তে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত ক'রে তুলতে হবে। শিক্ষকদের মধ্যে মধ্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যালোচনা সভা করা প্রয়োজন। অন্যান্য বিদ্যালয়ে ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতা আহরণের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষাদানের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। বিদ্যালয়ের গৃহ, আসবাবপত্র প্রভৃতি সকল কিছুর বিন্যাস এমনভাবে করতে হবে যাতে ক'রে বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব নৈতিক মান সৃষ্ট হয়। পরিদর্শনের উদ্দেশ্য যেন শিক্ষাদান প্রণালীর মান উন্নীতকরণে সাহায্যকারী হ'য়ে উঠে। এজন্য কয়েকটি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হবে, যেমন—

(১) যে যে ধরনের কর্মবৃত্তি লক্ষ্য করা হবে সেগুলি সংগঠিত ভাবে কাজে লাগানো

(২) আলাপ আলোচনার মধ্যে যেন স্বাধীনতার সুযোগ থাকে

(৩) শিক্ষকের মনোভাবকে কার্যকরী ক'রে তুলতে হবে

(৪) কাজকর্মের যোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে হবে

(৫) পরিকল্পনার মধ্যে যেন উচ্চাদর্শ মেনে নেওয়া হয়

(৬) বিদ্যালয়ের পরিবেশগত মান বাড়িয়ে তুলতে হবে

(৭) সহ-পাঠ্যসূচী কার্যকরী ও ফলপ্রদ করে তুলতে হবে।

বিদ্যালয় গৃহ ও সাজসরঞ্জাম (School building and equipment):

ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা ক'রে কেহ কেহ "open-air" বিদ্যালয়ের কথা বলেন। তাঁদের বিবেচনায় বড় বড় ইমারত নির্মাণের চেয়ে

মুক্ত প্রাঙ্গনে বিদ্যালয় গ'ড়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতে এই জাতীয় বিদ্যালয় অনেক গ'ড়ে উঠেছে যা যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের জন্য কয়েকটি অত্যাবশ্যক শর্ত পালন প্রয়োজন, যেমন—

(১) বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের স্থান নির্বাচন ও খেলাধূলার মাঠ নির্বাচন.

(২) বিদ্যালয় সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে

(৩) বিদ্যালয় গৃহের আকার কি হবে তা নির্ধারণ করতে হবে

(৪) বিদ্যালয়ের স্থান যে নির্বাচিত হবে তা যেন যোগাযোগ ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয় গ'ড়ে তুলতে হ'লে চাই লোকবসতি অঞ্চল যা সকলের পক্ষে যাতায়াতের সুবিধাযুক্ত হয়। খেলাধূলার মাঠ ও সহ-পাঠ্যসূচী অনুসরণের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রয়োজন। গ্রামাঞ্চলে আবাসিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে তার জন্য উপযুক্ত যত্ন নিতে হবে। সব সময় মনে রাখতে হবে এজাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অর্থ শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিগত, সামাজিক ও শারীরিক কর্মবৃত্তির অনুশীলনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা। শহর অঞ্চলে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের স্থান সংগ্রহে খুব অসুবিধা দেখা দিতে পারে। দেখতে হবে শহর অঞ্চলেব বিদ্যালয় যেন খুব একটা বস্তি অঞ্চলে স্থাপিত না হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষাথাদের যাতায়াতের দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

বিদ্যালয় গৃহ কি ধরনের হবে সেজন্য বর্তমানে অনেকগুলি নীতি চালু আছে, যেমন উপযুক্ত আলো-হাওয়ার ব্যবস্থা চাই, শিক্ষার্থীদেব বসবার উপযুক্ত স্থান সংকুলান হয় ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় শিক্ষাপর্ষদের স্কুল বিল্ডিং কমিটির মতে প্রত্যেক শ্রেণীকক্ষে যেন শিক্ষার্থী পিছু ১০ বর্গফুট স্থান রাখা হয়। একটি শ্রেণীতে ৩০ থেকে ৪০ জন ছাত্রের বেশি যেন গ্রহণ না করা হয় [সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে যাতে অন্তত একটি বা দুটি বহুমুখী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা যেতে পারে সেজন্য উপযুক্ত স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করতে হবে। সম্প্রসারণের উপযুক্ত সুযোগ যেন সর্বদা রাখা হয়। বিদ্যালয়ে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি না ক'রে যাতে ছাত্র-সংখ্যা নির্দিষ্ট আয়ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ করার সময় মনে রাখতে হবে যেন প্রতি বিদ্যালয়ে কমনরুম, স্যানিটারী ব্যবস্থা, মধ্যাহ্ন ভোজের যায়গা, বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত

স্থান থাকে। শিক্ষকদের জন্য বিশ্রামকক্ষ যেন রাখা হয়। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের নিজস্ব পাঠাগার ও রিডিং রুম যেন রাখা হয়। অভিভাবক বা বহিরাগতদের জন্য একটি ভিজিটিং রুম নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। প্রধান শিক্ষক ও সহ-প্রধান শিক্ষকের জন্য আলাদা আলাদা কক্ষ নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারী, ওয়ার্কসপ কক্ষ রাখতে হবে।

বিদ্যালয়ের গৃহ কি ধরনের হবে সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ভারতীয় অবস্থাবিবেচনা ক'রে কেন্দ্রীয় গৃহ নির্মাণ গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ার, শিল্পী ও শিক্ষকদের যুক্ত গবেষণার ব্যবস্থাপনা গ'ড়ে তোলার কথা বলেছেন। বিদ্যালয়ের সাজসরঞ্জাম ও আসবাব পত্র এমন ভাবে নির্বাচিত করতে হবে তা যেন শিক্ষার্থীর বয়স, উচ্চতা প্রভৃতির দিক দিয়ে ভেবে-চিন্তে সংগ্রহ করা হয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের উপকরণ ও সাজসরঞ্জাম যেন প্রয়োজনমত থাকে। ভূগোলের জন্য উপযুক্ত ম্যাপ, চার্ট, রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার জন্য উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম, অডো-ভিস্যুয়েল এড্ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন বিষয়ের জন্য শ্রেণী-কক্ষ সজ্জিতকরণ প্রভৃতি বিষয়ে অত্যন্ত যত্নের সহিত পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বহুমুখী বিদ্যালয়ের উপযোগী সাজসরঞ্জাম নির্ধারণের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব করেছেন।

Question :

1. Discuss the financial control and adminstration of Primary Education in India since the British days.

2. Discuss the Grant-in-aid Policy of the Government in regard to the Secondary Education.

3. How effectively the problems of administration and control of Secondary Education can be solved ?

4. Discuss the guiding principles of school Buildings and educational equipment to be accepted in general in Independent India.

References :

1. The Secondary Education Commission.
2. The University Education Commission.
3. Arther Mayhew—The Education of India.
4. Nurulla & Nayak—History of Education in India.
5. Primary (Rural) Education Act, Bengal, 1930.
6. হরিসাধন গোস্বামী—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন.

দশম পরিচ্ছেদ-

নার্সারী ও শিশুশিক্ষার সমস্যা

(Nursery Education and the problems of Child Education

প্রাথমিক শিক্ষার পূর্বস্তরে অর্থাৎ শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসরে কি ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত এ সম্পর্কে শিক্ষাবিদ্ ও অভিভাবকদের আগ্রহ আজ দিনে দিনে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। অথচ এমন এক দিন ছিল যখন নার্সারী ও শিশুশিক্ষার ব্যাপারটি খুব বেশি তাৎপর্য বহন করতো না। আজ দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই নীতি স্বীকৃতি হয়েছে যে, শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বেই তাদের জীবনের শারীরিক, নৈতিক ও বুদ্ধিগত দিকটির একটি সম্যক বিকাশ সাধন প্রয়োজন। একদিন এই নার্সারী বিদ্যালয় নিছক শ্রমিক অঞ্চলের পিতামাতার দিন রোজগারের পথে সাহায্যকারী একটি রক্ষণাবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গণ্য হোতো। কিন্তু আজ রুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সার্বজনীন সত্য হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে যে, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের প্রাক্কালে তার বুনিয়াদ শক্তভাবে গড়ে তোলার জন্য একটি উপযুক্ত শিক্ষায়তন চাই। একদিন মাত্র শ্রমিক অঞ্চলের পিতামাতার প্রয়োজনে যে বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল আজ সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য তার প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে।

নার্সারী বিদ্যালয়গুলি আজ ধীরে ধীরে আমাদের দেশেও গড়ে উঠ্ছে— এমন কি গ্রামাঞ্চলেও তার উদ্ভব দেখা যাচ্ছে। নার্সারী বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয় না। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা বড়ো জিনিস হোলো পরিবেশ গড়ে তোলা। বিদ্যালয়ের পরিবেশ এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হয় এই পরিকল্পনায়, যাতে করে শিশুরা তাদের দৈনন্দিন জীবনযাপন ও খেলাধূলার মধ্য দিয়ে যে সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করবে তাই তার উত্তর জীবনের ভিত্তিমূল হ'য়ে দেখা দেবে। এই জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে কোনো নির্দিষ্ট গ্রন্থ অধ্যয়নের ব্যবস্থা নেই। কতকগুলি সুনির্বাচিত স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গ'ড়ে তোলাই এই শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য।

পেষ্টালজী বলেছিলেন—"Education is the natural, progressive and harmonious development of all the powers and capacities of the human being—intellectual, physical and moral—which the individual is capable of." নার্সারী বিদ্যালয়ে এই সার্বজনীন বিকাশের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় ক'রে তুলতে সাহায্য করা হয় মাত্র। গোড়ায় গলদ র'য়ে গেলে সারাজীবন তার আর সংশোধন চলে না ব'লে এই স্তরের শিক্ষায় কতকগুলি অভ্যাস গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন হয়।

শিশুর একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে—তার সেই প্রকৃতির নিয়মকে অনুসরণ ক'রেই শিক্ষার ব্যবস্থাপনা গ'ড়ে তুলতে হয়। ফ্রোয়েবেল যে "কিণ্ডারগার্টেন" বিদ্যালয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তাতে শিক্ষার্থীকে তার আপন প্রকৃতির নিয়মে বেড়ে ওঠার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয়। খেলাধূলা ও আনন্দজনক কর্মের মধ্য দিয়েই শিশু গ'ড়ে উঠবে। ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন—"We should not consider play as a frivolous thing. On the contrary, it is a thing of profound significance, By means of play the child expands in joy as the flower expands when it proceeds from the bud, for joy is the soul of all the actions of that age." ফ্রোয়েবেল শিশুর প্রবৃত্তির প্রতি জানিয়েছেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা। শিশুর বিকাশ সাধনের যে নীতি তিনি স্বীকার করেছিলেন সেই ভিত্তিতে "কিণ্ডারগার্টেন" প্রথা গড়ে উঠলেও আধুনিক শিক্ষাবিধানের অনেক নূতন সূত্রের বাস্তব প্রয়োগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সে যুগে ছিল না। আজকাল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিশুশিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক নীতির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তোলার জন্য সংগঠিত প্রয়াস দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে মাদাম মন্তেসরী ফ্রোয়েবেলের চেয়ে আরো এক ধাপ অগ্রসর হ'য়েছিলেন। তিনি ফ্রোয়েবেলের শিক্ষানীতি গ্রহণ করেছিলেন তবে তিনি সেই শিক্ষানীতিকে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে এক বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিভূমি দান করেছিলেন। ফ্রোয়েবেল শিশুশিক্ষার জন্য চেয়েছিলেন এক আদর্শজনক পরিবেশ (ideal environment) এবং এজন্য তিনি বলেছিলেন—"All knowledge and comprehension of life are all connected with making the internal external, the eternal the internal, and with perceiving the harmony and accord of both." মন্তেসরী এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ

করে দেখালেন যে, পরিবেশ এমনভাবে গ'ড়ে তোলা যায় যাতে ক'রে শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত শক্তিকে প্রকাশিত ক'রে তোলা যায় এবং পরিবেশের প্রভাব তার মধ্যে এনে দেওয়া যায়। বাহিরের পরিবেশগত প্রভাব না থাকলে সে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ হয় না। এ সম্বন্ধে ফ্রোয়েবেল বলেছিলেন—"Were man's inner and divine nature not manned by untoward external influences, the ideal education would be passive, non interfering." মন্তেসরী তাঁর পরিকল্পনায় খুঁজে পেয়েছিলেন এমন এক বাস্তব পরিবেশ, যার মধ্য দিয়ে শিশু তার আপন স্বাভাবিক নিয়মে শারীরিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ ক'রে বেড়ে উঠতে পারে। মন্তেসরীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিশুশিক্ষা নিয়ে দেশে-বিদেশে বহু নূতন নূতন চিন্তাধারা গ'ড়ে উঠেছে, যার ফলে আজ এটা সর্বজনগ্রাহ্য ব্যাপার যে, শিশুশিক্ষার ভিত্তিভূমি সংগঠিত না করলে শিশুর ভবিষ্যত জীবন সঠিকভাবে গ'ড়ে উঠতে পারে না।

শিশুশিক্ষার এই প্রথম পর্যায়ে এ বিষয়ে অবহিত হ'তে হবে যে, পরিবেশের মধ্যে যেন কোথাও এমন ফাঁক না থাকে যাতে ক'রে শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ সাধন কোনোক্রমে ব্যাহত হয়ে উঠে। শিশু তার আপন স্বভাবের প্রেরণায় কতকগুলি বাচনধ্বনি করতে আরম্ভ করে। এই বাচনধ্বনি যাতে সত্যিকারের ভাষাসমৃদ্ধ হ'য়ে উঠে এবং শিশু যাতে সুস্থ ও সামাজিক শিশু হিসেবেই আত্ম-প্রকাশ করে সেজন্য কোনো অবাঞ্ছিত সামাজিক প্রভাব যেন তার উপর না গিয়ে পৌছয়। যেখানে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত নয় বা গোলমেলে সেখানে অনেক সময় দেখা যায় যে, শিশুর ভাষার বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে এমনকি সে মূক হয়ে যাচ্ছে। নার্সারী বিদ্যালয়ে যে সামাজিক জীবন শিশু লাভ করে তাতে তার মূক ও বধির হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, বরং সে সকলের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও উদ্দীপনা পায়, তাতে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধন সম্ভব হয় এবং তার ফলে তার ভাষাজ্ঞান ও অন্যান্য আচার আচরণে সামাজিক বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হ'য়ে ওঠে।

নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা খেলাধূলার মধ্য দিয়ে হওয়া চাই। খেলাধূলার এমন উপকরণ সমস্ত তাদের জন্য হাজির করতে হবে তা যেন উদ্দেশ্যপ্রসূত হয়। খেলাধূলা শিশুর একটি আদিম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তিকে যথাযথ পথে পরিচালিত করবার জন্য সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা নিতে হবে। যদি এই শক্তি যথাযথ পথে পরিচালিত না হওয়ার সুযোগ পায়, তবে তার ফলে

শিশুর শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে যাবে বা তা খুব কার্যকরী হবে না। শিশুর মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, শারীরিক ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি, কল্পনা, দৃষ্টিশক্তি প্রভৃতি গুণাবলী যাতে সম্যক্‌ভাবে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে সেজন্য খেলা-ধুলার উপকরণগুলি যেন অবশ্যই মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে শিশুর মানসিক জড়তা কেটে যায়। কোনো অস্বাভাবিক সামাজিক অবস্থায় তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ব্যাহত হ'য়ে থাকলে খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শক্তিবৃত্তির স্ফূরণে তা এক নূতন অভিব্যক্তি লাভ ক'রে থাকে।

শিশুর মানসিক্ শক্তির বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে একটি জিনিস্ সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, যদি কোনক্রমে শিশুর কোনো শক্তি বাল্যাবস্থায় ব্যাহত হয়ে যায় তবে সেই শক্তি আর কোনদিনই প্রকাশিত হতে পারে না। এজন্য বিশেষ সময়ে যে শক্তির উন্মেষ সাধন ঘটে থাকে সেই শক্তির স্ফূরণ যাতে সহজ ও স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিশুর ভাষাজ্ঞান আরম্ভ হয় এই নার্সারী পর্যায়ে। যদি যথাযথ পরিচর্যার অভাবে তার ভাষাজ্ঞানের সম্যক বিকাশ সাধনে কোথাও কোনো বাধা বা জড়তা উপস্থিত হয়, তবে তাকে সংশোধন ক'রে ফেলবার উৎকৃষ্ট সময় হোলো এই শৈশবকাল। শিশুর মানসিক জীবন সম্পর্কে যে কথা সত্য, সেই কথা তার ভাবগত জীবনের সম্বন্ধেও সত্য। শিশুর ভাবপ্রবণতা শৈশবকালে দুর্বার গতিতে দেখা দেয়। এ সময় তার মন থাকে অত্যন্ত কচি কাঁচা। এই ভাবপ্রবণতা আসে নানা-ভাবে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে শিশু সেই ভাবপ্রবণতার চরিতার্থতা চায়। কিন্তু যখন সেই ভাবপ্রবণতার পথে অবিরত বাধা ও বিপত্তি আসে এবং তার সহজ স্বাভাবিক স্ফূরণে কোনো সাহায্য ও সহযোগিতা মেলে না তখন তার পরিণাম হ'য়ে ওঠে ভয়াবহ। এ অবস্থায় যদি যত্নের ক্রটি হয় তবে শিশু সেই অবহেলার জন্য যে কোনো ধরনের বিকৃত মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তার অসংলগ্ন ভাবপ্রবণতার জন্য সে উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী ও দুর্বিনীত হ'তে পারে। শিশুর প্রথম জীবনে আসে কল্পনার অসম্ভব জোয়ার। তার সেই কল্পনাপ্রবণতা চরিতার্থ হ'তে চায় নানা সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে। তাই, এ বয়সের শিক্ষার্থীদের নানা প্রকার খেলাধূলার উপকরণ, রঙ বেরঙের ছবি, নানা ধরনের ছড়া ও খেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা হবে অত্যন্ত যত্নসহকারে।

শিশুর প্রকৃতি বিকাশ সাধনের জন্য প্রয়োজন এমন এক অবস্থার, যাতে

সকল সামাজিক পর্যায়ের শিশুর দেহ-মন-আত্মার বিকাশ সহজ ও সুন্দর হ'য়ে উঠে। আমাদের দেশে ধনীদের গৃহে যে আবহাওয়া তাতে অস্বাভাবিক আদর যত্নে ও গৃহের অভিজাত পরিবেশের মধ্যে শিশুর কতকগুলি বিভ্রান্তিকর আচরণ গড়ে ওঠে যা গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে সমীচীন নয়। আবার অপরপক্ষে বস্তি অঞ্চলে বা গ্রামাঞ্চলে শিশুরা এমন এক অস্বাস্থ্যকর ও অশোভন অবস্থায় লালিত পালিত হয়, যাতে তারা না পায় উপযুক্ত জীবনের আস্বাদ, না পায় জীবনের কোনো এক নূতন দিগ্‌দর্শন। এজন্য গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কি ধনী কি গরীব সকল ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী এমন একটি সাধারণ ক্ষেত্র প্রয়োজন, যেখানে একটি নির্দিষ্ট মান অনুসরণ ক'রে শিক্ষার্থীরা তাদের সজীব মন আত্মার বিকাশ সাধনে উদ্দীপনা আহরণ করতে পারে। শিশুর জীবনের প্রথম পাঁচ বৎসর একটি বিরাট মনস্তাত্ত্বিক সময়। এ সময়ে তাদের মানসিক দিক, চরিত্রগত দিক, আধ্যাত্মিক দিক এমনভাবে গ'ড়ে উঠে যা আর কোনো পর্যায়ে গ'ড়ে ওঠে না। তাই এই সময়টি শিশুর জীবনের এক বিরাট সংগঠন পর্যায়। এমন সুযোগ শিশুর জীবনে আর কখনো আসবে না ব'লে এই সময়টির পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করবার পরামর্শ দিয়েছেন বিখ্যাত শিশু-মনোবিজ্ঞানী গেসেল (Gessel)। অনেকে একথাও বলেন যে, "জাতির সমগ্র শক্তি প্রাইমারী শিক্ষার চাইতে নার্সারী শিক্ষার দিকে নিয়োজিত হ'লে ব্যষ্টি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হবে।" (জে. ডি. ঘোষ—আমাদের শিক্ষা—নার্সারী শিক্ষা)। নার্সারী শিক্ষার কাল সাধারণত তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর ধরা হয়। কিন্তু এই কাল অনেকের মতে আরো বাড়িয়ে দিয়ে সাত বৎসর করা উচিত। নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ী ক'রে প্রাথমিক শিক্ষার আরম্ভ পর্যায় আরো বিলম্বিত করলে ফল ভালো হবে ব'লে কেহ কেহ মনে করেন। ইংলণ্ডের নার্সারী স্কুল এসোসিয়েসনের মতে নার্সারী শিক্ষা সাত বৎসর পর্যন্ত হওয়া উচিত কারণ শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক পর্যায়ের বিকাশ এই স্তর পর্যন্ত উন্নীত হ'লে তবে তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পর্বটি সুষ্ঠু হ'য়ে ওঠে। নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষা দু বৎসর বয়স থেকেই শুরু হোলে ভালো হয়। কেননা, এই বয়স থেকে শিশুর কৌতুকপ্রবণ মন অত্যন্ত সবুজ ও সতেজ হ'য়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিকের মতন পৃথিবীর সকল কিছুকে সে বুঝে নিতে চায় পরখ করে—আর তার অভিজ্ঞতা এইভাবে ক্রমশ অর্জন হয়। শিশুর এই বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে

আমরা দেখতে পাই একদিকে শিশু মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হতে চায় না, অন্যদিকে বাহিরের প্রবল আকর্ষণে সে দুর্বার হয়ে উঠতে চায়। একদিকে স্বাধীনতার অনিবার্য আকর্ষণ, অন্যদিকে স্নেহপ্রবণতার অপূর্ব শৃঙ্খল—এর মধ্য দিয়ে শিশু পেতে চায় তার ভাবীজীবনের সার্থকতা। এরকম পর্যায়ে নার্সারী শিক্ষা আরম্ভ হ'লে শিশু একদিকে যেমন তার সঙ্গীদের সান্নিধ্যে পাবে এক অফুরন্ত ক্রীড়ামোদ, অন্যদিকে পাবে নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর গভীর মাতৃস্নেহ। শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে একটা নূতন সম্পর্ক যেমন সে স্থাপন করে, তেমনি স্থাপন করে তার সঙ্গীদের সঙ্গে এক নিগূঢ় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক স্থাপন এমন একটা আদর্শ পরিবেশে হওয়া উচিত, যাতে দিন কয়েকের মধ্যেই সেই অবস্থার সঙ্গে শিশু নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। একজন শিক্ষয়িত্রীর উপর সকলে মিলে যে মাতৃভাব আরোপ করে, তাতে মাতৃস্নেহ পাওয়ার একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিতে পারে; কিন্তু এ বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী সকলের উপর সমভাবে তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি দিয়ে তাদের মনে পবিত্র সহযোগিতার এক উচ্চ আদর্শের অনুভূতি জাগিয়ে তুলবেন। নার্সারী বিদ্যালয়ে কঠোর কোনো শৃঙ্খলা না চাপিয়ে দিয়ে, শিক্ষয়িত্রী আড়াল থেকে পরিদর্শিকা ও পরিচালিকা হ'য়ে শিক্ষার্থীদের সুপথে চালনা করেন। সীমিত পরিসরের মধ্যে শিক্ষার্থীদের থাকতে হলেও সেখানে তারা নানাপ্রকার আমোদ অনুষ্ঠানের সুযোগ পায় এবং নিজেদিগকে স্বাধীন ও সুখী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত মনে করে আনন্দ পায়। এর ফলে শিক্ষার্থীর নিজস্ব উন্মাদনা আরো সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল রূপ নিতে পারে। নার্সারী বিদ্যালয়ে যে উদ্যান থাকে, তাতে কচিকাঁচা ফুলের মতন শিশুরা খেলার নিয়ে গড়ায়, কাঠের বাক্স সাজিয়ে খেলা করে, পাল্কী বানায়, কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠে আর নামে, রিং ধরে টানাটানি করে, মাটি খুঁড়ে পুকুর তৈয়ারি করে, নানা ধরনের পোশাক পরে উচ্ছল আনন্দে মসগুল হ'য়ে কতকিছু সৃষ্টি করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। শিশুদের এমনভাবে এই সময় ট্রেনিং দেওয়া যায়, যাতে ক'রে তারা খেলাধূলার মধ্য দিয়ে নানাকিছু বাস্তব জিনিস তৈয়ারি করতে পারে, যেমন—কাগজের নৌকা, টুকরো কাগজের বল, মাটির পুতুল প্রভৃতি। দৈনন্দিন জীবনের কতকগুলি অভ্যাসও তারা বেশ সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করতে পারে। যেমন—কেমন করে বিছানা পরিষ্কার রাখতে হয়, একসঙ্গে বসে খেতে হয়, জামার বোতাম সুন্দরভাবে পরিয়ে নিতে হয় ইত্যাদি। নার্সারী

বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মনে সর্বদা এই ভাবটি জাগিয়ে দিতে হয় যে, তারা সকলে একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। আনন্দের উপাদান যত এখানে বেশি হবে, ততই তারা সকলকিছু ভুলে গিয়ে এক অপূর্ব চেতনায় নূতন মানুষ হ'য়ে উঠতে পারবে। শিশুকে সমাজসম্মত ক'রে তোলা নার্সারী বিদ্যালয়ের একটি অবশ্য-কর্তব্য কাজ।

নার্সারী বিদ্যালয় যদিও একটি নির্দিষ্ট পরিসরে গড়ে ওঠে, তথাপি শিক্ষার্থীরা এই স্কুলের বাহিরেও স্বাধীনভাবে মেলামেশা ও আনন্দ অর্জনের একটি ক্ষেত্র পেতে পারে। মধ্যে মধ্যে তাদের নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া যেতে পারে এবং তাদের দিয়ে কোন অনুষ্ঠান প্রভৃতি করা যেতে পারে। বিদ্যালয়ের বাগানে শিশুকে নিয়ে গিয়ে নানা ফুল ও গাছপালার সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেওয়া যায়। তারা আনন্দে নানা রঙের ফুল ও গাছপালা দেখে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। নার্সারী বিদ্যালয়ের বাগানে নানা ধরনের খেলার আয়োজন করা যেতে পারে। যথা—

(১) চাকাওয়ালা গাড়ী চালানো

(২) শুট (chute) থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নেমে পড়া, আবার সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা

(৩) ধাপ তৈয়ারি ক'রে ওঠা-নামা

(৪) রিং ধরে, লাফালাফি ও ঝোলা

(৫) দড়ির মই দিয়ে বাওয়া

(৬) কাঠের সাহায্যে ব্যালান্স রাখবার খেলা

(৭) দড়ি নিয়ে লাফান

(৮) দোল-দোল খেলা

(৯) জলাশয়ে জলক্রীড়া

(১০) গাছের পেছনে বা অন্যভাবে লুকোচুরি খেলা

(১১) সৃষ্টিধর্মী নানা ধরনের কাজ—যেমন, কাগজের পুতুল, নৌকা, বাস, ট্রেন ইত্যাদি তৈয়ারি

(১২) চলন্ত ক্রীড়োপকরণ এবং আরো নানা প্রকারের ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা।

আসল ব্যাপার এই যে, এ বিষয়ে নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাগণ নিজেদের কল্পনাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি খাটিয়ে আরো নানা রকমের ক্রীড়ানুষ্ঠান ও আনন্দময় কর্মসূচী প্রবর্তন করতে পারেন।

নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে বাগান করা একটা বেশ মজার আর্ট হ'তে পারে। তারা নিজেরাই নানা গাছপালা লাগাতে পারে, গাছে জল দিতে পারে এবং অন্যান্য পরিচর্যা করতে পারে। নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী সাজসরঞ্জাম দিতে হবে তাদের। ছোট ছোট হাতল, কোদাল, জল আনার পাত্র ইত্যাদি দিতে হবে। বাগান করার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখবে। আর এই ভালবাসার ভিতর দিয়ে তাদের মধ্যে জেগে উঠবে একটা সমবেদনার প্রবৃত্তি। তাছাড়া প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখবার ফলে তাদের মধ্যে একাত্মভাব ও ভগবদ্ভক্তিরও উন্মেষ হতে পারে। ফ্রোয়েবেল "Nature, Man and God"-এর কথা বলেছিলেন। এই নীতি নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা গ্রহণ করতে সক্ষম।

নার্সারী বিদ্যালযের পরিবেশ এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে, যাতে ক'রে শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ানুভূতির চর্চা সুচারুভাবে সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির শিক্ষণের জন্য মন্তেসরী প্রবর্তিত নানাপ্রকার didactic apparatus ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া, ইন্দ্রিয়চর্চার উপযোগী নানা ধরনের সুদৃশ্য উপকরণ বিদ্যালয়ের আলমারিতে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা যেতে পারে। কাঠের বা রবারের সুদৃশ্য নানা উপকরণ এ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন—রবারের পুতুল, কাঠের ইঁট, সেলুলয়েডের নানা ধরনের খেলনা, চীনামাটির পুতুল ইত্যাদি। এমন ধরনের উপাদান ব্যবহার করতে হবে—সেগুলি সহজে যেন ভেঙেচুরে না যায়। কিছু কিছু যন্ত্রচালিত খেলনা মধ্যে মধ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সব খেলনা দেখেশুনে কিনতে হয়। শিশুরা এইগুলি নিয়ে খুব কৌতুক অনুভব করে থাকে। কেহ কেহ যন্ত্রচালিত খেলনা সর্বদা ব্যবহার করা পছন্দ করেন না। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ছোট ছোট আলমারি ক'রে তাদের শখের জিনিস সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলে অতি সুন্দর হয়। বিভিন্ন উৎসবের দিনে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষিকাকে কিংবা বন্ধুদের তাদের নিজেদের হাতের তৈয়ারি নানা জিনিস উপহার দিতে পারে সেদিকটির প্রতি নজর দেওয়া ভালো।

নার্সারী বিদ্যালয়ে নানা ধরনের খেলার আযোজন করতে হয। কিন্তু সর্বদা শিক্ষার্থীর বয়স, মেজাজ ও অন্যান্য দিকগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এই সব খেলাধূলার কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে; যেমন—দেহ সংগঠন, দেহের সৌষ্ঠববৃদ্ধি,

রুচিশীলতার বিকাশ, সৃজনীশক্তির প্রকাশ, কল্পনার নানা বিলাস। শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিজ্ঞতা যত বাড়বে, ততই খেলাধূলার উপকরণ যেন পরিবর্তিত হয়। উন্নত ধরনের খেলাধূলার আয়োজন করতে হবে—যাতে শিক্ষার্থী নিত্য-নূতন আনন্দের সন্ধান লাভ করে। একঘেয়ে খেলাধূলা অনেক সময় মনকে দমিয়ে দিতে পারে। খেলাধূলার উপকরণ ও আয়োজন যেন খুব বিচিত্র ধরনের হয়। দেখতে হবে শিক্ষার্থীর বহুমুখী প্রবণতা বিকাশের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আমেরিকার শিক্ষাবিদ্ বুহ্লার (Buhler) একটি পরীক্ষায় দেখেছিলেন যে, শিক্ষার উপকরণ ও আয়োজন বেশি না থাকার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত অনাথ আশ্রমের শিক্ষার্থীদের চেয়ে গরীব সাধারণ শিক্ষার্থীরা সুপরিচালিত না হয়েও আঁস্তাকুড় প্রভৃতি থেকে খেলার সরঞ্জাম সংগ্রহ ক'রে সৃষ্টিশীলতার পরিচয় দিয়েছিল। বুদ্ধিবৃত্তির পরীক্ষায় (I. Q. test) তারাই অনাথ আশ্রমের শিক্ষার্থীদের চেয়ে ভালো ফল করেছিল। নার্সারী বিদ্যালয়ে তাই খেলাধূলার উপকরণের প্রাচুর্য চাই। এ বিষয়ে দীনতা দেখালে নার্সারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হ'য়ে যাবে। উপকরণ এমনভাবে সুনির্বাচিত হবে—যাতে ব্যক্তিগত ভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে খেলার আনন্দ আহরণে শিক্ষার্থীর কোনো অসুবিধা না হয়। খেলার উপকরণ এতই বহুমুখী হবে যে, শিক্ষার্থী তার বয়স ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজেই অনেককিছু পরিকল্পনা ক'রে খেলার আয়োজন বাড়িয়ে তুলতে পারবে। খেলাধূলার উপকরণ নিয়ে যখন শিক্ষার্থী নিজেই পরিকল্পনা করতে শেখে, তখন সে সেই খেলাকে রূপান্তরিত ক'রে তোলে এবং নানা উপকরণের সমবায়ে সে অনেক জিনিস তৈয়ারি করতে উদ্‌বুদ্ধ হ'য়ে উঠে। শিশুর এই খেলাধূলা ও কাজের মধ্যে কোনো বাধাসৃষ্টি না ক'রে তাকে স্বাধীনভাবে খেলতে ও কাজ করতে দেওয়া উচিত। এগুলির মাধ্যমে সে ভবিষ্যৎ জীবনেরও একটা প্রস্তুতি পর্ব সমাধা করে। খেলার মধ্য দিয়ে কাজ করার অভ্যাস তৈয়ারী না হ'লে পরবর্তিকালে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা বা কাজে অমনোযোগী হ'য়ে উঠ্‌তে পারে। নার্সারী পর্যায়ের উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীরা এমন ভাবে গড়ে উঠ্‌বে, যাতে ক'রে তারা পূর্বার্জিত অভ্যাস, জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি আরো উন্নত পর্যায়ের কর্মে মনোযোগের সঙ্গে ও একাগ্রতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে প্রয়াসী হয়। সেজন্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়োপকরণ অধিকতর জটিল হওয়া সমীচীন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিশীল উপাদান শিক্ষার্থীদের দিতে হবে অনেক বেশি। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা

যে সব জিনিস নিজেরাই তৈয়ারি করতে শিখবে, তার মধ্য দিয়ে তার উত্তর জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবণতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এজন্য শিক্ষিকাকে এই স্তরের শিক্ষার্থীদের অভ্যাস ও প্রবণতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হ'য়ে রিপোর্ট তৈয়ারি করতে হবে। শিশু নানা কল্পনার বিলাসে মত্ত হয়। তার রঙ্গিন কল্পনাবৃত্তি যাতে কোনক্রমে ব্যাহত না হ'য়ে স্ফুরিত হয় সেজন্য নানা ধরনের পরিকল্পনা ও আয়োজন গ'ড়ে তুলতে হবে। কল্পনার বিলাস চরিতার্থ করতে গিয়ে শিশুরা ভবিষ্যৎ জীবনের অনেক স্বপ্নকে রূপ দিতে চায়—কেউ রান্নাবান্না করে, আবার কেউ যন্ত্রচালনার জন্য প্রস্তুত হয়।

নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দরদ ও সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য জীবজন্তু নিয়েও খেলাধূলার ব্যবস্থা করতে হবে। এতে তাদের মনে গড়ে উঠে গভীর সহানুভূতি।

অনুকরণস্পৃহা নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের একটি প্রাথমিক ধর্ম। অনুকরণ ক'রে শিক্ষার্থীরা অনেক কল্পনাকে রূপায়িত ক'রে থাকে। কখনো কখনো তারা নানা আওয়াজ করে, ভ্যাংচায়, জীবজন্তু, গাড়ী-ঘোড়ার শব্দ অনুকরণ করে। এই অনুকরণ প্রবৃত্তিকে সংগঠিত ক'রে শিক্ষার্থীদের চরিত্রের মধ্যে কতকগুলি স্থায়ী উপাদান গ্রথিত ক'রে তুলতে হবে। সেজন্য নার্সারী বিদ্যালয়ের পরিবেশে যাতে কোন কু-অভ্যাস তারা অনুকরণ না করে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

পরিবেশ থেকে প্রকৃত উপযোজনা শক্তি না পেলে শিক্ষার্থীর মধ্যে অনেক সময় অবদমিত ভাব দেখা দিতে পারে। সেজন্য শিক্ষার্থীর মনকে সতেজ ও কর্মঠ করে তোলার জন্য তার অনগ্রসরতা ও অবদমিত মনোভাব দূর করবার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

শিশুকে সমাজজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের কতকগুলি নীতি শিক্ষা দিতে হবে হাতে কলমে। যাতে সে ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলি সহজে আয়ত্তাধীন ক'রে তোলে তার জন্য যত্ন নিতে হবে। সামাজিক পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, মেলামেশা, খেলাধূলা প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে শিশুকে সামাজিক চেতনাসম্পন্ন ক'রে তুলতে হবে।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নার্সারী বিদ্যালয়ে কোনো নির্দিষ্ট পাঠ্যতালিকা নেই। এই জাতীয় বিদ্যালয়ে কোনো বাঁধাধরা রুটিন অনুসরণ করা হয় না। তবে শিক্ষিকাকে সবকিছু পরিচালনার জন্য একটি কর্মসূচী অনুসরণ করতে হয়।

নার্সারী বিদ্যালয় হবে আবাসিক ধরনের। তাই, সারা দিন-রাত্রির উপযোগী কাজ ও খেলার কর্মসূচী রাখা দরকার। সমষ্টিগত ভাবে এবং ব্যক্তিগত ভাবে কাজে ও খেলায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীরা যাতে উৎসাহী হ'য়ে ওঠে, সেজন্য নার্সারী বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার ব্যক্তিগত যত্ন ও পরিচালনা খুবই মূল্যবান।

নার্সারী বিদ্যালয়গুলিতে যে সমস্ত শিক্ষিকা নিয়োগ করা হয়, তাদের মন্তেসরী ট্রেনিং গ্রহণ করতে হয়। এই পর্যায়ের শিক্ষাদান অত্যন্ত সুচিন্তিত ও সুপরিচালিত হওয়া প্রয়োজন ব'লে যোগ্য সুশিক্ষিতা মহিলারাই এ বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। ইংলণ্ডে দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাই নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকা হন।

নার্সারী বিদ্যালয়ে শিশুর সংখ্যা সুনির্দিষ্ট হওযা ভালো। একটি নার্সারী বিদ্যালয়ে পঞ্চাশ জনের বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি করা ঠিক নয়। আমাদের দেশে নার্সারী বিদ্যালয় বর্তমানে শহরাঞ্চলে সীমাবদ্ধ এবং গ্রামাঞ্চলে এদের উদ্ভব কোনো কোনো জায়গায় সবেমাত্র শুরু হয়েছে। বড় বড শহরে পিতা-মাতা নানা কাজকর্মে ব্যস্ত থাকেন। সন্তান-সন্ততিদেব উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার সময় তাঁদের একেবারে থাকে না বললেও অত্যুক্তি হয় না। এজন্য শহর ও শিল্পাঞ্চলে নার্সারী বিদ্যালয় অত্যধিক সংখ্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সমীচীন। আজকাল গ্রামের সমাজ জীবনও জটিল হ'য়ে উঠ্‌ছে। গ্রামের পিতামাতা সন্তান সন্ততিদের উন্নত ধরনেব শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণে তত অভ্যস্ত নন। অথচ শৈশবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা প্রবণতার সম্যক বিকাশ সাধন না হ'লে, পরবর্তী কালে তারা সমাজ-জীবনের বৃহত্তর পরীক্ষাতে বেমানান হ'য়ে যাবে। এদিক দিয়ে বিচাব কবলে গ্রামেও নার্সারী শিক্ষার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। সমাজের জাগবণ দেখা দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসী আবো সচেতন হ'য়ে উঠ্‌ছে। অভিভাবকেরা আজকের দিনে শিশুর উন্নতি সাধনেব জন্য অধিকমাত্রায় সচেষ্ট হয়ে উঠ্‌ছেন। শিক্ষা-নীতির প্রকৃত সার্থকতা তাই নির্ভর করছে শহর ও গ্রামাঞ্চলে নার্সারী বিদ্যালয় অধিকসংখ্যায় প্রতিষ্ঠার উপর। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনায় তাই নার্সারী বিদ্যালয় একটি অবশ্য-নির্দিষ্ট ধাপ হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং সর্বস্তরে এই শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হওয়া উচিত।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে, ভারতবর্ষে নার্সারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং সেজন্য এই রিপোর্টে দশলক্ষ শিশুর শিক্ষাদনের জন্য

নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ জানানো হয়েছিল। স্বাধীন ভারতে এই প্রয়োজন আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া, আফ্রিকা, ইংলণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশে নার্সারী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে সবে মাত্র। আমাদের দেশেও এই পরিকল্পনাকে শিক্ষাব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে লক্ষ-লক্ষ শিশুকে শিক্ষা দিবার পরিকল্পনা কার্যকরী ক'রে তুলতে হবে। ইংলণ্ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা কম হ'লেও শিশুবিদ্যালয় বা Infant School-এ নার্সারী পর্যায়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রচুর। আমাদের দেশে যতদিন না এই নার্সারী শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত শিশুবিদ্যালয়ে "শিশু-শ্রেণী" পর্যায়কে সুসংগঠিত করে তার মাধ্যমে পৃথক শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। তবে, সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে এই পর্যায়ের শিক্ষার প্রচলনকে গ্রহণ করা সমীচীন। শিক্ষিকা বা শিক্ষকেরা যাতে এই পর্যায়ের যথাযথ শিক্ষণ লাভ করেন সেজন্য নার্সারী ট্রেনিং পরিকল্পনাও ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে হবে। এক কথায়, নার্সারী বিদ্যালয় পরিকল্পনাকে সর্বপ্রকারে সার্থক ক'রে তুলবার জন্য সরকার, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা সকলকে বিশেষ উৎসাহী হ'য়ে কাজে লেগে যেতে হবে—যাতে শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি সত্যিকারের সুদৃঢ় মনস্তত্ত্বের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

Questions

1. Discuss the problems and needs of Child-education in general.
2. What are the problems of Nursery Eduction and how they can be solved?
3. State the special features of Nursery Education and its relation to Primary Education.

References.

1. কে ডি দাস—আমাদের শিক্ষা।
2. Sargent Committee's report
3. Rusk—History of Infant Education.

একাদশ পরিচ্ছেদ

মানসিক স্বাস্থ্য ও শিশুশিক্ষা

(Mental Higiene and Child Education)

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্য হোলো দৈনন্দিন জীবনে একটা সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের সুস্থ ও স্বাস্থ্যপ্রদ অবস্থা এনে দিতে সাহায্য করা। এজন্য প্রয়োজন হবে সামাজিক আবহাওয়া সুস্থ ক'রে তোলা—যা থেকে মানসিক বিশৃঙ্খলা না দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন পেশার ফলে সমাজে উদ্ভূত জটিলতা থেকে অপরাধ ও অসহায়মূলক অবস্থার সৃষ্টি যা হয়, সেইগুলি দূরীভূত ক'রে তোলা দরকার। শিশুদের গৃহগত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগত যে সব সমস্যা দেখা দেয়, সেগুলি যাতে কোন মানসিক বিশৃঙ্খলা ও অপরাধ না জাগিয়ে তোলে সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা দরকার। এজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদগণ বিদ্যালয়ে 'School clinic' গ'ড়ে তোলার কথা ব'লে থাকেন—যেখানে মানসিক ও দৈহিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

কি কি কারণে মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেগুলির মূল অনুসন্ধান করা উচিত। বংশগত কারণে মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় দেখা গেছে। অনেক সময় সুদূর পুরুষের মধ্যে কোনো মানসিক ব্যাধি থাকলে তা পরবর্তী যে-কোন পুরুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। মানসিক সমতার অভাব থেকেও মানসিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। শতকরা ৩০% ভাগ বংশগতভাবে epilepsy দেখা দেয় এবং ১০% ভাগ ক্ষেত্রে প্রথম শিক্ষার মধ্যে তার সংক্রমণ দেখা যায়। এ ছাড়া, শিশুর গৃহে ও গৃহের বাহিরের পরিবেশগত প্রভাব শিশুর ব্যক্তিত্বকে প্রভাবান্বিত করে। যথার্থ ধরনের শিক্ষার সুযোগ পেলে শিশুরা সঠিকভাবে সমাজের সঙ্গে মিলতে পারে। নিউরোসিফিলিস্ ব্যাধি প্রাথমিক চিকিৎসার দ্বারা সারিয়ে ফেলা যায়। মাতলামি থেকে অনেক ধরনের গুরুতর ব্যাধি এসে দেখা দেয়। এজন্য মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য চাই উন্নত ধরনের শারীরিক কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা। মানসিক ব্যাধির সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধানের জন্য সামাজিক তদন্ত প্রয়োজন। যে সমস্ত শিশুর মধ্যে মানসিক ব্যাধি দেখা যায়, তাঁদের সেই ব্যাধি দূর করার জন্য Follow up, After care প্রভৃতি পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। সামাজিক সংগঠন এমনভাবে গ'ড়ে তোলা

উচিত—যাতে ক'রে লোকের মন থেকে বিভিন্ন ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার দূরীভূত হতে পারে।

বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য গৃহে ও বিদ্যালয়ে শিশুর জন্য একটা সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনা গ'ড়ে তোলা উচিত। শিল্প অঞ্চলে মানসিক উপাদান অগ্রাহ্য করা হয় বলে সেই সব অঞ্চলে শিশুদেরও নানাবিধ অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। এ ছাড়া যৌনপ্রবৃত্তি মানসিক বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী ব'লে ফ্রয়েড মন্তব্য করেছেন। ফ্রয়েড যথার্থই বলেছেন—
"Sex instinct is complicated and still more complicated is the management of sex"

মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করা কর্তব্য। (১) শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করা। (২) জীবনের প্রতি একটা objective মনোভাব গ'ড়ে তোলা। (৩) ব্যবহারের মধ্যে একটা অন্তর্দৃষ্টি বা আত্মজ্ঞানের মনোভাব গ'ড়ে তোলা। (৪) ব্যক্তির tension reduction-এর জন্য তার গোপনীয়তা জানবার চেষ্টা করা। (৫) বর্তমানের উপর জোর দিতে বলা—বিকৃত অতীত বা অস্পষ্ট ভবিষ্যতের চিন্তাকে একেবারে ভুলে যাওয়া। (৬) একটা হেঁয়ালি ক'রে মনটাকে হালকা করে ফেলা। (৭) সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী মেনে নিয়ে একটা non-adjustive মনোভাব গ'ড়ে তোলা। (৮) বিশ্রাম ও অবসর বিনোদন। (৯) স্বাভাবিক সামাজিক কাজকর্মে সুস্থ ও সবল মন নিয়ে যোগদান করা।

শিশুদের মানসিক ব্যাধি দূর করবার জন্য বিদ্যালয়ে Child Guidance Clinic গ'ড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এই Clinic গঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে Stevenson ও Smith বলেছেন—

"The child guidance clinic is an attempt to marshall the resources of the community on behalf of the children who are in distress because of unsatisfied inner rules, or are seriously in conflict with their environment. Children whose development is thrown out of balance, difficulties which reveal themselves in unhealthy traits, unacceptable behaviour or inability to cope with social and scholastic expectations"

এইরূপ ক্লিনিকে একজন থাকবেন Psychiatrist, একজন মনস্তাত্ত্বিক ও দু'-তিনজন সমাজকর্মী। বিদ্যালয়ে শিশুরা যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয় সেগুলি হোলো—

(১) শারীরিক সমস্যা ; যেমন—খাওয়া, ঘুমানোর অভ্যাস, তোৎলামি, আঙ্গুল চোষা, নখ-কামড়ানো, বেশিক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকা ইত্যাদি।

(২) ব্যক্তিত্বের সমস্যা ; যেমন—ভয়, কাপুরুষতা, অত্যধিক কল্পনা-প্রবণতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, ক্লান্তির অভাব, অত্যধিক কর্মপ্রবণতা, অনুভূতি-প্রবণতা, অনুভূতিশূন্যতা ইত্যাদি।

(৩) সামাজিক সমস্যা ; যেমন—মেজাজগত দিক, যুদ্ধমূলভ মনোভাব, উচ্ছৃঙ্খলতা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা, কর্তৃপক্ষকে না মানা ইত্যাদি

(৪) বিদ্যালয়গত সমস্যা, যেমন—বিদ্যালয়ের কর্মে অনগ্রসরতা, কোনো বিষয়ে পারদর্শিতার অভাব ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ে শিশু যাতে কোন প্রকারে নিজেকে অসহায় না মনে করে সেদিকে শিক্ষকের নজর দেওয়া প্রয়োজন। দেখতে হবে শিশুর বুদ্ধিগত ও ভাবগত চাহিদা মিটানোর জন্য শিক্ষকগণ সঠিক যত্ন নিতে পেরেছেন। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে, গঠনমূলক কাজ ও খেলাধূলার মাধ্যমে শিশুর শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব। ছাত্রদের মনের অসহায় বোধটা—সে ঘর থেকে হোক, সমাজ থেকে হোক আর বিদ্যালয় থেকে হোক —দূর ক'রে ফেলতে হবে। শিশুর সামগ্রিক সমস্যার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। শিশুরা বিদ্যালয়কক্ষে যে সমস্ত ব্যবহার করে, সেগুলিকে কঠোর হস্তে চেপে দিলে তার ফল ভালো হয় না। এজন্য শিক্ষক যতদূর সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে সকলের প্রতি সমান নজর দেওয়ার চেষ্টা করবেন এবং যারা অনগ্রসর বা নানাপ্রকার ব্যাধিতে জড়তাগ্রস্ত, তাদের প্রতি মমত্ববোধ নিয়ে তাদের উৎসাহিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করবেন। ছাত্ররা নিজেরাই যাতে নিজেদের সমস্যার সমাধান ক'রে ফেলতে পারে, সেজন্য তাদের মনে একটা আত্মানুসন্ধান প্রবণতা জাগিয়ে দেওয়া ভালো। Clinical Guidance-এর সাহায্যে সর্বদা শিশুর নিম্নলিখিত দিকগুলির অনুসন্ধান করা ও সেগুলি প্রতিকারের ব্যবস্থা লওয়া প্রয়োজন। যেমন—

(১) শারীরিক স্বাস্থ্য

(২) বংশগত পরিচয়

(৩) বিকাশ পদ্ধতির ইতিহাস

(৪) বিদ্যালয়ের উন্নতি

(৫) বিদ্যালয়ের কার্যের মূল্যায়ন

(৬) সামাজিক ইতিহাস

(৭) অর্থনৈতিক অবস্থা

(৮) নৈতিক অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া

(৯) মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা

ক্লিনিকে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়; যেমন—

(১) Psychotherapeutic পদ্ধতি

(২) Environmental Therapy

(৩) Re-education

(৪) Occupation Therapy

(৫) Shock Therapy

(৬) Relaxation Therapy

(৭) মনঃ সমীক্ষকদের অনুসৃত পদ্ধতি।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির প্রয়োগের দ্বারা আমরা শিশুদের বিভিন্ন মানসিক ব্যাধির প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে পারি।

ভারতবর্ষে এই ক্লিনিকের ধারণাটা নতুন হলেও ইংলণ্ডে শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেখানে "Prevention is better than cure." এই নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। ইওরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শেষে মনস্তাত্ত্বিকগণ এ বিষয়ে অনুসন্ধান ক'রে দেখেছিলেন যে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক ব্যাধি দূর করা যায়—যদি সময়মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপযুক্ত শরীর ও মন না থাকার জন্য অনেকের মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা নষ্ট হ'য়ে যায়। কিন্তু শিক্ষার ফলে মানুষকে বুদ্ধিমান ও সক্রিয় করে তোলা সম্ভব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Students' Welfare Committee আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, সমস্যা কত গভীর। একজন ছাত্রের উচ্চারণের ক্ষমতার অভাবের কারণ হোলো তার স্বরযন্ত্রের দোষ—যা ছোটবেলা যত্ন নিলে দূর করা যেতো। সম্প্রতি "Preliminary Report on the inquiry into the general condition of the students in West Bengal" নামে একটি রিপোর্টে দেখিয়েছেন যে, অধিকাংশ ছাত্রদের অভিভাবকদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা অতি সংকটাপন্ন, কেবলমাত্র শতকরা ১৯% ভাগ ছাড়া। এই অবস্থার প্রতিকার ক'রে এক সুস্থ মানসিক আবহাওয়া গঠনের প্রয়োজনীয়তা

সম্পর্কে অনেক শিক্ষাবিদ্ দাবি জানিয়েছেন সঙ্গতভাবে। আর একটি সার্ভেতে প্রকাশিত হয়েছে যে, বিদ্যালয়ের শতকরা ৮০% ভাগ শিক্ষার্থীরই কোন-না-কোন শারীরিক বা মানসিক ব্যাধি রয়েছে। অথচ আজকের দিনে আমাদের রুশোর কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত—"All weakedness comes from weakness. A child is bad only because he is weak; made him strong and he will be good."

Questions :

1. Discuss some of the mental and physical problems of school-going children.

2. Discuss the nature of mal-adjustment problems of children and point out remedial measures.

References .

1. Student Welfare Committee's Report

2. Shermen—Mental Hygiene.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও প্রণালী

(Aims and Methods of Secondary Education)

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ধাপেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে; বিশেষতঃ মাধ্যমিক শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য রয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যখন শিশু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে, তখন তার শিক্ষা বিশেষ অর্থপূর্ণ হ'য়ে উঠে। এই সময় সে অভিজ্ঞতা আহরণ করে এবং বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে জ্ঞান অর্জন করে। বিভিন্ন জটিল বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক সাধনের ক্ষমতা শিশুদের মধ্যে তখন দেখা দেয়। উচ্চপর্যায়ের মানসিক ক্রিয়া এই সময় থেকে ধাপে ধাপে আরম্ভ হয় ব'লে এই সময়ের শিক্ষার মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন ঐক্য সাধন প্রয়োজন হয়। এই পর্যায়ে শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ঝোঁক এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা অনেকখানি বুঝতে পারা যায় এবং সেই অনুযায়ী তাদের গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। এসব দিক দিয়ে বিচার করলে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুসারে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার একটা বিশেষ তাৎপর্য অনুভূত হয়। এতদিন পর্যন্ত আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল একমুখী এবং দেশের চাহিদা মেটানোর পক্ষে অনুপযুক্ত। অধুনা মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন যে-সমস্ত যুগান্তকারী অনুসন্ধান করেছেন তা' আমাদের গভীরভাবে বিবেচনা ক'রে দেখা কর্তব্য। মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামোর মধ্যে একটা পরিবর্তন আনতেই হবে। তবে এই পরিবর্তন খুব আস্তে আস্তে আনতে হলেও তা গতিশীল হবে। ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনায় ডক্টর আর. বিলে যা' বলেছেন তা' আমাদের দেশের সম্পর্কেও অনেকখানি প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন—"If one reads the history of any British School one nearly always finds that the great political crises of the national history are hardly ever referred to. It is not that the schools have not changed; they have done so in many ways through the centuries. But change has been slow due to the slow pressure of social developments, not to sudden

external political influences." আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠনের পালা যেখানে শুরু হয়েছে, সেখানে এ সত্যটি আমাদের বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন সমস্যা নিয়ে গত তিন দশক ধ'রে রাজ্যসরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় যে-সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়েছেন, সন্তোষজনক হলেও জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে তা' সার্থক হিসেবে বিবেচিত হয়নি। অথচ মাধ্যমিক শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে সমগ্র শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে। আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বলা হয়েছে 'One of the weakest links in the chain of Indian education.'। অথচ উচ্চ শিক্ষার ভবিষ্যৎ ও প্রাইমারী শিক্ষার সাফল্য প্রভূত পরিমাণে নির্ভর করেছে মাধ্যমিক শিক্ষার উপর। মাধ্যমিক শিক্ষা-কমিশন ও International Team ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হ'যে কতকগুলি সুচিন্তিত সুপারিশ করেছেন। পূর্বে কমিশন-গুলির সুপারিশ কার্যকরী করা সম্পর্কে যে বিরূপ সমালোচনা করা হোতো, এবার তার ব্যতিক্রম হবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য হোলো প্রত্যেক শিশুর সুসম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত বিকাশের ব্যবস্থা করা। ব্যাপক অর্থে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যক্তিকে "to bear worthily the responsibilities of democratic citizenship" এবং 'broad, national and secular outlook" গ'ড়ে তুলবে। এই লক্ষ্য যদি পূরণ করতে হয়, তবে প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার মূল কাঠামোকে পরিবর্তন ক'রে মানসতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে তার স্তরবিভাগ করতে হবে। নূতন পরিকল্পনা অনুসারে ১১ বৎসরের কোর্স ও প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছে। সম্প্রতি ডঃ দেশমুখ ১২ বৎসরের মাধ্যমিক কোর্স, ৪ বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের কথা ব'লেছেন এবং এই সম্পর্কে জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বলেছেন। শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা নিয়ে ২৩।২৪ বৎসরে মাস্টারস্ ডিগ্রী নিয়ে বের হবার যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন। আমরা দেখছি বর্তমানে যে একাদশ মান পরিকল্পনা চালু হয়েছে, তা'তে দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ের পক্ষে একটি ক্লাস সংযোগ করা কঠিন হবে না। কিন্তু যেখানে পূর্ব থেকে ১১শ বৎসরের কোর্স চালু আছে সেখানে তাঁরা আরো এক বৎসর সংযোগ ক'রতে দ্বিধা করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায় একাদশ বৎসরের বা দ্বাদশ বৎসরের হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত উদ্ধৃত করা গেল। রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের মতে—

"In U. K. and U. S. A. and in most European countries like Germany, France, Switzerland at least twelve years of schooling are necessary before a student enters the University. In India, most of the work now done in our present intermediate class is really school-work and should properly be regarded as Pre University work, as in U. K. and U. S. A."

এই সম্পর্কে ডঃ মুদালিয়র স্বয়ং সংবাদপত্রে যে বিবৃতিটি দিয়েছিলেন, তার একটি অংশ হোলো এই : "There has, unfortunately been a confusion and therefore a conflict as to the total number of years ought to be covered in the period of Secondary Education and to this day, in many states, there is a controversy raging whether it should be 11 or 12 years."

* * *

"Whatever may be the financial difficulties of the states, in implementing these reforms, let us hope that the pattern of education that has been suggested will not be whittled down on these considerations and that, as long term policy at least, the states will realize that no proper type of education can be given upto the end of the secondary stage unless the pupil undergoes a 12 years' course of training of which 8 years will be of the compulsory period and 4 years of the Higher Secondary School Stage." (Hindusthan Times, 21. 10. 56)

পশ্চিমবঙ্গের 'দে কমিশন'ও ১২ বৎসরের মাধ্যমিক পর্যায়ের সুপারিশ করেছেন। কিন্তু সরকার ১১ বৎসরের মাধ্যমিক পর্যায়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই দাবি সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় ১৩।১৪ বৎসরের শিক্ষার্থীর পক্ষে ভবিষ্যৎ জীবনযাপনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হবে না এবং খুব অল্প-বয়সেই তাদের উপর বিষয়ের গুরুভার চাপিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীমন্নারায়ণ ১৯৫৬ সালে জয়পুরে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত শিক্ষা সম্মেলনে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন সম্পর্কে মন্তব্য ক'রে বলেছিলেন—

"Learning through doing or earning while learning should be the guiding lights in the sphere of the Secondary Education. It is no use producing students who have gathered some information and knowledge in certain subjects but who are not fit to undertake any definite responsibilities in life."

সেইজন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে এমনভাবে পুনর্গঠিত ক'রে তুলতে হবে—যাতে করে তা' বিজ্ঞানসম্মত ভাবে আমাদের দেশের বাস্তব অবস্থার অনুকূল হয়। শিক্ষার প্রত্যেকটি ধাপের নিজস্ব মূল্য রয়েছে। এদিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। 'When a pupil enters the secondary school, his learning should become increasingly significant. He should begin to see relationships, to fathom causes and effects, to detect the motives and forces behind major events and eras, in short to generalise and verify experience and knowledge. The higher natural processes are necessarily brought into operation to promote this deeper education ; but since education should become more profound from grade to grade, the secondary grades are appropriate for much of the initiative and fastering of unity in learning."

একথার তাৎপর্য এই যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক প্রবণতা ও ঝোঁক বিচার করা যায় এবং তার জীবনের ক্ষেত্র তৈরি করা যায়। সুতরাং এদিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা পুনর্গঠন সম্পর্কে এক যুগান্তকারী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে আরেকটি জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে। তা' হোলো শিক্ষার্থীদের বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত নির্দেশ দানের ব্যবস্থা। প্রত্যেক বিদ্যালয়কে এজন্য আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করতে হবে—কেননা আমাদের দেশে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা রয়েছে। আমাদের দেশে শিক্ষার চাহিদা ও চাকুরীর সুযোগের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই। শিশুদের যথাযথ সময়ে তাদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচনের প্রবণতার সুযোগ দিতে হবে। তাছাড়া, শিক্ষকদের প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে তোলার জন্য বিদ্যালয়ে একদিকে যেমন Guidance Service গ'ড়ে তুলতে হবে, তেমনি অসংখ্য সেমিনার সংগঠন ক'রে তুলতে হবে। তা'ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষক তৈরীর জন্য বিশেষ ক'রে অবহিত হতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বলেছেন—"The provision of diversified courses and instruction imposes on teachers and school administrators the additional responsibility of giving proper guidance to pupils in their choice of courses and careers". বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এজন্য Guidance officer ও Career Master দের সংখ্যা

বাড়িয়ে তুলতে হবে। তাই বলা হয়েছে—"The service, of Guidance officers and Career Masters should be made available gradually in increasing measure to all educational institutions."

ইংলণ্ডের মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে Secondary Modern School-এ প্রধান শিক্ষকদের স্বাধীনতা দেওয়া হয় তাঁদের নিজস্ব রীতিনীতি অনুযায়ী চলবার। ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে মাধ্যমিক স্কুল ছাড়বার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫ বৎসর এবং শিক্ষার তিনটি পর্যায় হয়েছে—প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী ও ফারদার (পরবর্তী শিক্ষা)। এই আইন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবিকল রূপটির কথা না ব'লে বলেছেন—"The schools of an area shall not be considered sufficient unless from the point of view of number, character and equipment they afford to all pupils such variety of instruction and training as is desirable in view of their difficult ages, abilities and aptitudes."। কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের জন্য নূতন গঠনমূলক পরিকল্পনা নিয়ে ব্যবস্থা করেছেন, যেমন—স্টেজহল, জিমনেসিয়াম, লাইব্রেরী, ওয়ার্কসপ, ল্যাবরেটারী, আর্ট ও শিল্পকক্ষ, উদ্যান, খেলাধূলার জায়গা প্রভৃতি। সেখানে প্রচলিত ব্যবস্থার বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হওয়ার নীতি মেনে নেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক বিভাগে Head system ও graded post চালু করা হয়েছে। সেখানে প্রতি চব্বিশ জনে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। ১১ বৎসর বয়সে যত্নের সঙ্গে ছাত্রদের গ্রামার বা মর্ডান স্কুলে ভর্তি করা হয়। সাধারণত সেখানে ১২০—৭০ I. Q. এর ৮৪% ভাগ ছাত্র ভর্তি করা হয় এবং প্রত্যেককে ষাণ্মাসিক ফলাফলের উপর re-grading করা হয়। প্রথমত, তিন বৎসরের কোর্সে মূল (basic) জিনিস বিস্তৃতভাবে শিখানো হয়। একটা দ্বিতীয় ভাষা এবং অঙ্ক, বিজ্ঞান সম্পর্কে খুব নিখুঁত ভাবে জ্ঞান দান করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের আর একটা দিক হোলো পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার। প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির ত্রুটির জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক অপচয় হচ্ছে। All-India Council for Secondary Education এ বিষয়ে অবহিত হ'য়ে বিশেষজ্ঞদের চেষ্টায় নূতন পরীক্ষার মান নির্ণয়ে যত্নবান হ'য়েছেন। তবে এটা সুনিশ্চিত যে, মূল্যমান নির্ণয়ের সমষ্টিগত ফলকেই পরীক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রে বড় করে দেখা হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাপুনর্গঠন করতে গেলে শিক্ষকের ভূমিকা বিস্মৃত হ'লে চলবে না। শিক্ষকের উপরই সবকিছু নির্ভর করছে। তবে আনন্দের কথা, মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণ এ বিষয়ে খুব সচেতন হয়েছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার ও All India Council for Secondary Education সারা দেশব্যাপী যে সেমিনারের আয়োজন করেছেন তাতে বহু শিক্ষক অংশ গ্রহণ করেছেন। শিক্ষককে যদি বুঝতে দেওয়া হয় যে তাঁর স্বাধীন ভাবধারা ব্যর্থ নয়, প্রোজেক্ট গ্রহণেরও স্বাধীনতা রয়েছে, তবে তিনি ভালোই কাজ করতে সক্ষম হবেন। শিক্ষকদের বৃত্তিগত কাজকে উৎসাহিত ক'রে তোলার জন্য নানা পুরস্কার ও মাহিনাবৃদ্ধি প্রভৃতি যে উদ্যোগপর্ব শুরু হয়েছে তা আনন্দের কথা।

Questions

1. Discuss in brief the problems of Secondary Education in India and some of the foreign countries.

2. State clearly the Aims, Contents and Methods of Secondary Education with special reference to India.

3. Discuss the utility of diversified courses in Secondary Schools. Whether 11-year school is beneficial to Indian conditions?

References

1. Sargent Committee's Report.
2. The Secondary Education Commission's Report.
3. The University Education Commission's Report.
4. The Dev Commission's Report.
5. হরিসাধন গোস্বামী—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বয়ঃসন্ধির চাহিদা ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন

(Needs of the Adolescents and the problems of Discipline)

আধুনিক যুগের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাগত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। প্রাচীন যুগের পাঠশালার চিত্র স্মরণ করলে দেখা যাবে যে, সেখানে একঘেয়ে পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার সঙ্গে শিশুদের কঠোর শাসন-শৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিল। শিশুর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদার কথা সেদিন মনে না রেখে একেবারে 'কবরের মতো নিস্তব্ধতা' অনুসরণ করা হোতো। আধুনিক শিক্ষার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রাভিমুখী শিক্ষা চালু হয়েছে। অষ্টাদশ শতকে রুশো এই নীতির প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে স্বাধীন মানুষ জন্মেছে তার আদিম প্রকৃতিতে মুক্তির মন্ত্রগানকে বেদমন্ত্র করে। প্রকৃতির শ্যামলিমায় যে সৌন্দর্যসুষমা নিহিত আছে, তাকে বরণ ক'রে নিয়ে চলাই শিশুর গৌরব। 'অহং' ভাব থেকে নিষ্কৃতি লাভ না ক'রে তার উপায় নেই। রুশোর এই মতবাদের উপর, তাঁর এই বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উপর আধুনিক শিক্ষার পটভূমি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ মনস্তত্ত্বকে আত্মবিশ্লেষণের জিনিস ক'রে তুলেছেন। শিশুর আচারগত পরিচয়, তার মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতার পরিচয় নির্দেশ করে। শিশুর বয়স, কর্মদক্ষতা ও উন্নতির উপর শিশুর ব্যবহার নির্ভরশীল। মনোবিজ্ঞানীরা তাই শিশু-শতাব্দীতে শিশুর চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার উপর জোর দিতে চেয়েছেন বেশি করে। শিশুকে তাঁরা চেয়েছেন ব্যক্তিত্ব-মণ্ডিত ও সমাজমণ্ডিত ক'রে তোলার জন্য। এর ফলে শিশুশিক্ষা মানবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আত্মপ্রকাশের সুযোগ পেয়েছে।

আধুনিক শিক্ষার সর্বপ্রকার পরীক্ষামূলক গবেষণা আজ পশ্চিমে হচ্ছে এবং আমাদের দেশেও কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। কেহ কেহ শ্রেণী-শিক্ষার বিলোপ সাধনের কথা ব'ললেও শ্রেণীশিক্ষার উপযোগিতা বর্জন সম্ভব হবে না। আজকের দিনে শিক্ষককে উপদেষ্টা হিসেবে, ফুলবাগানের মালী হিসেবে বা রোগ চিকিৎসার পথ-প্রদর্শক হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে

শিশুর ব্যক্তিত্ব সংগঠনের জন্য। সেদিক থেকে শ্রেণী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বস্তু। শুধু মাত্র শ্রেণীগতভাবে পুঁথিগত বক্তৃতাদানের শিক্ষার পরিবর্তে কি ভাবে শিশুর প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের উপযোগী শান্তিপূর্ণ সামাজিক বিপ্লব সংসাধিত করা যায়, তা আজকের দিনের শিক্ষক-অভিভাবকদের কাছে একটা জরুরী সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বর্তমান শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে আদিম শিক্ষার প্রকৃতি একটু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, তখন মানুষ শিক্ষা ও শৃঙ্খলা সম্পর্কে খুব বেশি সজাগ ছিল না। কিন্তু ক্রমশ মানুষ তার আদিম সুখ-দুঃখ অতিক্রম ক'রে একটা সংগঠিত সুশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যক্তিত্ব উন্মোচনের পথে পা বাড়িয়েছে। আজকের দিনের শিক্ষায় শিশুকে সমাজমণ্ডিত ক'রে তোলার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ব্যক্তিত্বকে উদ্বোধিত করে তোলা। আজকের দিনে বুদ্ধিমান শিক্ষক ছাত্রদের 'symptoms of spiritual sickness' দেখে তাকে যে রূঢ়হস্তে দমন করবেন, তা হ'তে পারে না; তাঁকে দেখতে হবে কিভাবে মানসিক, ও শারীরিক অসুস্থতাকে সুপথে পরিচালিত করা যায়। যাকে মনে করা হচ্ছে বে-খাপ্পা (mal adjusted) তাকে আধ্যাত্মিক মনের গৌরব অর্জনে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে হবে। যখন ছাত্রদের মধ্যে নানা গুরুতর অপরাধ বা অভিযোগ দেখা যাবে, তখন দেখতে হবে অনুসন্ধান ক'রে যে, কি কি উপাদান গোলমেলে হয়ে যাওয়ার জন্য এরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে। এমন হতে পারে যে, পাঠ্যসূচীর মধ্যে বা স্কুলে অথবা গৃহে এমন কিছু ফাঁক আছে—যার জন্য এই বিশৃঙ্খলা। বিশৃঙ্খলার কারণ অনুসন্ধান ক'রে তাকে দূর করার মনস্তাত্ত্বিক প্রচেষ্টা শিক্ষককে গ্রহণ করতে হবে। বিদ্যালয়কে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে যার, আদর্শ কৃত্রিম হবে না—বরং তা হবে সার্বজনীন আদর্শের অনুকূল। যাতে ক'রে শিশুর মনে কোনোরূপ অসংলগ্নতা প্রকাশ না পায়, তার জন্য সর্বপ্রকার যত্ন নিতে হবে। সব চেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে সমগ্র বিদ্যালয় সমাজের মধ্যে এক আশাবাদী আদর্শ জাগিয়ে রাখতে হবে, যাতে ক'রে কোনো অবস্থায় শিশুর মনে কোনো ভাবের অবদমন না ঘটে বা বিক্ষোভের কোনো বীজ না উপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের কর্মসূচী হবে ব্যাপক ও বিস্তৃত ধরনের। বিদ্যালয় হোলো সমাজের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ। তাই, বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী, কার্যাবলী, শৃঙ্খলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে নাগরিকশিক্ষা এমনভাবে জাগিয়ে দিতে হবে, যাতে ক'রে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনানুগ বৃত্তির অনুশীলন করতে

পারে। এই প্রসঙ্গে মহামতি কার্লাইলের মতবাদ স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন—"মৌলিক প্রতিভা একটা অদ্ভুত কিছু জিনিস নয়, তা সততা মাত্র। এই সততা উপার্জন করা যাবে আপনার প্রকৃতির বৃহত্তর গতি সম্পর্কে সচেতন হতে পারলে।" বিদ্যালয় হোলো এই সততা উপার্জনের ক্ষেত্র। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সদর্থক, নঞর্থক নয়। স্বাধীন কর্মবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা শিশুদের প্রাণবৃত্তির প্রকাশকে যদি উৎসাহিত ক'রে তোলা হয় তবে তারা শৃঙ্খলা অর্জনে সক্ষম হবে, আর হতে পারবে ডাঃ পার্সিনানের ভাষায় "An apprentice striving to learn the trick of the master hand." বিদ্যালয়ের আদর্শগত মান লঙ্ঘন করলে শাস্তিবিধান করতে হবে; তবে সেই শাস্তিবিধান যেন কোনরূপ বর্বরতায় না পর্যবসিত হয়। হার্বার্ট বলেছিলেন যে, কিছু পরিমাণ শৃঙ্খলা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রয়োজন এবং তার উদ্দেশ্য হবে 'শৃঙ্খলা' অর্জন করার উপায় হিসেবে—যাতে ক'রে শিক্ষার উচ্চতম আদর্শ শিক্ষার্থী গ্রহণ করতে পারে। এদিক থেকে "শৃঙ্খলা" ও "সুষ্ঠুবিন্যাস"—দু'টি কথার পার্থক্য দেখিয়েছেন অধ্যাপক নান। সুষ্ঠু বিন্যাসের মধ্যে একটা খবরদারী ভাব থাকে, কিন্তু শৃঙ্খলার মধ্যে তা থাকে না। কেননা, শৃঙ্খলা বাইরের জিনিস নয়। নান যথার্থই বলেছেন—"Discipline is not on external thing, like order, but something that touches the inmost springs of conduct. It consists in the submissoin of one's impulses and powers to a regulation which imposes form upon their chaos, and brings efficiency and economy where there would otherwise be ineffectiveness and waste." অর্থাৎ শৃঙ্খলা ব্যবহারের সূক্ষ্ম আভ্যন্তরীণ দিককেই স্পর্শ করবে যা শিক্ষার্থীদের সমস্তপ্রকার আবেগ ও শক্তিকে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রেহাই দিয়ে একটা শৃঙ্খলার সূত্রে গ্রথিত ক'রে তুলবে—যার ফল হোলো ক্ষমতার দক্ষতা অর্জন।

'শৃঙ্খলা' কথাটি পারিভাষিক অর্থে বোঝায় আমাদের ভাবধারা, ইচ্ছা, আবেগ প্রভৃতির অধীনস্থ করণ এবং বাধানিষেধের গণ্ডী টেনে কিছু কিছু নির্বাচিত কাজকে সঠিকভাবে পরিচালন। বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে 'শৃঙ্খলা'' অর্থে শাস্তি ও পুরস্কারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যবহারকে পরিচালনা করা। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা অর্জন মানেই বোঝায় এমন কতকগুলি অবস্থার সৃষ্টি যাতে ক'রে বিদ্যালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। যাতে শিক্ষার্থীরা রীতিমত

পাঠ শিখতে পারে, তাদের স্বভাবচরিত্র, কার্যাবলী, নৈতিক ও মানসিক শিক্ষা প্রভৃতি সঠিকভাবে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত হয় সেজন্য বিদ্যালয়ের নিজস্ব রীতিনীতি ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ।

শৃঙ্খলা সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিকরা নানাধরনের মত পোষণ করলেও আমরা প্রধানত ছুটি মতকেই খুব বেশি ক'রে দেখতে পাই। এক দলের মতে শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনতে হবে 'স্বাভাবিক ভাবে-যাতে তাদের স্বভাব স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে প্রকাশলাভে সুযোগ পায়, শিশু স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে বা মুক্তি অর্জন করতে পারে। স্বভাববাদীদের এই মতকে আমরা expressionism বা emancipationism আখ্যা দিতে পারি। রাগবী, অর্নল্ড ও থ্রিং এই মতের সমর্থক। আর একদল বিশ্বাস করেন যে, শক্ত শাসন ও শাস্তি বিধান করতে হবে শিশুদের শৃঙ্খলাব মধ্যে করায়ত্ত ক'রে রাখার জন্য। কিন্তু শেষোক্ত মত শিশুদের মধ্যে ভীতিব সঞ্চার করে—ভালোবাসা সঞ্চার করে না। বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাকে স্বাভাবিক ক'রে তুলতে হ'লে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বই যথেষ্ট কার্যকরী হযে উঠে। এইজন্য অনেকে Free discipline নীতির কথা বলে থাকেন। শৃঙ্খলা চাপিযে দেওয়া হলে তার ফল মারাত্মক হয়। কিন্তু, যদি অভ্যন্তর থেকে শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা জাগিয়ে তোলা হয সযত্নে, তবে দেখা যাবে, তাতে ফল ভালোই হয়েছে। শিক্ষক সব সময় দেখবেন যাতে ক'রে শিশুর ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাবোধে একটুও না আঁচড় লাগে। তবে একথাও ঠিক যে, বিদ্যালয়ে যদি কোনো বাঁধন না থাকে এবং নিযমশৃঙ্খলা অন্তঃসারশূন্য হয তবে তার ফল হয় মারাত্মক। শিশুকে সব সময় দেখতে হবে—যাতে ক'রে কোনো অসামাজিক প্রভাব ছাত্রদের জীবনকে প্রভাবান্বিত না করে। সেইজন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমন অনুকূল ব্যবস্থা গডে তুলতে হবে যাতে ক'রে কিছুটা শাস্তি, কিছুটা শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাব, কিছুটা স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ—এই তিনটি ধারার সুষ্ঠু-প্রয়োগ সম্ভব হয়। দেখতে হবে শিক্ষার্থীরা যাতে ভালো জিনিস গ্রহণ করতে পারে। তাদের মনের মধ্যে একটা পুরস্কারের আশা জাগিয়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি দেখতে হবে তারা যেন কর্তব্যপরায়ণ হয়। সবসময় দেখতে হবে যে, শিক্ষার্থীরা তাদের সম্মানজনক কাজের জন্য নানাভাবে পুরস্কৃত হচ্ছে এবং মন্দ কাজের জন্য নিন্দিত হচ্ছে। শিশুর প্রতি দৈহিক

শাস্তি প্রয়োগ আধুনিক শিক্ষাবিদগণ দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় নিন্দা করেছেন। বিদ্যালয়ের কর্মসূচী এমনভাবে গ'ড়ে তুলতে হবে—যেখানে শিক্ষার্থীরা সব সময় একটা-না-একটা কাজে মশগুল থাকে। যদি কোন কারণে শেষ অস্ত্র হিসেবে শাস্তি প্রয়োগ অনিবার্য হয়, তবে তা যেন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে সংশোধনমুখী হয়। বার্টাণ্ড রাসেল যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন—"Right discipline consists not in external compulsion, but in the habit of mind which leads spontaneously to desirable rather than undesirable ends" অর্থাৎ সত্যিকার শৃঙ্খলা বাইরের বাধ্যবাধকতা থেকে আসে না—তা'আসে সঠিক মনের অভ্যাস গঠন থেকে যা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎকৃষ্ট পরিণতির পথে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত ক'রে নিয়ে যাবে এবং মন্দপ্রভাব থেকে বিরত করবে।

বিদ্যালয়ে কঠোর শৃঙ্খলার নীতির কথা মধ্যযুগের শিক্ষাবিদ্ একুয়িনস বলেছিলেন। আবার প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে কেহ কেহ বয়স্কদের ভব-ভাবনা অনুকরণ করাকেই শৃঙ্খলার আদর্শ ব'লে গ্রহণ করেছিলেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ রুশো শিশুর মনকে সর্বপ্রকার কলঙ্কজনক অবস্থা থেকে মুক্ত ক'রে স্বাধীন উন্মুক্ত নীতিরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী, জন ডিউঈ প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা শিশুর কর্মের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা আনয়নের চেষ্টা পেয়েছেন। জন ডিউঈ বলেছিলেন—"The growth of the child in the direction of social capacity and service, his larger and more vital union with life becomes the unifying aim, and disciplin , culture and information fall into place as phases of this growth." অর্থাৎ শিশুর বিকাশ যদি সামাজিক ক্ষমতা ও সেবার পথ ধরে চলে, যদি জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে সংস্কৃতি, শৃঙ্খলা প্রভৃতি তার বিকাশের পক্ষে অনুকূল হ'য়ে থাকে। মন্তেসরী বলেছিলেন—"Real discipline does not aim at reducing children to immobility in the class-rooms like rows of butterflies transfixed with a pin. Such children are not actually disciplined but anihilated." অর্থাৎ সত্যিকার শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীকে আলপিনে আবদ্ধ প্রজাপতির মতো শক্তিহীন করে তোলে না। সেইজন্য ভালোবাসার মধ্যে দিয়েই শৃঙ্খলা আনতে হয়। পোস্টালজী বলেছিলেন—"Discipline must be based on and controlled by love."। আডুলস্ হ্যাক্সলি বলেছিলেন যে, সত্যিকার শৃঙ্খলার অনুসরণ করতে হ'লে

চাই নিজেকে আয়ত্ত করবার কায়দা জেনে নেওয়া—"...to teach people the art of being free and governing themselves."। মানুষের মধ্যে সবসময় এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিতে হবে যে, সে নিজেদের গড়া আইনকানুনকেই অনুসরণ করে চলছে। গ্রীন তাঁর "Principles of Political Obligation" নীতি সম্পর্কে বলেছেন 'will' এর কথা,—'force' এর কথা নয়। তিনি বলেছেন—"That man is free who is conscious of himself as the author of the law which he obeys."। আর এই বোধটি জাগিয়ে দিতে পারেন শিক্ষক; কেননা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব শিশুর উপর খুব বেশি ক্রিয়াশীল হয়। অ্যাডামস্ বলেছেন—"The term personality mainly always implies a reference to the way in which the individual concerned reacts upon other individuals. A man of strong personality is one who has a marked influence upon his fellows." সেইজন্য প্রয়োজন সংস্কৃতি ও শৃঙ্খলার। কেননা, এর মধ্য দিয়েই শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে রুচিশীল ও স্বাস্থ্যপ্রদ ভাবধারা অনুপ্রবেশ করিয়ে দিতে পারেন। হার্বার্ট শৃঙ্খলার উপযোগিতা স্বীকার ক'রে বলেছিলেন—"Discipline is the means where by children are trained in orderliness, good conduct and the habit of getting the best out of themselves." এইজন্য পুরাতন রূঢ় শৃঙ্খলার পরিবর্তে বর্তমানে আত্ম-শৃঙ্খলা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়। শৃঙ্খলা সম্পর্কে জন ডিউঈ যে প্রযোগবাদী নীতির কথা বলেছেন, তা ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা অর্জনের কথা নয়, তা হোলো সামাজিক শৃঙ্খলা আনয়নের কথা। তিনি বলেছেন—"Discipline means power at command; mastery of the resources available for carrying through the action undertaken." একজনের ক্ষমতার স্বাভাবিক অনুশীলনের মধ্য দিয়েই যথার্থ সামাজিক ও ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা আনয়ন সম্ভব। এই প্রসঙ্গে আমরা ইংলণ্ডের Norwood Committee-র রিপোর্ট থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করতে পারি: "There are three elements which are essential to good education. ...these elements, which in our view are more than subjects, because in one form or another, they run through almost every activity, intellectual or other; which a school fosters, are (i) the training of the body, (ii) the training of the character, and (iii) the training in habit of clean thought and clear expression." অর্থাৎ শরীরের শিক্ষা, চরিত্রের শিক্ষা এবং স্বচ্ছ ও

সুস্পষ্ট প্রকাশের অভ্যাস—এগুলি যে-কোনো কাজেরই নীতি হওয়া উচিত—যা বিদ্যালয়ে চর্চা করা সম্ভব। আর, এগুলি যদি সঠিকভাবে মেনে নেওয়া হয়, তবে শিক্ষা ও শৃঙ্খলা অভিন্ন আকারেই আত্মপ্রকাশ করে।

ভারতে শিক্ষা পুনর্গঠন যখন চলছে, তখন শিক্ষায় বিশৃঙ্খলা কেন দেখা দেয়—এ প্রশ্ন নিয়েও শিক্ষাবিদ্‌রা মাথা ঘামাচ্ছেন। ছাত্র-বিশৃঙ্খলার যে সমস্ত অস্থায়ী কারণ রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে অনেক শিক্ষাব্রতী নানা কারণ অনুসন্ধান ক'রে তার প্রতিকারের পথ নির্দেশ করেছেন; কিন্তু সমস্যার গভীরতম প্রদেশে আরো পর্যালোচনা ক'রে দেখা দরকার এই শ্রেণী-বিশৃঙ্খলার পশ্চাতে কি কি সুদূরপ্রসারী কারণ নিহিত রয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এইজন্য শৃঙ্খলার প্রকৃত স্থান কি, তা' আমাদের জানা প্রয়োজন। আর, এ জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে শিক্ষার সত্যিকার উদ্দেশ্য কি। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখলে শিক্ষা আমাদের সমাজের শিক্ষার্থীদের সত্যিকার গ'ড়ে তোলা বা তাদের গঠন করাকেই মুখ্য উদ্দেশ্য ব'লে গ্রহণ করে, আর যাতে শিক্ষার্থীরা সত্যিকার সমাজের উপযোগী হতে পারে ও সমাজের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতভাবে তাদের হাতে পৌঁছুতে পারে—এটা দেখা। এই অর্থে শিক্ষা মানুষের সমাজের উপযোগী এক বিশিষ্টধরনের কর্মপ্রেরণা যোগায়। ব্যক্তিগতভাবে দেখতে গেলে শিক্ষা ব্যক্তিকে তার অন্তর্নিহিত যে-সমস্ত সম্ভাবনা আছে তা বিকাশের জন্য উপযুক্ত আবহাওয়া এনে দিতে সাহায্য করবে—যাতে ক'রে তার সুপ্তশক্তির যথার্থ-বিকাশ সম্ভব হয়। শিক্ষকের কাজ হবে অভীপ্সিত পথে এই স্বাভাবিক বিকাশটাকেই উদ্বোধিত ক'রে তোলার উপায় ব'লে দেওয়া এবং শিক্ষার এই সামাজিক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য গ'ড়ে তোলা।

একমাত্র মানুষ ছাড়া বিবর্তনের পর্যায়ে কোথাও পরিপক্কতার বিকাশ ও শিক্ষা দীর্ঘমেয়াদী নয়। একমাত্র মানুষ ছাড়া কারো পক্ষে সজ্ঞান ভাবে, সুসংগঠিত ভাবে প্রাকৃতিক বিকাশ ও পরিপক্কতায় হস্তক্ষেপ আর কোথাও দেখা যায় না। একমাত্র মানুষের জন্যই বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনে সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান দরকার হয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রে—এমন কি আদিম সমাজেও কোন-না-কোন প্রকার বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। আদিম সমাজে আমরা দেখেছি গোষ্ঠীর সম্মতি রক্ষার প্রচেষ্টা—ফলে সেখানে সৃষ্টিশীল স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়েছে গোষ্ঠীপ্রাধান্য রক্ষার দাবির

নিকটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আন্তর্গোষ্ঠিক সম্পর্কের জন্য সংস্কৃতির যোগাযোগ গ'ড়ে উঠেছে এবং জটিল সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা গ'ড়ে উঠেছে। আধুনিক পর্যায়ের সমাজে আমরা দেখছি একদিকে পুরাতন কৃষ্টিকে বজায় রাখার প্রচেষ্টা, অন্যদিকে নতুন নতুন চিন্তাধারা সৃষ্টির জন্য উৎসাহ। আধুনিক শিক্ষা সমস্যায় তাই এই নতুন ও পুরাতন শক্তির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য গ'ড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আধুনিক শিক্ষায় শৃঙ্খলারক্ষার প্রশ্নটি এই বিষয়ের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। সংরক্ষণশীলতা ও স্বাধীনতা (Conformity and Freedom)—এ দু'টো জিনিস আপাত বিরোধী বা বিপরীতধর্মী মনে হ'লেও এরা বিরোধী নয় বরং পরস্পরের পরিপূরক। যে শিক্ষাশৃঙ্খলা শুধুমাত্র প্রাচীনতাকে আঁকড়ে রাখতে চায় কিংবা শুধুমাত্র নতুনকে উৎসাহিত ক'রে তুলতে চায়, সে শিক্ষা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। স্বাধীনতা প্রয়োজন; কিন্তু আবার যখন সেই স্বাধীনতা সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন তা শিক্ষানীতিরই বিরোধী হয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি যুবশিক্ষার্থীকে অভীপ্সিত পথে পরিচালনা করা, তবে যে শিক্ষার্থী নিজের খেয়ালবশে স্বাধীনভাবে চলতে চায় বুঝতে হ'বে তার শিক্ষার প্রয়োজন সত্য সত্য নেই! যেখানে বিদ্যালয়ে অফুরন্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা গেছে কোন সুনিশ্চিত লক্ষ্য নিয়ে কাজ করা যায় না। আবার যেখানে বাঁধাধরা পুরাতন রীতি মেনে চলা হচ্ছে সেখানে শারীরিক, মানসিক ও ভাবগত বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কর্মসূচী মেনে চলা, পুনরাবৃত্তিকে নীতি হিসেবে গ্রহণ করা প্রভৃতি পুরাতন পদ্ধতিগুলো সৃজনশীল নীতির একেবারে বিরোধী নয়। সেগুলোকে গানে-নাচে-কথায় রূপান্তরিত ক'রে নতুন যুগোপযোগী ক'রে সম্পূর্ণ নতুন কায়দায় তাকে রূপান্তরিত ক'রে তোলা যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার একটা সদর্থক দিক আছে—তা হোলো আত্মশৃঙ্খলাবোধ আনয়ন এবং তা আনতে গেলে প্রবৃত্তিগত আবেগ-উদ্দীপনাকে যথার্থ পথ দেখিয়ে একটা আদর্শগত উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা প্রয়োজন। শিক্ষার বাস্তবক্ষেত্রে প্রকৃত শৃঙ্খলা আনতে হ'লে এই শৃঙ্খলাকে অভ্যন্তর থেকেই আনয়ন করতে হবে! শৃঙ্খলাকে যখন আমরা এই আত্মশৃঙ্খলার দিক দিয়ে না ভেবে শুধু বাহিরের দিক থেকে চাপিয়ে দিই, তখনই যত জটিলতা দেখা দেয়। একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, শিক্ষার্থীরা রুটিন বা প্রাচীন সংরক্ষণ রীতিকে একদম অপছন্দ করে। তারা তা অপছন্দ করে তখনই—

যখন নির্দয়ভাবে তাদের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয়। তারা একই ধরনের গান, একই ধরনের খেলা, একই ধরনের বাঁধাধরা ছকগুলিকে অপছন্দ করে যখন তারা আর সেগুলিতে আনন্দ পায় না। তখন তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও অসন্তোষের কারণ দেখা দেয়। যখন অভ্যাসের আকারে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ তারা পায় না, তখন তাদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আমাদের দেশে শৃঙ্খলার অভাবটা বাড়ী থেকেই তৈরী হ'য়ে যায়। ফলে, বিদ্যালয়ে এসে তাদেরকে সুসংগঠিত অভ্যাসের আওতায় আনা বড়ো কঠিন হ'য়ে পড়ে। কিন্তু একথাও সত্যি, এমন দিনের জন্য অপেক্ষা করা যায় না—যখন ভারতের সমস্ত পরিবারের মধ্যেই একটা শৃঙ্খলা গ'ড়ে উঠেছে। এজন্য বরং আমাদের চেষ্টা করতে হবে কিভাবে parent-craft-এর শিক্ষা অভিভাবকরাও পেতে পারেন।

এবার আমরা ইদানীং স্কুল-কলেজে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করবো। আজকের দিনে শুধু ভারতবর্ষে নয়, সারা পৃথিবীতে লক্ষ্য সম্পর্কে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। সমাজ লক্ষ্যচ্যুত হয়েছে। মূল্যবোধের মান নেমে গেছে। সমাজের গভীর ক্ষত যতক্ষণ না দূর হচ্ছে, ততক্ষণ শিক্ষার্থীদের কোনো এক সুষ্ঠু শৃঙ্খলার মধ্যে আনা সম্ভব হচ্ছে না। সমাজের আদর্শ নিয়েও আজ গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের ধারণা পোষণ করা হচ্ছে। আর, শিক্ষকদের মধ্যে আদর্শ নিয়ে যে মতান্তর—তার প্রভাব এসে পড়ছে ছাত্রদের উপর। শিক্ষকদের সেজন্য তাঁদের নিজেদের বিশেষ মতামত সত্বেও একটা অদলীয় মনোভাব গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। এমন কথা আজ অজ্ঞাত নেই যে, অনেকক্ষেত্রে শিক্ষাসংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার জন্য শিক্ষক-সম্প্রদায়ও দায়ী। অনেক সময় সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিবিধ আদর্শের সংঘাত ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে আদর্শচ্যুত করছে। তার উপর অর্থনৈতিক জীবনে অস্থিরতা ও চঞ্চলতা সমাজ-মনকে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে। যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, সেখানে ছাত্রদের মধ্যে শৃঙ্খলা আশা করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোনো অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করা হয়। শিক্ষকদের মধ্যে অপেশাদারী মনোভাব না থাকাই যুক্তিযুক্ত। মাহিনা কম, চাকুরীর নিরাপত্তা নেই—এই সমস্ত অজুহাতে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত করার অধিকার শিক্ষকের নেই। কেননা, এই ধরনের আচরণ করা মানে

জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। "Student Indiscipline" নামক এক পুস্তিকায় অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর আমাদের দেশের ও সাধারণভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্র-বিশৃঙ্খলার কারণগুলি তন্নতন্ন ক'রে বিশ্লেষণ ক'রে তা নিরোধের কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত পন্থা নির্দেশ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, শিক্ষকদের নেতৃত্বের আসনচ্যুতি, সমকালীন জটিল অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি, বর্তমান শিল্পব্যবস্থার ত্রুটি, আদর্শ সম্পর্কে মূল্যমান বিনষ্ট হ'য়ে যাওয়া প্রভৃতি ছাত্র বিশৃঙ্খলার মুখ্য কারণ। ডঃ রাধাকৃষ্ণণ গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ছাত্রবিশৃঙ্খলার মুখ্য কারণ তিনটি—(১) ছাত্রদের সঠিক ব্যক্তিত্ব সংগঠন ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণের সুযোগের অভাব, (২) শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের অভাব এবং (৩) বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী ও কর্মধারাকে যুগোপযোগী ক'রে গড়ে না তোলর ফল। শিক্ষা হোলো একটা সক্রিয় দ্বিমুখী পদ্ধতি। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী দু'জনে মিলে এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলে। শিক্ষার্থীরা যা শেখে, তা শুধু শুনে নয়—কাজ করে শিখে। স্থায়ী শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য প্রয়োজন কর্মের মধ্য দিয়ে শিশুদের মধ্যে কতকগুলি ভাবধারা সৃষ্টি ক'রে দেওয়া। যতক্ষণ না আমরা শিক্ষাদানের পদ্ধতিরও একটা মূলগত পরিবর্তন করতে পারি, ততক্ষণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত ভবিষ্যৎ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলারক্ষার সমস্যা আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাবো যে, সেখানে ছাত্রদের সংগঠনগুলো সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বভাবতই Trade union spirit নিয়ে চলতে চান। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে, তাঁর এখনো শিক্ষার্থী। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে trade union নীতি কার্যকরী হতে পারে না; কারণ, এখানে শিক্ষার্থীরা "educand" মাত্র। তবে এ কথা সত্য, ছাত্রদের ন্যায্য দাবি ও অভিযোগ সম্পর্কে শিক্ষাকর্তাদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। আমাদের দেশের ছাত্র সংগঠনগুলোর সংবিধান রাজনৈতিক সংবিধানের মতো। কিন্তু, এ কথা ভুললে চলবে না যে, ছাত্র সংগঠনগুলোর উদ্দেশ্য হবে শুধু সমতা দেখানো নয়, এগুলোর উদ্দেশ্য হবে extra-mural বা Co-curricular activities দেখানো বা আত্মপ্রকাশের সুযোগ দেখানো। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলা সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান ক'রে কতকগুলি সুচিন্তিত প্রতিকারের পথ বাৎলে দিয়েছেন।

বয়ঃসন্ধির চাহিদা অনুসারে শিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করলে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকট সৃষ্টি হোতে পারে না। বয়সের চাহিদা যা, তা সুস্থ ও সমাজসম্মত পথে স্ফুরিত হওয়ার সুযোগ চাই শিক্ষার মধ্যে। তবেই বিদ্যালয়ের মধ্যে শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হোতে পারে।

Questions

1. Discuss the needs of adolescences and their consequent process of development.

2. How effectively students' discipline problem can be tackled ?

References :

1. Percy Nunn—Education : its Data and First Principles.
2. Raymont—The Principles of Education.
3. H. Kabir—Student's Indiscipline.

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষায় ক্রীড়া ও ক্রীড়ানীতির স্থান

(The Place of Play and Play-Way in Education)

মানুষের মধ্যে খেলাধূলা করার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ঝোঁক দেখা যায় ; যেমন দেখা যায় বিভিন্ন জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে। কিন্তু খেলাধূলাকে ঠিক 'প্রবৃত্তি' বা 'প্রবণতা' বলা যাবে কি না এ সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে।

আমরা দেখতে পাই যে, খেলাধূলা এমন একটা জিনিস—যাতে মানুষ ও জন্তু-জানোয়ারেরা আপনার প্রাণের আনন্দে বা আবেগে মত্ত হয়। অভ্যন্তর থেকে এমন এক প্রেরণা আসে, যার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বা খেলাধূলা করে থাকে। তবে, এও দেখা যায় যে, 'প্রবৃত্তি' হিসেবে একক কোনো মনোবৃত্তি এই খেলাধূলার মধ্যে থাকে না—অসংখ্য ধরনের 'প্রবৃত্তি' খেলাধূলার মধ্যে একটা জটিল আকার নিয়ে থাকে। আর দেখা যায়, খেলাধূলা করার প্রবণতা ভেতরের প্রাণপ্রতি শক্তি থেকে এমনভাবে নিঃসরিত হয় যে, তার মধ্যে একটা অস্পষ্ট সুধার স্ফুরণ থেকে যায়—যা পথ খুঁজে ফেরে কোন রন্ধ্র দিয়ে তা বের হবে। পুরনো ধারণা অনুযায়ী খেলাধূলাকে বলা যায় একটা স্বতঃবৃত্ত আনন্দের স্বাধীন বিকাশ যা ঐচ্ছিক মাংসপেশীর কর্মফল। কিন্তু খেলাধূলাকে আমরা শুধুমাত্র ঐচ্ছিক মাংসপেশীর কর্মফল ব'লে ভাবতে পারি না। কেননা, এই ধরনের ধারণা বড়োই একপেশে ধরনের হবে।

এখন আমরা আলোচনা ক'রে দেখবো খেলাধূলা সম্পর্কে আধুনিক ধারণা কি হতে পারে—বিশেষ করে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে। পূর্বে খেলাধূলার কোনো প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হোতো না ; কেননা তখন ধারণা ছিল যে, এগুলি মানুষের জীবনের একটা অসংলগ্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু আধুনিক ধারণায় খেলাধূলার একটা সামাজিক মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। আমরা কাজের মধ্যেই যদি ডুবে থাকি, আর খেলাধূলা না করি, তবে আমাদের কাজের মধ্যে কোনো স্বতঃবৃত্ত আনন্দ থাকতে পারে না। খেলাধূলো শুধুমাত্র শিক্ষা-ক্ষেত্রের কৌশল মাফিক জিনিস নয়, এর মধ্যে লুকিয়ে আছে স্বভাবের নীতি যা বিকাশ ও বৃদ্ধিকে সাহায্য করে—ব্যাহত করে না। খেলাধূলা মানুষের

একটা জন্মগত অধিকার। তাকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অস্বীকার ক'রে যদি আমরা শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষার উপর জোর দিই এবং খেলাধূলার উপযোগিতা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন থাকি তবে আমরা অন্যায় করবো। শিশু খেলাধূলা নিয়ে থাকতে ভালোবাসে। যে শিশু তা করে না, সে তার জীবনের কোনো স্বাদ বা আনন্দ পায়নি বলতে হবে। মানুষ তার আদিম প্রবৃত্তিগত যে-সব বাঁধাধরা কাজ করে তাকে পার্সিনান বলেছেন "সংরক্ষণশীলতা" বলে। কিন্তু খেলাধূলা জিনিসটা একান্তই "সৃষ্টিশীল"। এর পশ্চাতে আছে সৃষ্টির অপূর্ব আনন্দ। ফ্রোয়েবেল তাই যথার্থভাবে বলেছিলেন—"We should not consider play as a frivolous thing. On the contrary, it is a thing of profound significance. By means of play, the child expands in joy as the flower expands when it proceeds form the bud, for joy is the soul of all the actions of that age." অর্থাৎ খেলাধূলাকে একটা বাজে জিনিস মনে করা ঠিক নয়। অপরপক্ষে এর একটা গভীর অর্থ রয়েছে। খেলাধূলার সাহায্যে শিশু তার আনন্দকে বিস্তৃত ক'রে তোলে—যেমন, ফুল কুঁড়ি থেকে নিজেকে প্রসারিত ক'রে তোলে। কেননা এই বয়সে সমস্ত কাজের মধ্যে মূর্ত আত্মপ্রকাশ এর আনন্দের মধ্যে নিহিত। খেলাধূলার মধ্যেই একটা স্বতঃস্ফূর্ত নিশ্চিত আনন্দ লুকিয়ে রয়েছে—যার প্রেরণা অভ্যন্তর থেকেই এসে থাকে, বাহিরের কোনো উদ্দীপনা থেকে তা আসে না। খেলাধূলার মধ্যেই একটা স্বচ্ছ স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ লুকিয়ে থাকে, আর কাজের মধ্যে থাকে সেই কাজের একটা লক্ষ্য বা তাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার একটা লক্ষ্য বা পরিণতি। অর্থাৎ, কাজ মানুষ করে একটা বিশেষ লক্ষ্য বা প্রা. .তি অর্জনের জন্য ; তাই খেলাধূলার মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ থাকে, তা কাজের মধ্যে থাকে না। কাজের মধ্যে একটা চাপিয়ে দেওয়া জিনিস থাকে যা খেলাধূলার মধ্যে থাকে না। খেলাধূলা একটা স্বাধীন স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বয়ংক্রিয় জিনিস, যা মানুষ উদ্দীপনার সঙ্গে ক'রে থাকে। তাই, কাজের চেয়ে খেলাধূলার মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মবিকাশ, আত্মপ্রচেষ্টার সম্ভাবনা থাকে বেশি। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুর স্বাধীন ইচ্ছা ও মননের স্বতঃবৃত্ত প্রকাশ ও প্রবণতা যতটা ধরা পড়ে, এমনটি আর কোনকিছুর মধ্যে ধরা পড়ে না। খেলাধূলার মধ্যে শিশু স্বাধীনভাবে কাজ করবার সুযোগ পায় ব'লে এর মধ্য দিয়ে সে তার কল্পনাশক্তি, স্বাধীন ইচ্ছা, গঠনমূলক ক্ষমতা—সবকিছুকে সঠিকভাবে প্রকাশ করবার সুযোগ

পায়। খেলার মধ্য দিয়ে শিশু নিজেকে যে শুধু প্রকাশ করবার সুযোগ পায় তা নয়, তার মধ্য দিয়ে সে তার মনের অনেক স্থায়ী খোরাকও পেয়ে থাকে। খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশু তার স্বাভাবিক বিকাশ ও প্রবণতা প্রকাশের অফুরন্ত সুযোগ পেয়ে থাকে। এইজন্য অনেকে স্বভাবতই ঠিক কথা বলে থাকেন যে "childhood is playhood"। আর শিলার যথার্থই বলেছেন— "A man is truly human when he plays." অর্থাৎ মানুষ সত্যকারের মানুষ—যখন সে খেলাধূলা করে। এইজন্য ম্যাক্‌ডুগাল বলেছিলেন—"Play is the outcome of the primal libido, a vital energy flowing in the channels of instinct, but over-flowing, generating a vague appetite for movement and finding oulet in any way or all of the motor mechanisms in turn." অর্থাৎ, খেলাধূলা হোলো আদিম প্রাণপ্রেতির প্রকাশ যা প্রবৃত্তির পথে প্রকাশিত হয় না, বরং তা প্রকাশিত হয়ে উঠে এক উদ্বেলিত ধারায় যা—অস্পষ্ট ক্ষুধার আকর্ষণে একগতিমুখীন হয়ে ছোটে আর তার পথ খুঁজে ফেরে যান্ত্রিক কোনো পথ দিয়ে। খেলাধূলা হোলো মানুষের জন্মগত একটা অধিকার—একে শুধুমাত্র একটা শিক্ষাগত 'কৌশল' আখ্যা দেওয়া যায় না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"All work and no play makes Jack a dull boy."। খেলাধূলা হোলো শিশুর মূল উপাদান, যেখানে সে যৌবনের উদ্বেল আনন্দে ও উচ্ছলতায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করে। শিক্ষাগত দিক দিয়ে খেলাধূলা ও কাজের মূল্যকে স্বীকার ক'রে নিয়ে চলতে হবে। যদিও খেলাধূলার একটা স্বাধীন কর্মবৃত্তি ও প্রকাশনার সুযোগ থাকে, কিন্তু কাজের মধ্যে থাকে শুধুমাত্র বাহিরের লক্ষ্য। তথাপি শিক্ষা পরিকল্পনায় কাজ ও খেলাকে এমনভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে ক'রে আমাদের নীতি হবে "যখন কাজ তখন খেলা, আর যখন খেলা তখন কাজ।" শিশুরা নানা ধরনের কল্পনা—জাদু (make-belief) দেখিয়ে থাকে। তারা বাস্তবের উপযোগী অনেক জিনিস কল্পনার জারক রসে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে। যেমন—পুতুলখেলা, বীর সৈনিকের বেশে, সাজা ইত্যাদি। কার্ল গ্রুস বলেছেন যে, শিশুরা খেলার মধ্য দিয়ে বয়স্ক জীবনের অনেক গুরুতর প্রস্তুতি গ্রহণ ক'রে থাকে। বলডুইনও এই মতের সমর্থক। খেলাধূলার এই নীতিকে বলা হয় "anticipatory" বা "rehearsal" নীতি। শিলার বলেছেন যে, শিশুরা যে খেলাধূলা ক'রে থাকে তার কারণ

তারা তাদের অফুরন্ত বাড়তি শক্তিকে বের ক'রে দিতে চায়। স্পেনসার এই মতের সমর্থন করেছেন। এই নীতিকে বলা হয় superfluous বা surplus energy নীতি। জার্মানার বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ল্যাজারাসের মতে, মানুষ খেলাধূলা করতে চায় তখনই—যখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য শিশুরা খেলাধূলা করে কিছু শক্তি আহরণের জন্য। স্ট্যানলি হল বলেছেন যে, খেলাধূলার মধ্য দিয়ে মানুষ চায় তার প্রাচীন পুরুষের কর্মবৃত্তিকে অনুসরণ করতে। এইজন্য এই নীতিকে বলা হয় culture epoch নীতি বা recapitulation নীতি। ম্যাকডুগালের মতে খেলাধূলার মধ্য দিয়ে শিশুরা চায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুঝবার শক্তি আহরণ করতে। একে তিনি আখ্যা দিয়েছেন rivalry নীতি হিসেবে। মনঃসমীক্ষণপন্থীদের মতে মানুষের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি খেলাধূলার মধ্য দিয়ে একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পায়। খেলাধূলা সম্পর্কে এই সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক নীতি থেকে আমরা এই ধারণা গ্রহণ করতে পারি যে খেলাধূলা হোলো মানুষের স্বাভাবিক শিক্ষণ, যাকে বাধা দিয়ে রুদ্ধ করা চলে না—বরং তাকে আরো পরিবর্তিত ক'রে তুলতে হয়। এদিক দিয়ে শিক্ষানীতিতে আমাদের সার্থক প্রচেষ্টা হবে শিক্ষার সমস্ত স্তরে একটা 'খেলোয়াড়ী মনোভাব' গড়ে তোলা। তাই একজন শিক্ষাবিদ যথার্থই বলেছেন— Play is as necessary to the child as food, as vital as sunshine ... [illegible]

Questions

1. Discuss the [illegible] of play.
2. What is the [illegible] in [illegible] of Education?
3. Discuss the [illegible] of play and play way in Primary and Secondary Education.

References

1. Nunn—Education: Its Data and First Principles.
2. Dewey—Democracy and Education.
3. McDougall—Social Psychology.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মালটিপারপাস্ কি ও কেন ?

(Multipurpose Scheme and its Utility)

আমাদের দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সম্প্রতি একটি নতুন পরিভাষার উৎপত্তি হয়েছে—তার নাম 'মাল্‌টিপারপাস্' বা সর্বার্থসাধক বা বহুমুখী বিদ্যালয়। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাস থেকে নতুন পাঠ্যক্রম চালু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাত্র গুটিকয়েক বিদ্যায়তনে এবং আশা করা যায় আগামী তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বা চতুর্থ পরিকল্পনার গোড়ায় সমস্ত স্কুলগুলি 'মাল্‌টি-পারপাস্' হ'তে পারবে। বছরখানেক কি তারও বেশি কেটে গেল, তবুও এর সুদূরপ্রসারী ফল সম্পর্কে শিক্ষাব্রতী জনগণের মনে নানারকমের প্রশ্ন, আশা ও শঙ্কা, ভয় ও বিস্ময় এখনও রয়েছে। তাই, মাল্‌টিপারপাস্ কি ও কেন—এ সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন হয়েছে।

ইংলণ্ডে মাল্‌টি লেটারেল্ জাতীয় একপ্রকার বিদ্যালয় রয়েছে। আমাদের দেশের মাল্‌টিপারপাস্ বিদ্যালয় পরিকল্পনা তারই অন্ধ অনুকরণ কি না, এ সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। আমরা সব কিছুতেই যখন অনুকরণ-প্রিয় এবং অপরে চিন্তা ক'রে না দিলে যখন আমাদের বোধগম্যতা আসে না, তখন বিচিত্র কি, ইংলণ্ডে চালু একটা নিয়মেরই অদলবদল ক'রে এখানে চালু করা হবে—তাছাড়া ইংলণ্ডীয় কাল্‌চারের ধ্বংসাবশেষ দেশের বুক থেকে তো মুছে যায় নি, বরং আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আলোকে তাকে নতুন অর্থে সঞ্জীবিত ক'রে তোলা হচ্ছে। অতএব, মাল্‌টিপারপাস্ পরিকল্পনা ধার করা পরিকল্পনা হ'লেও বৃটিশ মগজপ্রসূত ; অতএব নিতান্তই অভিজ্ঞতামূলক—একটু জাতীয়তাবাদের পোশাক তাকে পরালেই হোলো। নিন্দুকেরা এমন কথা যে বলেন না, তা নয়।

এই পরিকল্পনা শুধু পশ্চিমবঙ্গে চালু হয়েছে বলা ভুল হবে। এটি সর্বভারতীয় পরিকল্পনা। নিখিল ভারত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ (All India Council of Secondary Education) কর্তৃক গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে একে গ্রহণ করা হয়েছে এবং দেশের জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন (National Planning Commission) একে আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতার ব্যবস্থা ক'রে এক বিরাট ইমারতী পরিকল্পনায় একে রূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।

আমাদের দেশ আয়তনে এতো বড় যে, দেশকে একটা জাতীয় পরিকল্পনার মধ্যে আনা খুবই কঠিন ও শ্রমসাধ্য ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু এইখানে ভুললে চলবে না যে, আমাদের অবয়ব অত্যন্ত ছোটো—তাই মাথা গুঁজবার মতো একটু ঠাঁই আর প্রয়োজনমত শীতের বস্ত্র আর পিপাসার জল পেলেই আমরা হাঁপিয়ে উঠে বলতে চাই, প্রয়োজন আমাদের মিটেছে। তা'ছাড়া তো ঋষিবাক্যই আছে—plain living and high thinking। সুতরাং যখন দেখা যায়, ভাগ্যপুষ্ট মাত্র গুটিকয়েক বিদ্যায়তনের অট্টালিকা বা প্রাসাদসম "আর্টহীন বিধবার মতো" ধবধবে সাদা ইঁটের প্রাকার গগন স্পর্শ ক'রে কোথাও কোথাও উঠছে, তখন কেবল মনে হয় ওর ভেতর যে ছোট্ট অবয়বেরা বিরাজ করবে, ওটা তাদের খাঁচা, ঠিক যেন রবীন্দ্রনাথের 'তোতা কাহিনী'-বর্ণিত সোনার খাঁচা! Human materialকে অস্বীকার ক'রে কেবলমাত্র চুন-সুরকির উপর নির্ভর ক'রে যদি জাত গড়া যায়, ভালো কথা; কিন্তু জাতটাকে একটা তথাকথিত Socialistic development-এর ফরমুল্যার আওতায় এনে একি বিরাট সর্বনাশ করা হচ্ছে! কিন্তু কে শোনে সেই কথা। এই পরিকল্পনার সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি হোলো Balanced development-এর অভাব। যেখানে লাখো টাকার একটা স্কুলের ইমারত খাড়া হয়, তারই আনাচে-কানাচে প'ড়ে থাকা অন্যান্য বিদ্যালয়গুলো ভাগ্যহীন হ'য়ে গোশালায় পর্যবসিত হয়! স্বাধীন গণতন্ত্রের মধ্যে এমন এক জাতীয় সর্বনাশা দলীয় নীতির সংক্রমণ হয়েছে, যার হাত বিদ্যায়তনের ভেতরে গিয়ে পড়েছে বলা যায়। অনেক দেরি ক'রে জহরলালজী সেদিন বলেছেন যে, প্রয়োজন হ'লে বিদ্যায়তন গাছের তলায় হলেও ক্ষতি নেই। এই ধরনের ছোটখাটো পরীক্ষা দেশের ছোটবড় শিক্ষাবিদ্‌গণ আগেও করেছেন—কিন্তু, তাকে পাগলামি ব'লে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু, হ'লে কি হবে? ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকায় গড়ে-ওঠা ইমারতগুলি জোঁকের মতো অর্থ শোষণ ক'রে নিয়েছে। অগাধ টাকায় গড়া বিদ্যালয়গুলোর একটা সুশ্রী বিকাশ গড়ে উঠবে, সে আশা করা নিছক পাগলামি।

মাল্টিপারপাস্ বিদ্যালয়গুলি নির্বাচনের ক্ষেত্রে চারটি নীতি গ্রহণ করা হয়েছে ব'লে সরকারী বিজ্ঞপ্তি আছে। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আঞ্চলিক বিচার, পরীক্ষার ফলাফল, বিদ্যালয়ের শাসনগত যোগ্যতা প্রভৃতিই হবে এই নির্বাচনের মাপকাঠি। একই প্রকার আর্থিক আনুকূল্যে সমস্ত স্কুল যখন উন্নীত করা যাবে না, অতএব বিচারের মাপকাঠি দিয়ে বাছাই করা হবে—কোন্‌গুলো

যোগ্যতর বিদ্যালয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, আঞ্চলিক বিচার প্রভৃতির নামে একদিকে, সুনিপুণ কৌশলে শিক্ষা-সংকোচের ব্যবস্থা চলেছে অন্য দিকে ঢাক পিটিয়ে বলা হচ্ছে শিক্ষার মান উন্নীতকরণই এর উদ্দেশ্য। খালি চোখে ধরা পড়ছেও তাই। ইণ্টারমিডিয়েটের সঙ্গে বর্তমান উচ্চবিদ্যালয় পুরোপুরি যুক্ত হওয়াতে এই স্তরের শিক্ষার মান বাড়ানোর চেষ্টা হয়েছে সুনিশ্চিত, কিন্তু এই স্তরে পৌছানোর পূর্বেই সুকৌশলে শিক্ষা সংকোচের ব্যবস্থা হয়েছে। আর জুনিয়ার মান অতিক্রম ক'রে যারা উচ্চতর ক্ষেত্রে পৌছাল তাদের বৃত্তি নির্বাচনের ব্যবস্থায় এমন এক আঞ্চলিক অসুবিধা ঘটানো হয়েছে—যাতে ইচ্ছা বা রুচি অনুসারে বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রটা এক অর্থনৈতিক গোলকধাঁধায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছে। এর psychological দিকটা তাই লক্ষণীয়। ধীরে ধীরে সমাজে বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগ করার নামে বৃত্তি নির্বাচনের এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ব্যবস্থা হয়েছে। দেখা গেছে, একটি জেলার মধ্যে মাত্র দু'একটা বিদ্যালয় হয় বিজ্ঞান, না হয় কৃষি, না হয় টেকনিক্যাল, না হয় কমার্স পেয়েছে—কিন্তু আঞ্চলিক অসুবিধা অতিক্রম ক'রে বৃত্তি নির্বাচনের সুযোগটা কি ক'রে তাতে সম্ভব হবে বুঝতে পারছি না।

এই পরিকল্পনার একটা কারচুপি কথা হোলো, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৃত্তি নির্বাচনের পর্বটা শেষ ক'রে ফেলতে হবে। ফলে, বিজ্ঞান যারা ঐচ্ছিক (Elective) হিসেবে নেয়নি, তাদের ভবিষ্যতে বিজ্ঞান পড়বার সুবিধা থাকবে না। অথচ পূর্বে দেখা গেছে, দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান না নিয়ে ছাত্ররা আই. এস. সি. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে ভালো নম্বর পেয়ে ভবিষ্যতে বৃত্তি নির্বাচন করেছে। নতুন ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান যখন বাধ্যতামূলক ভাবেও একটা বিষয় হিসেবে রয়েছে, তখন ডিগ্রী কোর্সের সময় 'লাইন' পরিবর্তনের ইচ্ছা বা ঝোঁক থাকলে সে সুযোগ কেন দেওয়া হবে না, তা বুঝতে কষ্ট হয় আমাদের। আধুনিক নির্বাচনের যে সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক পরিমাপ বের হয়েছে, Expert-মণ্ডলী নিয়োগ ক'রে বৃত্তি নির্বাচনে সহায়তা করার কোনো সুনিশ্চিত পরিকল্পনা তার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই না, অথচ পাশ্চাত্ত্যে Vocational guidence-এর যথেষ্ট utility দেখা গেছে।

অনেক বিদ্যালয় যেখানে শুধুমাত্র Humanities পেয়েছে, সেখানে সমস্যা দেখা দিয়েছে আরো গভীর রকমের। শুধুমাত্র Humanities পড়ে কি হবে, এই জাতীয় clamour খুবই তীব্র। কিছু কিছু আর্থিক সঙ্গতিপন্ন ছাত্র বিজ্ঞান

প্রভৃতি পড়বার জন্য অন্যত্র যাচ্ছে, কিছু কিছু অনিশ্চিয়তার দরুণ নবম শ্রেণী থেকেই দশম শ্রেণীর বিদ্যালয়ে চলে যাচ্ছে—আর যারা রয়ে গেল, তাদের মুখে গভীর বিষাদের ছায়া। বৃত্তিকরী শিক্ষার Pre-vocational bias যদি এই স্তরের শিক্ষাপদ্ধতির কারণ হিসেবে নিহিত থাকে, তবে অন্ততঃপক্ষে ৭টি শিল্প (craft) বিষয়েই প্রতিটি বিদ্যালয়ে (কি Higher Secondory, কি Multi Purpose, কি দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়ে) পূর্বাহ্নে ব্যবস্থা করতে পারিলে ভালো হয় এবং তার জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করলে এবং সেজন্য Store-Room গ'ড়ে তুললে দেশের আর্থিক কাঠামো পুনর্গঠনে যেমনি সাহায্য হোতো, তেমনি ছাত্ররাও নিছক পুঁথিগত শিক্ষার আওতা থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো। আর প্রতি বিদ্যালয়েই কম-বেশী Science, Agriculture, Commerce প্রভৃতি বিষয়গুলোর একটা ব্যবস্থা থাকলে ভালো হোতো।

এই প্রসঙ্গে শিক্ষক সংগ্রহের অসুবিধা দেখা দিয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবহারিক ত্রুটিগুলো স্বীকার করে নিলেও শিক্ষক সংগ্রহের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভালো ক'রে চিন্তা করা হয়নি। সারা দেশে উপযুক্ত শিক্ষকদের যোগ্যতার ভিত্তিতে প্যানেল হওয়া যুক্তিসঙ্গত—সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে তাদের অদল-বদলের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন। ক'লকাতার একটা স্কুলেই পঁচিশ জন এম. এ. হয়তো ভীড় করে রয়েছেন সামান্যতম বেতনে, কিন্তু তাঁরা বাধ্যতা-মূলক নীতির আওতায় এলে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা সংকট দূর হোতো। তাছাড়া যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচনে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দরকার ছিল। অন্যান্য প্রদেশের মতো এবং 'মুদ কমিশন'-বর্ণিত হেড মাস্টারদের 'প্রিন্সিপ্যাল' আখ্যা দিয়ে 'জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক' ও ট্রেনিং কলেজের সিনিয়র অধ্যাপকদের সমান চাকুরীর শর্ত ঠিক করলে এই পদে অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন যুবক আকৃষ্ট হ'তেন। উচ্চতর বিদ্যালয়ে 'অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি করে সেখানে বর্তমান ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপকদের সমান মাহিনার হার এবং টেক্‌নিক্যাল শিক্ষক প্রভৃতির জন্য আরও উচ্চতর মাহিনার হার প্রবর্তন করলে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় এই দিকে আকৃষ্ট হবে। এম-এ (দ্বিতীয় শ্রেণী), বি-টি. ব্যতীত উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধানের যোগ্যতা কোনক্রমেই বি-এ, (অনার্স), বি-টি হওয়া উচিত নয়। অধ্যাপক নির্বাচনের ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর এম-এ-বি-টি, বি-এ (অনার্স)-বি-টি এবং বি-এ, বি-টি দশবৎসরের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সমান যোগ্যতা নির্ধারণ যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু অনার্স ও

এম-এ-কে এক পর্যায়ভুক্ত করার ব্যবস্থা ক'রে মুড়ি-মুড়কির এক দাম করা হয়েছে, যা হাস্যকর সন্দেহ নেই। তাছাড়া, বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রে যাঁরা অধ্যাপনা করেন, তাঁদের যোগ্যতা এম-এ (দ্বিতীয় শ্রেণী)। উচ্চতর বিদ্যালয়ের মান যখন ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে, তখন অন্ততঃ এম-এ (তৃতীয় শ্রেণী)র নীচে কোনো 'অধ্যাপক'-কেই একাদশ শ্রেণীতে পড়াতে দেওয়া উচিত হবে না।

উচ্চতর বিদ্যালয় পরিদর্শনের নিয়মও পরিবর্তিত হইয়া বাঞ্ছনীয়। একমাত্র উচ্চতর বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের ক্ষেত্রে একটি "এডভাইসরী পরিদর্শক মণ্ডলী" কর্তৃক ভ্রাম্যমান কায়দায় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত। Co-operative leadership-এর নীতি এই ক্ষেত্রে গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই পরিদর্শকমণ্ডলী প্রাদেশিক পর্যায়ের হবেন এবং জেলা পরিদর্শকদের কেবলমাত্র জুনিয়ার বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর দৃষ্টিদানের জন্য নিযুক্ত রাখা উচিত। সুখের কথা, বিদ্যালয় উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে জেলা পরিদর্শকদের কিছুই জিজ্ঞাসা করা হয়নি—'রাইটার্স বিল্ডিং', তথা আরো উর্ধ্বতন মহলে ব্যাপারটি নির্ধারিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 'মুদ কমিশন'-বর্ণিত সুপারিশ প্রণিধানযোগ্য। "We are in entire agreement with the view that Inspectors must be persons of high academic attainments ..... and that they should be drawn generally from—(i) Head Masters or Principals of Higher Secondery Schools with a minimum period of 5 years' experience as Principals, and (ii) Senior Lecturers of Training Colleges. We further believe that persons choose for the Inspectorate on this basis should generally not continue in that line for a longer period than, say, 5 years, after which they should revert to their original posts. This will enable a common pool being formed from which Inspectors, Head Masters and Senior Lecturers of Training Colleges, all with experiences, might be recruited?"

—(Pp. 42-43)

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়। ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে আভ্যন্তরীণ দলাদলির জন্য অনেক ভালো স্কুলেরও ক্ষতি হয়েছে। ম্যানেজিং কমিটি তাই যতদূর সম্ভব ছোটো এবং Advisory জাতীয় হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে তা না করে এসব

ক্ষেত্রে 'দে কমিশন'-বর্ণিত সুপারিশ মানাই শ্রেয়। কোনো কোনো বিদ্যালয়ের কমিটির মধ্যে S. D. O. কিংবা মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের সভাপতি ক'রে রাখা হয়েছে এবং তাঁরা figurehead ব্যতীত তেমন কিছু নন। সেই ক্ষেত্রে 'দে কমিশন' বলেছেন—"Managing Committee will elect its President who will not be a figurehead, but one who is ready to help the cause of the school activity. He will be assisted by the Head Master as the Secretary."

উচ্চতর মাধ্যমিক, তথা বহুমুখী বিদ্যালয়ের গ্রাণ্ট-ইন-এড্-ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বর্ধিত মাহিনার হার নির্ধারণে এখনো সুস্পষ্ট নির্দেশ সরকার দেননি, তবে এ ব্যাপারে বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী নীতি নির্ধারণ করতে সক্ষম। কিন্তু, নতুন ব্যবস্থাপনায় স্কুলের Revenue Treasuryতে জমা দিয়ে কেবলমাত্র স্কুল উন্নয়নের জন্য Committee একটা শর্তে টাকা নিয়ে কাজের পরিচালনাদি করবেন, এই ব্যবস্থা হওয়া যুক্তিযুক্ত। শিক্ষকদের মাহিনাদানের ক্ষেত্রে payment by cheque system হওয়া যুক্তিযুক্ত এবং তা সরাসরি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকদের নিকট পৌছুবে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের রিপোর্ট অনুসারে। এজন্য Pay and Accounts অফিস পুনরায় প্রবর্তন ক'রে নীতি নির্ধারণ করলে ভাল ফল হবে। Contented set of teachers তৈরি না করা জাতীয় সরকারের পক্ষে আদৌ গৌরবের কাজ হবে না।

এইবার বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী সম্পর্কে দু'চার কথা বলবো। বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে প্রধানত core subject হিসেবে রয়েছে—ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী, সমাজ-পাঠ, সাধারণ বিজ্ঞান, শিল্প, সাধারণ অঙ্ক এবং তিনটি ঐচ্ছিক বিষয়—এক-একটি group-এর যে-কোন একটির মধ্য থেকে। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, total load বাড়ানো লক্ষ্য নয়, মোটামুটি fundamentals ছেলেমেয়েরা শিখবে। পুঁথিগত মগজের শিক্ষার উপর তাঁরা জোর দেননি আনন্দের কথা। পুঁথিগত শিক্ষা (মগজের শিক্ষা) আমাদের দেশে আশানুরূপ চরিত্রগঠনে সাহায্য করেনি। অতএব নতুন ব্যবস্থাপনায় fundamentals-এর উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং প্রকাশকদের পাইকারীভাবে হত্যা করা হয়েছে। যোগ্য শিক্ষকের হাতে পড়লে বহুমুখী বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী আশাতীত ফলপ্রসূ হোতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে classification of subjects আর একটু

ভিন্ন রকমের হোলে ভালো হোতো। যেমন, Language group, General knowledge group এবং Special knowledge group। Language group-এর মধ্যে ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে একটা সামগ্রিক বিচারের ব্যবস্থা, General knowledge group-এর মধ্যে একটু detailed classification, যেমন, অঙ্ক—বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পরিসংখ্যান ইত্যাদি; বিজ্ঞান—জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি; সমাজপাঠ—ইতিহাস, ভূগোল, সাধারণ জ্ঞান প্রভৃতি। এই General knoledge group-এর মধ্যেও ঐচ্ছিক শিল্প বিষয় গ্রহণের সুবিধা থাকা দরকার। Special knowledge group-এর মধ্যে Elective subject ভুক্ত বিষয় দু'টি এবং তাহার বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থা। এক কথায় এরূপ ব্যবস্থাপনায় choice বা নির্বাচনের সুযোগ পর্ব এতই সুদূরপ্রসারী হোতো, যাতে বর্তমানের total load অপেক্ষা কম load নিয়েও অধিকতর জ্ঞান অর্জন সম্ভব হোতো—এক কথায় বলা যায় Technical efficiency বাড়তো।

পরীক্ষাপদ্ধতির ক্ষেত্রেও সংস্কার ঠিক যুগোপযোগী হয়নি। ছাত্রদের Extra-curricular activities, যেমন—N. C. C, A. C. C., খেলাধূলা, Red cross প্রভৃতির Assessment-এর ব্যবস্থা cumulative record card-এ করা গেলেও এজন্য কোনো credit-এর ব্যবস্থা না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের নিকট এগুলি তেমন কোনো উদ্দীপনা না-ও জাগাতে পারে। অন্তত ১০০নম্বর এইজন্য নির্দিষ্ট থাকা যুক্তিসঙ্গত ছিল। Internal ও External-যে ধরনের পরীক্ষাপদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়েছে তাতে অনেকে আশঙ্কা করেন যে, Internal পরীক্ষা বিদ্যালয়ের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু, এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য অন্যরূপ। Theoretical পরীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে Internal পরীক্ষার উপর নির্ভর করা ভালো। কেবলমাত্র Practical এবং special knowledge group-এর External পরীক্ষা হওয়া দরকার। এক্ষেত্রে Internal পরীক্ষার গড় নম্বরের উপরও নির্ভর করতে হবে।

প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে External পরীক্ষা গ্রহণ না করার নীতি গৃহীত হয়েছে। বলা হয়েছে—"Government do not consider that an external examination is desirable at the end of Class VIII i.e. Junior High School. This is not in conformity with the recommendations of the Central Advisory Board of Education,

nor has this practice been adopted in other educationally advanced countries." (Dey Commission, Preamble, P. IV). উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে Advisory Inspecting Staff-এর সহায়তায় যেসব শিক্ষায়তনে Practical এবং Special knowledge group-এর External পরীক্ষার নম্বরের সহিত Internal পরীক্ষার ফল যোগ করে এবং অন্যান্য factors দেখে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণা করা ভালো। তা'হলে, শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবৎসর human material-এর যে অপচয় হচ্ছে, তা নিবারিত হবে এবং পরীক্ষা নিয়ে উদ্ভূত জটিল সমস্যারও সমাধান হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার একটি নিখুঁত চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এ দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কমিশন অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত খুঁতিয়ে দেখেছেন ঠিক কিভাবে অগ্রসর হ'লে আগামী দিনের মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়ে উঠবে। প্রায় ২৫০ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থের মধ্যে কমিশন শিক্ষার নীতি ও পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে চেয়েছেন—কিভাবে এই স্তরের শিক্ষাকে ফলপ্রদ ও দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রতিবন্ধক হিসেবে গড়ে তোলা যায়।

কি ভাবে এদেশের শিক্ষা খাপছাড়া অংশ হিসেবে কাজ করে, কি ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে, কি ভাবে ছাত্রদের সত্যিকার রুচি ও প্রবণতার দিকে এতদিন দৃকপাত করা হয়নি, কি ভাবে সামান্যতম টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার প্রতি ঝোঁক ছিল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে শিক্ষার দায়িত্ব ও প্রচেষ্টা-বিষয়ে কি সম্পর্ক ছিল ইত্যাদির উল্লেখ ক'রে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটীগুলি চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

কমিশন প্রধানত ১১ থেকে ১৭।১৮ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিয়ে আলোচনা ক'রে দেখাতে চেয়েছেন যে, এই শিক্ষাস্তরের পূর্বে বা শেষে কি কি ধরনের সমস্যা দেখা দেয় এবং কি ভাবে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে 'weakest link'-এর সমালোচনা থেকে বাঁচানো যায়। কমিশন সংবিধানে বর্ণিত ১৪ বৎসর পর্যন্ত বয়সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সমস্যাও পর্যালোচনা ক'রে শেষ পর্যন্ত

দেখিয়েছেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা হবে সাত বৎসরের—তন্মধ্যে অন্তত তিন বৎসর কাটাতে হবে উচ্চবুনিয়াদী বা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে, আর পরবর্তী চার বৎসর উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে। কমিশনের এই সুপারিশ পূর্ববর্তী অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের ধারাকে অনুসরণ ক'রেই করা হয়েছে। আর, এই সুপারিশ গ্রহণ করতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে ঢেলে সাজতে হবে এবং সেজন্য তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

কমিশন উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুমুখী পাঠ্যধারা প্রবর্তনের সুপারিশ ক'রে বলেছেন যে, কতকগুলি বহুমুখী বিদ্যালয় তৈরি করতে হবে—যেখানে কৃষি, শিক্ষা, ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ে অধিকতর জোর দিয়ে পঠন-পাঠন হবে। গ্রামীণ বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ক'রে এ-জাতীয় বিদ্যালয়গুলির তাৎপর্য কমিশন বিশেষভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কমিশন পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য অপরাপর শিক্ষা—যেমন শারীরিক শিক্ষা, সৌন্দর্যগত শিক্ষা, শিল্পগত শিক্ষা, সমাজগত শিক্ষা প্রভৃতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশন আরো দেখিয়েছেন, কিভাবে উচ্চবিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর বিদ্যালয়ে পরিণত ক'রতে হবে এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্ক রক্ষা করে চল্‌তে হবে। কমিশন শুধু যে শিক্ষার ধাপ বা 'ল্যাডার প্যাটার্ন' ঠিক করে দিয়েছেন তা নয়, বিভিন্ন বয়স অনুপাতে ও শক্তিসামর্থ্য অনুযায়ী কিভাবে এক-একটি ধাপ অতিক্রম ক'রে বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রবণতা ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তুলবে সে সম্পর্কেও সুচিন্তিত পরিকল্পনার কথা বলেছেন। পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কমিশন দেখিয়েছেন—কিভাবে উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে কতকগুলি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কমিশন দেখিয়েছেন কি ভাবে ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকে মূল বিষয় বা Core Subjects হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং কিভাবে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে উচ্চ ও উচ্চতর বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর বিভিন্নতা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে কমিশন অবশ্য সাধারণ নীতি নির্বাচন ক'রে দিয়েছেন—যাতে বিভিন্ন প্রদেশে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থানুযায়ী সংশোধনের সুযোগ থাকবে। ভাষাশিক্ষা সম্পর্কে কমিশন মত প্রকাশ করেছেন যে, উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাই হবে শিক্ষার মাপকাঠি; তবে একথাও বলেছেন যে, অন্তত দুটো অতিরিক্ত ভাষা শিক্ষা করতে হবে—তন্মধ্যে একটি হবে বিদেশীভাষা, অন্যটি হবে ভারতের রাষ্ট্র ভাষা। কমিশন এ বিষয়ে ভারত-

সরকারের দুটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মতামত বিবেচনা ক'রে বলেছেন যে, এই সমস্ত ভাষাগুলি পড়াতে হবে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে।

কমিশন দেখিয়েছেন যে, পাঠ্যপুস্তক ও রচনা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক পর্যায়ে যথেষ্ট সতর্কতার প্রয়োজন হবে। মাতৃভাষা শিক্ষার মাপকাঠি হওয়ায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। কমিশন এ জন্য বিভিন্ন পর্যায়ের পুস্তক রচনার ব্যাপারে একটি উচ্চশক্তিসম্পন্ন কমিটির (High Power Committee) কথা বলেছেন—যা বিচারবিভাগীয় সদস্য (সম্ভব হ'লে হাইকোর্টের বিচারপতি), পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, আঞ্চলিক একজন ভাইস্‌চ্যান্সেলার, রাজ্যের একজন প্রধান শিক্ষক, দু'জন মনোনীত শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা অধিকর্তাকে নিয়ে গঠিত হবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষণ ও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে কমিশন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে খেলাধূলার মাঠ-সহ অন্যান্য পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মের উপর জোর দিয়েছেন। ভারত সরকারের উচিত হবে সমস্ত জায়গায় যাতে শারীর-শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকর্তা তৈরির জন্য বিদ্যালয় গ'ড়ে উঠে। এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসা-প্রচেষ্টা ও পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির ব্যবস্থাসহ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রেকর্ড রাখার ব্যবস্থা করতে বলেছেন কমিশন। যাতে ক'রে তাদের সপ্তাহে একদিন ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বিশেষজ্ঞ দিয়ে ছাত্রদের পরীক্ষা করা যায় তারও ব্যবস্থা করতে কমিশন বলেছেন। চিকিৎসা প্রচেষ্টা ও শরীরচর্চার সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখার কথাও কমিশন বলেছেন।

কর্মসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে কমিশন প্রত্যেক বিদ্যালয়কে স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনার অধিকার দিবার কথা বলেছেন। এর ফলে কৃষিপ্রধান দেশে সেই অনুযায়ী বিদ্যালয়সূচী নির্ধারণের যথেষ্ট স্বাধীনতা কমিশন দিয়েছেন। প্রত্যেক বিদ্যালয় সারা বৎসরে ২০০ দিনে কার্যকরী বৎসর এবং প্রতি ৪৫ মিনিটের ঘণ্টানুসারে সপ্তাহে ৩৫ ঘণ্টা কর্মসূচী গ্রহণের কথা কমিশন বলেছেন। এই সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত কর্মসমূহের সুযোগ থাকবে। কমিশন অতিরিক্ত ছুটিদান নীতির সমালোচনা ক'রে বলেছেন যে গ্রীষ্মের বন্ধ দুমাস ও বছরে দু'বার ১০।১৫ দিনের একটানা ছুটি দিবার পদ্ধতিই সবচেয়ে ভালো।

পরীক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিশনের সুচিন্তিত মত এই যে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে রেকর্ড এমনভাবে রাখা হবে—যা শিক্ষার্থীর শেষ মূল্যমানে বা তার

জীবিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। সেইজন্য পাব্লিক পরীক্ষায়ও এই জাতীয় রেকর্ডের মূল্য স্বীকারের নীতি কমিশন স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছেন।

কমিশন বহুমুখী পাঠ্যসূচী নির্বাচনে ছাত্র ও অভিভাবকদের সাহায্যের জন্য Guidance ও Counselling-এর নীতি গ্রহণ করতে বলেছেন। এজন্য কমিশন Career Master ট্রেনিং-এর কথা বলেছেন। এবং তদনুযায়ী বিশেষ ট্রেনিং কলেজ গঠনেরও সুপারিশ করেছেন।

টেক্‌নিক্যাল শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের মত এই যে, শুধু যে উচ্চ বা উচ্চতর বিদ্যালয়ে এই শিক্ষা দেওয়া হবে তা নয়, যারা এই পর্যায় পর্যন্ত আসতে পারলো না, তাদের জন্যও পলিটেক্‌নিক বা occupational institutes খোলার প্রয়োজন। যেমন শিল্পের জন্য craftsman তৈরি করার কথা বলা হয়েছে, তেমনি সমস্ত টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে নবীশী কাজের জন্যও ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। তাছাড়া, কমিশন All India Council of Technical Education-এর কথাও বলেছেন।

কমিশন বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় গড়ে তোলার কথাও বলেছেন—যেমন, আবাসিক বিদ্যালয়, দিবাবিদ্যালয়, পাব্লিক বিদ্যালয়, পরীক্ষামূলক বিদ্যালয় ও বিকলাঙ্গ শিশুদের বিদ্যালয়। কমিশন সহ-শিক্ষা সম্পর্কে ছাত্র ও ছাত্রীদের সমান সুযোগ-সুবিধা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন, তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে Home Scienceকেও গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন।

শিক্ষক-শিক্ষণ সমস্যা সম্পর্কে কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত হোলো দু'ধরনের শিক্ষণ বিদ্যালয় গড়ে তোলা—এক হোলো Secondary School Teachers' Training এবং অন্যটি হোলো Graduate Teachers Training। শেষোক্ত শিক্ষণ বিদ্যালয়কে কমিশন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে রাখার সুপারিশ করেছেন। এ ছাড়া শিক্ষণকাল, পাঠ্য বহির্ভূত কর্মধারার শিক্ষণ এবং রিফ্রেসার কোর্স সংক্রান্ত বিষয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা কমিশন করেছেন। সমস্ত শিক্ষকদের স্টাইপেণ্ড পাওয়া, আবাসিক বিদ্যালয়ে থাকার ব্যবস্থা ইত্যাদির কথাও বলেছেন। এমন কি প্রধান শিক্ষক ও ইনসপেক্টারদেরও ট্রেনিং কলেজের স্টাফের মধ্যে নিয়োগের সুপারিশ কমিশন করেছেন। শিক্ষক সংগ্রহ সম্পর্কে কমিশন অধিকতর বিবেচনার নীতি গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের চাকুরীর নিরাপত্তা চেয়েছেন। সমান যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের একইরূপ বেতনহার প্রবর্তনও এই কমিশনের অন্যতম সুপারিশ। শিক্ষকরা যাতে ত্রিমুখী

সাহায্য অর্থাৎ Pension-Cum Provident Fund-Cum Insurance-এর সুযোগ পান সে ব্যবস্থাও কমিশন করেছেন। শিক্ষকরা যাতে অযথা হয়রানি না পান তজ্জন্য Arbitration Board-এরও ব্যবস্থা সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষকতা পেশাকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য গৃহ-পরিকল্পনা, যাতায়াতের সুবিধা, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার সুবিধা প্রভৃতি অনেক প্রকার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে কমিশন অভিমত প্রকাশ করেছেন।

শাসনগত দিক থেকে কমিশন চেয়েছেন একটি কেন্দ্রীয় কমিটি—যার সভাপতি হবেন শিক্ষামন্ত্রী ও সম্পাদক হবেন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। পরবর্তী পর্যায়ের কো-অর্ডিনেটিং কমিটিতে বিভাগীয় কর্তারা থাকবেন আর চেয়ারম্যান থাকবেন শিক্ষা অধিকর্তা। মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড গঠিত হবে অন্যূন ২৫ জন সভ্য নিয়ে, তন্মধ্যে ১০ জন বিভিন্ন বৃত্তিগত শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ আর শিক্ষা অধিকর্তা হবেন তার সভাপতি। এ ছাড়া, Board for Teacher's Training for Secondary grade এবং Provincial Advisory Board-এর কথাও কমিশন বলেছেন।

বিদ্যালয় পরিচালনা করবেন ম্যানেজিং বোর্ড—যা কোম্পানি আইনে রেজেস্ট্রিকৃত হবে এবং প্রধান শিক্ষক হবেন ex-officio সদস্য। কমিশন প্রচলিত ও নতুন বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা পরিকল্পনা চালুর জন্য বিদ্যালয়গুলিকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে উৎসাহিত ক'রে তোলার কথাও বলেছেন।

বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন, খেলাধুলার মাঠ, বিল্ডিংয়ের টাইপ ও ডিজাইন, যাতায়াতের সুবিধা, মুক্ত মাঠ প্রভৃতির ব্যবস্থা করবার অনেক সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন এই কমিশন

বিদ্যালয়ের জীবনকে সমাজ-জীবনের অধিকতর নিকটবর্তী ক'রে তোলার কথা বলা হয়েছে। বিদ্যালয়ে সুন্দর পাঠাগার গ'ড়ে তুলে স্থানীয় সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

যদিও সংবিধান মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব দিয়েছেন রাজ্য সরকারের উপর, তথাপি এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। কমিশন আমেরিকার পদ্ধতিতে একটি Federal Board of Vocational Education গ'ড়ে তোলার কথাও বলেছেন। শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের জন্য কমিশন রেলওয়ে, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রম প্রভৃতি বিভাগের অর্থবরাদ্দ হইতেও অর্থ সংগ্রহ করতে চেয়েছেন।

এইভাবে কমিশন বিভিন্ন প্রকার বিস্তৃত সুপারিশ ক'রে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের উপর আবেদন জানিয়েছেন সেগুলি কার্যকরী ক'রে তোলার জন্য—যাতে করে মাধ্যমিক শিক্ষা দেশের বর্তমান সমস্যা সমাধানে বিশেষ কার্যকরী হয়ে ওঠে।

Questions

1. What is "Multipurpose ? What are the guiding principles of Multipurpose Schools ?

2. State clearly the merits and demerits of Multipurpose System of Education in India.

References :

1. The Secondary Education Commission's Report.
2. Dey Commission's Report.
3. হরিসাধন গোস্বামী—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

(মাধ্যমিক শিক্ষার বিশেষ সমস্যা)

(Special Problems of Secondary Education)

আধুনিক পরিদর্শন-পদ্ধতি

প্রত্যেক বিভাগেরই পরিদর্শন-ব্যবস্থা আছে। তবে, শিক্ষাবিভাগের পরিদর্শন বৎসরে নিয়মিতভাবে হ'য়ে থাকে। এই পরিদর্শনের সাহায্যে বিদ্যালয় সঠিকভাবে চলছে কি না এবং পাঠ্যপদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে মানা হচ্ছে কি না, ছাত্ররা সত্যিকার কিরূপ লেখাপড়া শিখছে, সরকারী নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে মানা হচ্ছে কি না প্রভৃতি বিষয়ে খুঁটিনাটি দেখা এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য। পরিদর্শনের সময় আরো দেখা হয় যে, শিক্ষকরা কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দ্বারা চালিত হচ্ছেন কি না।

এই পরিদর্শনের সাহায্যে স্কুলকর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের হিসেব খুঁতিয়ে দেখার সুযোগ পান এবং পরিদর্শকরা তাঁদের মূল্যবান জ্ঞান-উপদেশ দিয়ে বিদ্যালয়ের উন্নতির পথ দেখিয়ে দেন। তাঁরা দেখেন বিদ্যালয়ের কার্যাদি যুগোপযোগী হচ্ছে কি না বা শিক্ষার মান সঠিক আদর্শসম্মত কি না। যদিও একথা সত্য যে, এই পরিদর্শন-ব্যবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়; তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এই অসম্পূর্ণ পরিদর্শন-ব্যবস্থাও কার্যকরী ফলদান ক'রে থাকে।

বর্তমানে পরিদর্শন ব্যবস্থা যেভাবে পরিচালিত হয়, তা একঘেঁয়ে এবং পুরানো ধরনের। পরিদর্শনের জন্য যে ফর্ম ব্যবহৃত হয়, তা বহু পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে পরিকল্পিত। নতুন যুগের নতুন চিন্তানুসারে সেই ফর্ম সংশোধিত হওয়া প্রয়োজন। পুরাতন ফর্মের সাহায্যে বিদ্যালয়ের সত্যিকার অগ্রগতি বা তার বিশেষত্ব সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। বিদ্যালয়গুলিরও যথাযথ স্বাধীনতা নেই নতুন চিন্তাধারা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে কোনকিছু কাজ করার। ফলে পরিদর্শকরা কেবলমাত্র দোষত্রুটি অনুসন্ধান করা ছাড়া তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ করতে পারেন না। শিক্ষানীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিদর্শন-ব্যবস্থা গতিশীল হয়নি, ফলে কেবল ছক-বাঁধা পরিদর্শন কোনো কাজের হ'চ্ছে না। বিদ্যালয় পরিদর্শন হবে এই সংবাদ পেয়ে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ শুধু মন ভুলাবার জন্য সাময়িকভাবে তৎপর হন এবং সেই অনুসারে খাতাপত্র প্রস্তুত ক'রে

রাখা, ছাত্রদের পাঠ দেখিয়ে রাখা বিদ্যালয়ে ছবি টাঙ'নো প্রভৃতি কাজ ক'রে ফেলা হয়। ঠিক যেন শিক্ষকরা কোনো একটি পরীক্ষায় বসেছেন—একটা বিচারের দিন আসন্ন। দু'পাঁচ মিনিট শ্রেণীতে শ্রেণীতে বেড়িয়ে পরিদর্শক চান শিক্ষকদের বিদ্যাবত্তা ও পাঠদান সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে। অনেক সময় পরিদর্শকরা নিয়ম মত হাজিরও হন না। হাজির হলেও গতানুগতিক কয়েকটি ধারা অনুসরণ করেই তাঁদের পরিদর্শন শেষ করে ফেলেন। আর, পরিদর্শকের সেই মন্তব্যকে নিয়ে বিদ্যালয়-কর্তৃপক্ষ অনেক সময় অবাঞ্ছিত শিক্ষককে বিদায় দিয়ে ফেলেন। পরিদর্শন সাঙ্গ হ'লে পর বিদ্যালয়ের ছুটি দেওয়ার পালা। পরিদর্শন সাঙ্গ হওয়ার পনের দিন পরে একটা রিপোর্ট আসে এবং তা দিন কয়েকের মধ্যেই সকলে ভুলে যান। তারপর তা খুঁতিয়ে দেখার অবসর আর কারো থাকে না—সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ইংরেজ আমলে এই জাতীয় পরিদর্শনের পশ্চাতে উদ্দেশ্য ছিল কোনো সরকার-বিরোধী প্রচার বিদ্যালয়ে চলছে কি না এবং নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তকে ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে কিছু বলা হযেছে কিনা তাই দেখা। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরিদর্শন-ব্যবস্থার কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আজও হয়নি।

মুদালিয়ার কমিশন পরিদর্শন-ব্যবস্থাব এই সব ত্রুটিবিচ্যুতি অনুধাবন ক'রে কতকগুলি প্রতিকার ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। তাঁবা পরিদর্শককে বলেছেন সত্যিকার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতে। এই কমিশন অভিজ্ঞ শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, অধ্যাপক প্রভৃতিদের মধ্য থেকে পরিদর্শক নিতে বলেছেন এবং পর্যায়ক্রমে তিন থেকে পাঁচ বৎসর কাজ করার পর তাঁদের স্ব স্ব পদে ফিরে যেতে সুপারিশ কবেছেন। বিশ্ববিদ্যালযেব পরিদর্শন কমিটির মতো পরিদর্শক সমিতির মাধ্যমে পরিদর্শনের কথা বলেছেন। কিন্তু এসব ব্যবস্থাও খুব কার্যকরী হবে বলে মনে হয় না। একথা সত্য, পরিদর্শন-ব্যবস্থার কিছুটা সার্থকতা আছে—যদি পরিদর্শকরা "উপদেষ্টা" হিসেবেই আসেন। শিক্ষাব্যবস্থা খুব ফলপ্রদ করতে হ'লে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস বিদ্যালয়ের প্রধানকে দিতে হবে অবাধ অধিকার ও স্বাধীনতা—তিনি বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যাপারে হবেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রগতিশীল কাজের খুঁটিনাটি হিসেব রাখবেন এবং পরিদর্শক সমিতির সঙ্গে শিক্ষকরা এক জায়গায় বসে শিক্ষাসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা করবেন ও

নতুন পরিকল্পনা সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের একটা নিজস্ব নৈতিক মান থাকবে এবং পরিদর্শনের সময় অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন নতুন চিন্তাধারা রূপদানের নীতি নির্ধারিত হবে। প্রয়োজন হ'লে কর্তৃপক্ষও যোগদান করবেন। বিদ্যালয়ের সত্যিকার প্রগতি ছাড়া অন্য কোনো আলাপ আলোচনা এর এক্তিয়ারভুক্ত হবে না। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে তবেই পরিদর্শন-ব্যবস্থা প্রগতিশীল ও যুগোপযোগী হয়ে উঠবে।

পাঠদান নীতি ও প্রণালী

শিক্ষক—যিনি পাঠদান করেন, তাঁকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যকে আগে ভালো করে জেনে নিতে হবে। আজকের দিনের শিক্ষায় 'শিশু শতাব্দীর' কথা বলা হচ্ছে। স্যার জন অ্যাডমসের বহু-ঘোষিত নীতি—'মাস্টার জনকে ল্যাটিন শিক্ষা দেন'—কথাটির মধ্যে আমরা তিনটে জিনিস দেখতে পাই—শিশু, শিক্ষক ও বিষয়বস্তু। শিক্ষার এইতিনটি উপাদানের মধ্যে শিশুই প্রধান। শিক্ষক শিশুকে বিষয়বস্তু শিক্ষা দিয়ে থাকেন। কিন্তু শিক্ষক কি শিশুকে শুধুমাত্র জ্ঞানের তথ্যভাণ্ডার দিয়েই ক্ষান্ত হবেন? শিক্ষাদান আর শিক্ষা তো এক জিনিস হতে পারে না। মন্টেন যথার্থই বলেছিলেন—"Education is much more than instruction"। শুধু পাঠদান করার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ; কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য হ'লো মানুষ গড়ে তোলা বা মানুষের মধ্যে যে অফুরন্ত ব্যক্তিত্ব আছে তাকে উদ্বোধিত করে তোলা। এককথায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'The Infinite Personality of man-কে জাগ্রত করা। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য থেকে শিক্ষাদান বিচ্ছিন্ন হ'লে তার ফল আদৌ ভালো হয় না। সেইজন্য আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষাদানকে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের অভিমুখীন ক'রে তুলতে চান। সেইজন্য শিক্ষককে জানতে হয় Philosophy of Method। প্রণালী আয়ত্ত করতে হ'লে শিক্ষককে, জানতে হবে শিক্ষার্থীর মন আর বিষয়বস্তু। যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মন বা আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক যথাযথভাবে গ'ড়ে তুলতে পারেন, তিনিই হন যথার্থ শিক্ষক এবং সব কিছুই তাঁর আয়ত্তাধীন হয়।

শিক্ষককে হ'তে হবে প্রভূত তথ্যের অধিকারী; আর তিনি সেই তথ্যগুলো এমনভাবে শিক্ষার্থীর মনের নিকট উপস্থাপিত করবেন—যা শিক্ষার্থীর নিকট

হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণবন্ত হয়। শিক্ষকের মনের মধ্যে যে-সমস্ত তথ্য বা জ্ঞান থাকবে, তা যদি বিচ্ছিন্ন বা বিশ্লিষ্ট হয় কিংবা কোনো অর্থপূর্ণ ও ঐক্যপূর্ণ ভাব প্রকাশে সাহায্যকারী না হয়, তবে তা সার্থক ও কার্যকরী হয়ে উঠবে না। শিক্ষকের মনোজগতে তথ্য যদি একটা ঐক্যপূর্ণ আদর্শ মেনে চলে, তবে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষক একটা ঐক্যপূর্ণ জ্ঞান ধরিয়ে দিতে পারবেন। বয়স্করা যে-পদ্ধতিতে জ্ঞানের ঐক্যপূর্ণ সূত্র গ্রহণ করতে পারবে, শিশুরা তা পারবে না বলে শিক্ষাবিদ্‌গণ বয়স্কদের ক্ষেত্রে Logical method এবং শিশুদের ক্ষেত্রে Psychological method প্রয়োগের কথা বলে থাকেন।

এখন প্রশ্ন হোলো মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ও যুক্তিসম্মত পদ্ধতির মধ্যে আসল পার্থক্যটা কি। যুক্তিসম্মত পদ্ধতিটা হোলো এই যে, এর সাহায্যে আমরা শিক্ষার্থীর যুক্তিধর্মী মনকে জাগিয়ে তুলতে পারি, আর মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির সাহায্যে আমরা জানতে পারি শিশুর আসল মানসিক অবস্থাটা। যুক্তিসম্মত পদ্ধতির মধ্যে একটা 'কি হওয়া উচিত' এইরূপ দর্শনগত মনোভাব কাজ করে; কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতির মধ্যে আমরা শুধু দেখি শিশু-মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। যুক্তিসম্মত প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষক বিষয়বস্তুর বিন্যাস ও তা অ'হরণের ক্ষমতা দেখান বা উৎসাহিত ক'রে তোলেন, আর মনস্তাত্ত্বিক প্রণালীর মাধ্যমে শিক্ষক শিশু-মনের প্রকৃতিকে ভালো করে অনুধাবন করতে পারেন।

শিশুশিক্ষায় মনস্তাত্ত্বিক নীতি প্রয়োগ সম্পর্কে নানাবিধ প্রণালী গ্রহণ করা হয়; তন্মধ্যে আমরা দেখেছি ক্রীড়ানীতি, ডল্টন পরিকল্পনা, প্রজেক্ট প্রণালী প্রভৃতি কর্মমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনার সার্থকতা। ছোট ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে যদিও যুক্তিসম্মত প্রণালী কার্যকরী নয়, তথাপি যে-কোন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক মনস্তাত্ত্বিক ও যুক্তিসম্মত প্রণালীর সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করবেন। আমরা "শিক্ষার সংজ্ঞা, বিস্তৃতি ও প্রণালীর" মধ্যে শিক্ষাদান প্রণালীর কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছি।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সম্পর্কে যে-সমস্ত প্রণালী যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে শিক্ষকদের পক্ষে হার্বার্টের Five formal steps নীতি খুবই ফলপ্রদ। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণের কথা বলেছেন—

(১) প্রস্তুতি (preparation)

(২) উপস্থাপন (presentation)

(৩) প্রয়োগ (application)

(৪) সাধারণীকরণ (generalization) ও আত্তীকরণ (assimilation)

(৫) সিদ্ধান্ত (conclusion)।

শিক্ষকগণ তাঁদের Lesson notes এই পাঁচটি নীতি অনুসরণ ক'রে তৈরি ক'রে থাকেন।

দায়িত্বমূলক শিক্ষা

বর্তমান বিশ্বের অশান্তির অন্যতম কারণ হোলো অর্থনৈতিক বৈষম্য। যখন বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যের কশাঘাতে নিষ্পেষিত ও জর্জরিত এবং মাত্র মুষ্টিমেয় মানুষ সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির অধিকারী—তখন সারা বিশ্বে স্থায়ী শান্তি ও রাজনৈতিক স্থৈর্য অর্জন করা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজ্ঞান আজকে মানুষের হাতে যে বিস্ময়কর ক্ষমতা এনে দিয়েছে, তাতে করে তাকে যদি কল্যাণপ্রদ কার্যে নিয়োগ করা যায়, তবে পৃথিবীর পট থেকে দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করা এমনকিছু কঠিন হবে না। এইটে খুবই আশ্চর্যের কথা যে, যখন মানুষ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার সাহায্যে সমস্ত সামাজিক দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য সচেষ্ট হ'তে চ'লেছে, তখনই সে আবার নিজেকে ধ্বংস করার কার্যেও ব্রতী হয়েছে। এইজন্য বর্তমান অবস্থায় শিক্ষকসমাজের উপর এসে গিয়েছে নিদারুণ দায়িত্ব। যদি সমগ্র বিশ্বকে আজ এই বিপদ ও আশঙ্কা থেকে আত্মরক্ষা করতে হয়, তবে চাই এমন এক বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলা—যেখানে কোন জাতি, কোন ধর্ম বা কোন মতই শান্তির আদর্শকে অস্বীকার ক'রে কাজ করতে পারবে না। আজকের দিনে শিক্ষকদের উপর এসেছে এই নৈতিক দায়িত্ব। আজ তাঁদেরকেই দেখিয়ে দিতে হবে যে, সংকীর্ণ দেশপ্রেমের কোনই অর্থ নেই; আর সেই সংকীর্ণতার জায়গায় চাই এক যুক্তিসিদ্ধ ও দায়িত্বশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার পত্তন। আজকের দিনে এইটেই সবচেয়ে জরুরী সমস্যা ও নৈতিক দায়িত্ব যে, বিশ্ব-ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যুক্তির জগৎ—হিংসা-প্রতিহিংসা বা মারামারির জগৎ নয়। যুক্তির জগৎ বা হিংসার জগৎ—কোনটা গ্রহণীয় হবে তাই আজকের দিনে সবচেয়ে বিচার্য যোগ্য সমস্যা।

শিক্ষার কাজ হবে যুব-শিক্ষার্থীদের নতুন দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা। আজকের দিনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠনগুলির কাঠামো এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বিশ্বের ঘটনাবলীর এতই

নিত্য-নতুন পট পরিবর্তিত হচ্ছে, যাতে করে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ব্যক্তিত্ববাদের যুগ শেষ হয়ে গোষ্ঠীর যুগ এগিয়ে আসছে! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মনে সন্দেহ, অবিশ্বাস, সংশয় এত দানা বাঁধছে, যেন মনে হয় ব্যক্তি আজ সারা দুনিয়ার ঘটনার চক্রে আবর্তিত হচ্ছে। আজকের দিনে সমাজের স্বার্থ ও প্রয়োজনের জন্য অনেক সময় ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অনেকখানি অবদমিত করতে হচ্ছে। আজকের দিনে নতুন সামাজিক গড়ন এমন রূপ নিচ্ছে—যাতে করে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পূর্ণ বিকাশের ধারাটি সঠিকভাবে গ'ড়ে ওঠার পথও উন্মুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ করে গ'ড়ে তোলার জন্য চাই সজ্ঞান মূল্যমান। বর্তমানে বিশ্বের পরস্পরবিরোধী সমাজ-ব্যবস্থায় কোন্ আদর্শবাদ বা মূল্যমান জয়যুক্ত হবে তাই হোলো সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। একদিকে সমষ্টির সর্বময় কর্তৃত্বের আদর্শবাদ, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সমাজবাদ। বিশ্বে কোন্ আদর্শ জয়যুক্ত হবে তাই আজ বড় প্রশ্ন। আমরা—ভারতবাসীরা মনে করি যে, বৃহত্তর সমষ্টি-চেতনার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও কল্যাণই একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত। যখন ব্যক্তি তার নিজস্ব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থকে সমষ্টির স্বার্থে বিসর্জন দিতে শিখবে, তখন ব্যক্তি সমষ্টিগত আদর্শের আওতায় নিজেকে আরো প্রসারিত করে ফেলতে পারবে। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকে গৌণ করে সমাজে গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলা হবে সত্যিকার আদর্শ। এ বিষয়ে শিক্ষাই একমাত্র পথ—যা দিয়ে গণতান্ত্রিক পন্থায় মানুষের দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা যায়। শিক্ষাই মানুষের হাবভাব, স্বভাব-চরিত্র সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে। শিক্ষা মানুষকে সমাজের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে দিয়ে তাকে সজ্ঞান ও সতেজ ক'রে গ'ড়ে তুলতে পারে। সমাজের আদর্শের মান ও তার পূর্ণ উদ্গতিসাধন সম্ভব শিক্ষার মধ্য দিয়েই। এজন্য শিক্ষকসমাজের একটা বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরাই সমাজের পরস্পরবিরোধী ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে মানুষকে সচেতন ক'রে দিয়ে তাকে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল দৃষ্টিভঙ্গি দিতে পারেন। একমাত্র শিক্ষকসমাজই মানুষের সমাজের যাবতীয় গলদ, অবিশ্বাস, সন্দেহ প্রভৃতি নিরসন করে একটা বিশ্বাসের আবহাওয়া গ'ড়ে তুলতে পারেন। আজকের দিনে বিশ্বে যে সব সংকীর্ণতা পুঞ্জীভূত হয়েছে, যেমন—সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সংকীর্ণ দেশপ্রেম, যুদ্ধবাজী মন, অ-গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রভৃতি,

তাকে দূর ক'রতে হ'লে চাই শিক্ষকের সবল ও সুতীক্ষ্ণ মন—যা দিয়ে তিনি সমাজকে নতুন পথে ও বিশ্বাসের পথে পরিচালিত করবেন। ডাঃ কে. এল. শ্রীমালী ১৯৬১ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত WCOTP-র দশম অধিবেশনে এই কথা বলেছেন যে—"If education is to be the instrument of social change, teachers cannot remain content in an attitude of vacillation and uncertainty. They must show greater devotion and loyalty to democratic purposes." আজকের দিনে শিক্ষকরাই জগতে মানুষের শান্তি ও কল্যাণ সম্পর্কে মানুষেব দায়িত্ব ও নৈতিক চেতনাবোধকে জাগিয়ে দিতে পারেন। শিক্ষা সম্পর্কে এই নতুন দায়িত্ববোধের কথা বলতে গিয়ে শ্রী কে. জি. সইদাইন মন্তব্য করেছেন—বিশ্বের মানুষকে জাগিয়ে তোলাই শিক্ষার সত্যিকার আদর্শ। আর এ জন্য চাই অন্তরের মানুষটির পরিবর্তন সাধন। War originates in the minds of man. আর শিক্ষাই তা দূরীভূত করতে পারে। এজন্য চাই সামাজিক গতিকে স্বীকার ক'রে নেওয়া। সারাবিশ্বে আলো ছড়িয়ে দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ব শিক্ষক-সমাজের। যিশুখৃষ্টের মুখের ভাষায় শ্রীসইদাইন বলেছেন,—"প্রত্যেক ভালো মানুষের মধ্যেই আলো আছে এবং সে সারা মানুষকে আলো দান করে।" একমাত্র শিক্ষকদের আন্তরিক আগ্রহ ও নীতি প্রচারেই পৃথিবীতে নেমে আসবে বিশ্বসমাজ, যে সমাজ পরস্পর শুধু নিজেদের বোঝাপড়া করবে তা নয়, সমস্ত অবিশ্বাস ও পাপ বিদূরিত ক'রে তা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সম্প্রীতি, উদারতা ও মানবকল্যাণের আদর্শ জাগিয়ে তুলবে!

শিক্ষায় 'অডো-ভিসুয়েল এড্'এর প্রয়োগ

ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতা হোলো সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি; আর সেজন্য ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার প্রতি আবেদন জানাতে পাবে এমন জিনিস শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করার সার্থকতা আছে। এই জাতীয় অভিজ্ঞতা আহরণে যতই বৈচিত্র্য সৃষ্ট করা হবে, ততই শিক্ষা ফলপ্রদ হবে বা শিক্ষার্থী ভালোভালো ভাবধারা সংগ্রহে অনুপ্রাণিত হবে। কিন্তু, যদিও এই জাতীয় অভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা বা উৎকর্ষতা অনস্বীকার্য, তবু এর ব্যাপক প্রযোগ এতই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার যে, একে সর্বস্তরে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখনো কাজে লাগানো যাচ্ছে না। তবে, এই সাহায্যকে আমরা আরো

নানাভাবে সহজ আয়ত্তাধীন ক'রে নিতে পারি; যেমন— ডেমন্‌স্‌-ট্রেশন, নাটক অভিনয়, দৃশ্যবস্তু অবলোকন, নমুনা, মডেল, প্রদর্শনী, পোস্টার, গ্রাপের সাহায্যে ছবির নমুনা প্রদর্শন, শব্দ-গতি ছবি, ফিল্ম স্ট্রিপ্‌স্‌, কাস্ত ধরনের ছবি, রেডিও প্রভৃতি। এই সমস্ত ধরনের প্রয়োগকে আমরা অন্যভাবে আখ্যা দিয়ে বলতে পারি—'ইন্দ্রিয়জ সাহায্য' (Sensory aids)। তবে, দেখা ও শোনা এই দুই অর্থে কাজটা চলে ব'লে এই জাতীয় প্রচেষ্টাকে সাধারণত 'অডো ভিস্যুয়েল এড্‌' আখ্যা দেওয়া হয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই 'অডো-ভিস্যুয়েল' সাহায্যের প্রয়োগ এমন কিছু নতুন জিনিস নয়। রুশো, ফ্রোয়েবেল, মন্তেসরী প্রমুখ শিক্ষাবিদেরা শিক্ষায় ইন্দ্রিয়সংবেদনশীলতার গুরুত্ব ও পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার দুর্বলতা দেখিয়ে বহুপূর্বেই এইরূপ নীতির প্রয়োগের কথা বলেছিলেন। রুশো তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'এমিলের' মধ্যে বলেছেন, কেমনভাবে পঞ্চেন্দ্রিয়কে শিক্ষিত করে তোলা যায়; কেননা তাঁর মতে—"Our feet, our hands and our eyes are the first masters of Philosophy"। এর মধ্যে, তাঁর মতে, ইন্দ্রিয় হোলো প্রথম জিনিস, যা রূপ নেয় বা পরিণতি লাভ করে মানুষের মধ্যে। ফ্রোয়েবেল ও মন্তেসরী এই নীতিকে কার্যত বাস্তবে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। মন্তেসরী ইন্দ্রিয়জ শিক্ষার জন্য তাঁর 'ডাইড্যাকটিক উপাদান' তৈরি করেছিলেন এবং তাকে শিক্ষাপ্রণালীর উপযুক্ত সরঞ্জাম বলে গ্রহণ করেছিলেন। ফ্রোয়েবেল তাঁর কিণ্ডার গার্টেন পরিকল্পনার মধ্যেও চেয়েছিলেন 'gifts'-এর ব্যবহার।

এই দেখা-শোনার সাহায্য নেওয়ার নীতি আদিমকালেও অনুসৃত হোতো। আমাদের প্রাচীন পুরুষরা নানাধরনের অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গী দ্বারা ভাবের আদানপ্রদান করতেন। গ্রীকদেশেও বিদ্যালয় পরিভ্রমণ করা একটা প্রথা হিসেবে ছিল। তবে বিংশ শতাব্দীতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এখন নানাধরনের সাহায্য-উপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে। আর এটাকে আরো সাহায্য ক'রে সমৃদ্ধ ক'রে দিয়েছে বিংশ শতাব্দীতে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান—যা শিক্ষা নীতিতে আজকাল প্রযুক্ত হয়ে থাকে।

এই ইন্দ্রিয়জ শিক্ষার সার্থকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে আধুনিক গবেষণার দ্বারা। কিন্তু যদি সত্যিকারের উপযুক্ত ফল পেতে হয়, তবে

এজন্য শিক্ষকদের উপযুক্ত ভাবে এ সব সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করার শিক্ষা ও দক্ষতা আয়ত্ত করতে হবে।

এই 'অডো-ভিসুয়েল' সাহায্য গ্রহণ করার জন্য কয়েকটি নীতি নির্ধারণ করা যেতে পারে :

(ক) আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কারের ফলে কি কি ধরনের জিনিস এই সাহায্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে. তা নির্ণয় করা কঠিন হয়েছে। সে জন্য শিক্ষককে জানতে হবে—ঠিক কোন্ কোন্ জিনিস শিক্ষার ক্ষেত্রে ফলপ্রদ হবে। তাছাড়া, শিক্ষককে আরও জানতে হবে ঠিক ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় এইজাতীয় সাহায্য নেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে। আরও দেখতে হবে যে, শিক্ষক যেগুলিকে, উপাদান হিসেবে ব্যবহার করছেন তা —তাদের বয়স, বুদ্ধি ও বুদ্ধিগত পরিপকতার দিক দিয়ে কোন্ স্তরের শিক্ষার্থীদের উপযোগী।

(খ) ইন্দ্রিয়জ শিক্ষাদানের পূর্বে শিক্ষকদের মানসিক প্রস্তুতি অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তাঁদের বুঝতে হবে—ঠিক কি ভাবে এবং পাঠদানের কোন্ পর্যায়ে সেই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করবেন।

(গ) এজন্য ছাত্রদেরও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। অনেক সময় তাদের এসব সাজ-সরঞ্জাম প্রদর্শনের পূর্বে বিষয়গুলির জটিলতাকে সহজ করে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(ঘ) কখনো কোনো সময়ে অনেক বেশী সাজ-সরঞ্জাম একই অবস্থায় ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত হবে না। অনেক বেশী ধরনের উপাদান হাতে আছে বলে সেগুলি যে যুগপৎ-ব্যবহার করতে হবে, তার কোনো মানে নেই। এতে সুফল না হয়ে কুফল দেখা দেয়।

(ঙ) ছাত্রদের যথাসম্ভব শুধুমাত্র প্রথম পলকের অভিজ্ঞতা নিতে দেওয়া উচিত; দামী যন্ত্রপাতিতে কিছুতেই তাদের হাত দিতে দেওয়া যাবে না। আধুনিক শিক্ষা-পরিকল্পনায় আমরা নিম্নলিখিত সাজ-সরঞ্জাম ব্যবহার করে দেখতে পারি :

(১) ছোট ছোট প্লট নিয়ে নাট্যাভিনয় (শ্রেণী কক্ষের মধ্যে)।

(২) চার্ট, মডেল, পোস্টার (স্থায়ী ও অস্থায়ী ভাবে) ব্যবহার।

(৩) মধ্যে মধ্যে আসল স্থান পরিভ্রমণ এবং বাস্তব থেকে সংগৃহীত উপাদানের সংরক্ষণ।

(৪) প্রোজেক্টার, রেডিও, টেপ. রেকর্ডার, এপিডায়োস্কোপ প্রভৃতি ব্যবহার করা।

শিক্ষক তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য থেকে আরো বিভিন্নধরনের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারেন। আর এই সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম কিভাবে ও কি নীতিতে সংগ্রহ করা যায় ও ব্যবহার করা যায় সেজন্য ট্রেনিং কলেজের পাঠ্যসূচীতে আবশ্যিক ভাবে এই জাতীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রয়োজন।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই জাতীয় সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের উপযোগিতা শিক্ষাবিদ্‌রা স্বীকার করে বলেছেন যে. শিক্ষার মধ্য দিয়ে এমন রঙ্‌-চং দৃশ্য ও শ্রবণমূলক জিনিস ব্যবহার করতে হবে—যা শিক্ষার্থীর সংবেদনশীল মনে গভীর ভাবে ছাপ রাখে এবং তাকে আনন্দ ও বিশ্রামের সুযোগ এনে দেয়। International Committeeর রিপোর্টে ফিল্মের ব্যবহার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা সাংস্কৃতিক মূল্য, ইচ্ছাশক্তি ও বোধশক্তিকে জাগ্রত করা সহজ হয়। The London County Council ফিল্ম ব্যবহারের দ্বারা দেশের মানুষের নাগরিকত্ব-বোধ অনেকখানি জাগিয়ে দিয়েছেন। আমাদের দেশেও শিক্ষাক্ষেত্রে ল্যানটার্ন স্লাইড্‌স, রেডিও, এপিডায়োস্কোপ, সিনেমাটোগ্রাফিক প্রভৃতি ব্যবহারের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হলেও যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্যে এগুলির ব্যাপক প্রয়োগ সম্বন্ধে শিক্ষাবিদ্‌দের বেশী ক'রে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকের জাতীয়করণ

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী কর্তৃত্ব যদি অতিরিক্ত ভাবে দেখা দেয়, তবে তা গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধী "regimentation" কেই প্রকাশ করে। ১৯৫২ সালে পাঞ্জাব সরকার প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত জাতীযভাবের পাঠ্য পুস্তক ব্যবহার প্রবর্তন করেন এবং পুস্তক ব্যবসায়ীদের দুর্নীতিগ্রস্ত নীতির যবনিকাপাতের চেষ্টা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ইতিহাস, ভূগোল এবং বাংলা পাঠ্য-পুস্তক (সাহিত্য ও অঙ্ক) তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত "জাতীয়করণ" ক'রে ফেলেন। কিন্তু কেরল সরকার যখন পুস্তক ব্যবসা জাতীয়-করণ নীতি গ্রহণ করেন, তখন ভীষণ প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যায়। এর ফলে তিনজনকে নিয়ে গঠিত এক অনুসন্ধান কমিটি খুঁজে বের করে দেখেন যে, কেরল-সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য পুস্তকগুলিতে এমন সমস্ত অংশ রয়েছে—যা লোকের "ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক মনোভাবের" উপর আঘাত দেয়।

তা'ছাড়া আরো দেখা যায়, পাঠ্যপুস্তকগুলি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মনোভাবের অনুকূল এবং ভারতীয় সাধনা ও আদর্শের পরিপন্থী। একটি গ্রন্থে চীন সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা আছে, কিন্তু ভারতের অগ্রগতি সম্পর্কে বর্ণনা অতি সংকীর্ণভাবে করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার "কিশলয়" প্রকাশ করলেন —যা নিয়ে দেশব্যাপী মানুষের খুব অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। অন্যান্য অনেক রাজ্যের বইগুলিতে জাতীয় নেতাদের এবং সরকারী দলীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে এমন বর্ণনারয়েছে—যা একদেশদর্শী। অথচ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেছেন— "The day of cultural tribalism are over, we no longer have separate cultural universe. East and West have come togather never to part again and they must settle down in some kind of peaceful co-existence which will eventually grow into active friendly co-operation. That is essential for the future welfare of the world itself."

শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের এই হোলো দোষ যে, সার্বজনীন মানবত্বের মূল্য অপেক্ষা রাষ্ট্রের আদর্শ সেখানে বড়ো হ'য়ে দেখা দিতে চায়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুস্তক জাতীয়করণের আদর্শ এমন হওয়া উচিত, যেখানে সরকার পরিবর্তিত হলেও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিকদের উপরই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণের দায়িত্ব নির্ভর করবে। পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে করে সারা পৃথিবীর অগ্রসর ও অনগ্রসর দেশগুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক সম্পর্কে ধারণা নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের উন্নতি ও ক্রমবিকাশের জন্য জাতীয়করণ নীতি বা রাষ্ট্র কর্তৃত্বের প্রসার একমাত্র পথ নয়। এই পথে প্রকাশক, মুদ্রক, লেখক, শিল্পী, শিক্ষক, গবেষক প্রভৃতি সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতা প্রয়োজন। ফেডারেল জার্মানিতে ও ফ্রান্সে দুইটি ভাষা-শিক্ষণ-সংগঠন সুন্দরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এঁরা কোনো প্রকার সংকীর্ণ একদেশদর্শী মনোভাব স্বীকার না করে সর্বজনগ্রাহ্য একটি নীতি নির্ধারণ করেছে।

উন্নত ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হ'লে প্রমাণযোগ্য পাঠ্য পুস্তক থেকে নিখুঁত ঘটনাবলী গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠ্য পুস্তকের লেখককে অন্তত একটি আন্তর্জাতিক ভাষা সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। সারা দুনিয়ায় যে সমস্ত সমকালীন সমাজ-পরিবর্তন চলেছে সেগুলি অনুসন্ধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হবে সমস্ত প্রদেশে Text Book Research Bureau

গ'ড়ে তোলা—যেখানে প্রয়োজনীয় রেফারেন্স সংক্রান্ত সংগ্রহ রইবে। গত ১৯৫৮ সালের ৪ঠা অক্টোবর টোকিওতে UNESCO সংগঠিত এক পাঠ্যপুস্তক নীতি নির্ধারণ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় যে, "There is an urgent need today to broaden the sympathies and understanding of Eastern and other peoples by an insistence on the essential trend in history toward a common struggle for civilization. The human heritage now bequeathed to us is not of the making of any country or group of countries, past or present, but the outcome of the struggle and aspirations of different communities throughout history. Diversity is, thus, of the essence of human culture and should be appreciated within the framework of universal unity. It would follow from this that the history and culture of a country has to be studied in an international spirit, without rejecting a national emphasis. This implies a wider perspective on the world, which has to be the basis in all teaching and, therfore, in the writing of textbooks." পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা যদি এই উপদেশ মেনে নেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মীরা এই আদর্শ নিয়ে পাঠদান করেন তবে খুব উচ্চ আদর্শগত মান রক্ষা করা সম্ভব হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন পাঠ্য পুস্তক সংক্রান্ত high power committee গঠনের সুপারিশ করে বলেছেন যে, এই কমিটিতে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ বিচারপতি, সার্ভিস্ কমিশনের একজন সভ্য, ভাইস্ চ্যান্সেলার, প্রধান শিক্ষক, দুইজন শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারকে নিয়ে গ'ড়ে তোলা উচিত। এই কমিটি হবে একটি নিরপেক্ষ সংগঠন বিশেষ। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্য পুস্তকের উপর অতিশয় নির্ভরতাকে পছন্দ না করে সুপারিশ করেছেন "No prescribed textbook for any courses of study"র কথা। International Team অবশ্য high-power committeeর সভ্যদের পেশা নির্দেশ সংক্রান্ত ধারা মানেন নি। তাঁরা বলেছেন—"We don't consider it desirable that State Governments and educational authorities should take up the production of textbooks. We, however, think that state governments should undertake the responsibility of organizing educational research which will offer material for the production of better textbooks and general reading books. Such research may be directed, among other things, to a study of children's interests and attainments at various levels, the

gradation of language material needed in language textbooks and the type of questions and exercises that would be most useful to pupils." International Expert Committee যথার্থই সুপারিশ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির উচিত পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়ের দেশী'-বিদেশী একটি সংগ্রহশালা গ'ড়ে উঠুক। এইরূপ লাইব্রেরী তাঁরা কোপেনহেগেনে দেখেছেন। কালিফোর্নিয়ার সান্তাবারবেরাতেও তাঁরা Educational Science Centre দেখেছেন।

(দিল্লীতে অনুষ্ঠিত) রাজ্য সরকরের শিক্ষামন্ত্রীদের 'এক মিটিংয়ে পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ প্রস্তাবকে খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়। তাঁরা পুস্তকের গুণাবলী, মূল্য নির্ধারণ, উপযুক্ত সংখ্যক প্রকাশ প্রভৃতি কারণে এই জাতীয়করণ নীতি সমর্থন করেছেন। কিন্তু আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, পাঠ্যপুস্তক আমাদের দেশের মানুষকে সত্যিকার নিরপেক্ষ চিন্তায় শিক্ষিত করে তুলতে সাহায্য করবে। সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সরকারী হস্তক্ষেপ না থাকাই ভালো। মুদালিয়র কমিশন যথার্থই বলেছেন—"In a democracy an individual must form his own independent judgement on all kinds of complicated social, economic and political issues and to a large extent decide his own course of action.... To be effetive, a democratic citizen should have the understanding and the intellectual integrity to shift truth from falsehood, facts from propaganda." পাঠ্য পুস্তক জাতীয়করণ করলে এ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা

শিক্ষকের সামাজিক মর্যাদা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। 'মাস্টার' বলে বিকৃত রুচিভঙ্গিতে শিক্ষকের পেশার প্রতি নাসিকা কুঞ্চনের দিন ক্রমশই চলে যাচ্ছে। এখন সমাজ ও রাষ্ট্র শিক্ষকের নিজস্ব গুণে ও সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের ফলে অবহিত হচ্ছেন শিক্ষকের মর্যাদা সম্পর্কে। প্রতি বৎসর রাষ্ট্রপতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের যে, যতাকে পুরস্কৃত করবার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন—তা সত্যই প্রসংশার্হ।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষকের মর্যাদা ছিল অনেক উচ্চে। একটি বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছিল—"তোমার পিতা দেবতার মতো হোক," "তোমার মাতা দেবতার

মত হোক, "তোমার শিক্ষক দেবতার মত হোক।" প্রাচীন ভারতে শিক্ষকরা কোনো ফি গ্রহণ করতেন না, আর শিষ্যদের মনে করা হোতো গুরু-পরিবারের একজন হিসেবে। এর ফলে সেদিন শিক্ষককে রাজা, পিতামাতা প্রভৃতির মতো শ্রদ্ধা করা হোতো।

' আধুনিক কালে শিক্ষকের সম্মান টাকার মূল্যে গুনতি করা হয়; এমন কি তাঁদের মহিনার হার যেভাবে এতদিন ছিল তা মরিস্ গয়ারের ভাষায়—"a scandal and a disgrace"। শিক্ষকদের কোনো অর্থনৈতিক মানদণ্ড ছিল না বলেই তাঁরা বাধ্য হয়ে প্রাইভেট টুাইসনী প্রভৃতি অর্থকরী পেশায় শক্তি নিবদ্ধ করে উদাসীন হয়ে পড়তেন নিজস্ব পেশা সম্বন্ধে। এমন কি সাধারণ কারণে শিক্ষকের পদচ্যুতি একটা নিত্যনৈমেত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। কুইন-কোয়েনিয়াল রিপোর্টে বলা হয়েছে—"Dismissal from service on flimsy grounds and as a result of personal prejudice are not still quite uncommon". ইংলণ্ডের ম্যাকনেয়ার কমিটি ১৯৪৪ সালে বলেছিলেন—"A missionary spirit cannot be relied upon to maintain the supply and morale of quarter million of teachers. Teaching is indeed a form of social service like other professions, it is also a bread-and-butter affair। সার্জেণ্ট রিপোর্টও বলেছিলেন—"If India wants to educate her children properly, she must be prepared to pay her teachers properly"। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনও শিক্ষকদের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে কতকগুলি গঠনমূলক পন্থার নির্দেশ করেছেন—যেগুলিকে সরকার ক্রমশ কার্যকরী করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

শিক্ষকদের শুধু মাহিনা বাড়ালেই তাঁদের সামাজিক মর্যাদা বেড়ে যাবে, এ কথাও ঠিক নয়। শিক্ষককে তাঁর পেশার উপযুক্ত হয়ে যোগ্যতা সম্পন্ন ও আদর্শ সম্পন্ন হতে হবে। শিক্ষকদের নিজস্ব পেশাদারী ও সামাজিক সংগঠন থাকা উচিত—যা রাজনীতি নিরপেক্ষ হবে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষক সংগঠনগুলি হয় দক্ষিণ নতুবা বাম রাজনীতির কবল থেকে মুক্ত নয়। ফলে শিক্ষকদের সমস্যা অনেক সময় নিছক রাজনীতির সমস্যা হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। শিক্ষককে তাঁর পেশা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হ'তে গেলে তাঁকে শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষানীতি সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা আহরণ করতে হবে। শিক্ষককে সমাজ-জীবনের প্রতি গভীর

শ্রদ্ধাশীল হ'য়ে কর্তব্য পালন করে চলতে হবে। এই নজীর রুশদেশেও আছে —যেখানে প্রত্যেক গ্রাম্য শিক্ষক হলেন "Centre of progressive ideas or the unofficial advice bureau on every concievable subject from crop rotation to nursing the new baby."

শিক্ষকদের সামাজিক মর্যাদা রক্ষা ও তাঁদের নৈতিক অধিকার সম্পর্কে ১৯৫২ সালে গৃহীত সর্বভারতীয় শিক্ষা-সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশনে শিক্ষকদের "মৌলিক অধিকার ও দায়িত্ব" সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। একে শিক্ষকদের "চার্টার" বলা যেতে পারে। "অধিকার" অংশে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শিক্ষক হলেন জাতির সংগঠক—সমাজ ও রাষ্ট্রকে তা অবশ্যই ভাবতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষকের ন্যায্য জীবিকার সম্মান, স্থায়িত্ব, নিরাপত্তা, বার্ধক্য ও অসুস্থতা জনিত সুবিধা, চাকুরীতে সমান দৃষ্টিভঙ্গি, বাক্ স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, শিক্ষণ গ্রহণের অধিকার, আনুষঙ্গিক জীবিকায় অংশ গ্রহণ, ভ্রমণ, আইন সভা ও লোকসভায় শিক্ষক প্রতিনিধি গ্রহণ, বৈষম্যনীতির বিরুদ্ধে সালিশীর ব্যবস্থা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কাজ থেকে বিরত রাখা প্রভৃতি অধিকার স্বীকার করার কথা এই "চার্টারে" বলা হয়েছে। আর শিক্ষকদের "নৈতিক দায়িত্ব" শীর্ষক অংশে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক শিক্ষক বিশ্বস্ত ভাবে শিক্ষার্থীর সর্বপ্রকার শরীর, মন ও আত্মার উন্নতির জন্য চেষ্টা করবেন, প্রত্যেক শিশুর মধ্যে যে অপূর্ব শক্তি আছে তাকে সমাজ-জীবনের উপযোগী করে গ'ড়ে তুলবেন. আচরণে ও ভাষায় একটা উচ্চমান সৃষ্টি করবেন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঐক্যবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, গ'ড়ে তুলবেন, তাদের মধ্যে শ্রমের মর্যাদা, তন্ময়শূন্যতা, আত্মপ্রচেষ্টা, আত্মপ্রকাশকে উদ্‌বোধিত করে তুলবেন, নিরপেক্ষ মন নিয়ে কাজ করবেন, শান্তি ও আন্তর্জাতিক প্রীতির আদর্শকে বড়ো করে দেখবেন এবং এজন্য ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ও মানুষের স্বাধীনতা ও মর্যাদার পরিপোষক নীতির আশ্রয় গ্রহণ করবেন।

শিক্ষকদের "সামাজিক মর্যাদা" ও "অর্থনৈতিক মর্যাদা"—দুইদিকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। মুদালিয়র কমিশন বলেছেন—"Priority of consideration must therefore, be given to the various problems connected with the improvement of the status...the

social status, the salaries...of teachers are far from satisfactory" সে কমিশন বলেছেন—"The various problems connected with the improvement of his status...deserve top priority of consideration." মুদালিয়র কমিশন আরো বলেছেন যে, "We are satisfied that it is attended with several evils and steps should be taken to abolish it as early as possible." এক কথায় এঁরা সকলেই শিক্ষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদার উপরে রাষ্ট্র ও সমাজকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে বলেছেন।

ইন্ সার্ভিস ট্রেনিং পরিকল্পনা

আজকাল শিক্ষণপ্রাপ্ত নন এমন ধরনের শিক্ষকদের এক সুনির্দিষ্ট ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ইন্-সার্ভিস ট্রেনিং পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা শিক্ষাবিদ্‌গণ ও সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে শিক্ষকদের জন্য যে ইন্ সার্ভিস পরিকল্পনা চালু হয়েছে তার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হওয়া সমীচীন। শিক্ষকদের ট্রেনিং সমস্যার সঙ্গে এই সমস্যার দিকটি গভীরভাবে জড়িত। আমাদের দেশে এখনো এমন অনেক শিক্ষক আছেন, যাদের চাকুরী দীর্ঘদিন হয়েছে অথচ তাঁরা কোনরূপ শিক্ষণ গ্রহণে অবসর বা সুযোগ-সুবিধা পান নি। অথচ নতুন সমস্যায় নতুন যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলার জন্যে তাদের কিছুটা শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অবিসংবাদিত স্বীকৃতি পেয়েছে। এই সমস্ত শিক্ষকদের অধিকাংশই বয়স্ক ও পরিবার ভারাক্রান্ত—তাই তাঁদের পক্ষে বাড়ীঘর ফেলে দিয়ে দীর্ঘদিন পড়াশুনা করার জন্য কোনো ট্রেনিং সেণ্টারে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে এ-ও দেখা যায় যে, এই সমস্ত শিক্ষকরা দীর্ঘদিন পড়ানো কাজে ব্যস্ত থাকায় বা রত থাকায় এঁদের অভিজ্ঞতাও এমন বেড়ে গেছে যে এঁদের পক্ষে ঠিক বিস্তৃত শিক্ষণ কার্যসূচীতে অংশ নেওয়ারও ততখানি প্রয়োজন নেই। সম্প্রতি All India Council of Secondary Education বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যে এক্সটেনশান স্কীম (Extension Scheme) চালু করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু, এ পরিকল্পনাতেও অংশ গ্রহণ করার অনেক বাস্তব অসুবিধা দেখা দেওয়ায় সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে গেছে।

সারা ভারতবর্ষে ও বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষণপ্রাপ্ত ও শিক্ষণ শিক্ষাহীন

শিক্ষকদের যে ভয়াবহ চিত্র ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ দেখিয়েছেন (Education in the States, 1955-56) তা অনুধাবন করলে সমস্যার গভীরতা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌বে।

সারা ভারতবর্ষ	শিক্ষণপ্রাপ্ত	শিক্ষণবিহীন	শতকরা হিসাবে
মাধ্যমিক পুরুষ শিক্ষক	১৫৮,৩৭৪	১২০,৮৮৫	৫৬ ৭%
ঐ মহিলা ,,	৪১,৫৪০	১৭,৩৮৯	৭০.৪%
প্রাথমিক পুরুষ ,,	৩৩৬,৫৫০	২৩৭,৫৬২	৫৮.৬%
ঐ মহিলা ,,	৮৬,১৩২	৩০,৮০৫	৭৩.৫%

পশ্চিমবঙ্গ			
মাধ্যমিক পুরুষ ,,	৫,২৬১	১৮,২১৮	২২.৮%
ঐ মহিলা ,,	২,১৪০	২,৩৯২	৪৭.৫%
প্রাথমিক পুরুষ ,,	২১,৯০১	৪২,০৯২	৩৪.৫%
ঐ মহিলা ,,	২.০০৬	৩,১৭৫	৩৮.৬%

উপরোক্ত চিত্র পরবর্তী বৎসরগুলিতে অনেকাংশে পরিবর্তিত হলেও সমস্যার গভীরতা সমান থেকে যাচ্ছে। উপরোক্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, মহিলা শিক্ষিকার সংখ্যা বেশি হলেও সর্বভারতীয় শিক্ষকদের মধ্যে ২/৫ ভাগ পুরুষ শিক্ষক শিক্ষণপ্রাপ্ত নন। পশ্চিম বাঙ্গলায় দেখা যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্ধেকের বেশি এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ২/৫ ভাগ শিক্ষক শিক্ষণ প্রাপ্ত নন, পরন্তু মাত্র ১/৪ ভাগ পুরুষ, ৬২/৩ ভাগ মহিলা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষণ প্রাপ্ত নন।

এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, শিক্ষণ প্রাপ্ত নন অথচ যথাসম্ভব সত্বর সমগ্র শিক্ষক সমাজকে অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষণ দিতে গেলে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী হলে খুব ফলপ্রদ হবে বলে আমাদের ধারণা :

(১) ডাঃ এল. মুখার্জি তাঁর 'A Suggested Scheme of Inservice Training for Teachers" প্রবন্ধে দেখাতে চেয়েছেন কিভাবে এই পরিকল্পনাকে সহজসাধ্য ও দ্রুত করা সম্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে ডাঃ মুখার্জি মিশরের চলমান স্কোয়াড ট্রেনিং পরিকল্পনার সারবত্তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, কিভাবে সেখানে অল্প সময়ের বিরাট কর্মসূচী গ্রহণ করে শিক্ষণ সমস্যার

সমাধান করার প্রয়োগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষকদের ট্রেনিং কলেজ অভিমুখীন করার চেয়ে ট্রেনিং কলেজকেই শিক্ষকের কাছে আনা যায় কিভাবে-এ সম্পর্কে ডাঃ মুখার্জি এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন। তিনি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষকদের একটি দলকে নানা ধরনের শিক্ষণ সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে এক এক এলাকায় মাসখানেক ধরে কাটাতে বলেছেন; যাঁরা ঐ সময়ের মধ্যে শিক্ষকদের পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তবভাবে সাহায্য করবেন এবং রাত্রিতে সিম্পোজিয়াম, বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ও শিক্ষাদান সম্পর্কে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা করবেন। আর, যদি এইভাবে তিনজন করে একটি ভ্রাম্যমান অধ্যাপক গোষ্ঠী এক-এক জায়গায় শিক্ষণ দিয়ে ফেরেন, তবে আমরা অন্তত বছর পাঁচেকের মধ্যে অধিকাংশ বা সমস্ত শিক্ষণ প্রাপ্তহীন শিক্ষকদের in-service শিক্ষা দিতে পারবো। ডাঃ মুখার্জি আরো দেখিয়েছেন যে, এই পরিকল্পনা কার্যসূচী করতে বড়জোর ৫২ থেকে ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে পশ্চিমবঙ্গে—যা এই প্রদেশের শিক্ষা বাজেট অনুযায়ী খুব অসুবিধার হবে না।

ইন্-সার্ভিস শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের মধ্যে পড়াশুনোর ব্যাপারে ও শাসনগত দিক দিয়ে একটা ঐচ্ছিক স্বাধীনতার সুযোগ থাকবে—যা পারস্পরিক ভাব আদান প্রদান ও নতুন নতুন চিন্তাধারার স্বাধীন বিকাশ সাধনের পক্ষে অনুকূল হয়।

(৩) অভিভাবক শিক্ষক সম্মেলন, প্রধান শিক্ষকদের সম্মেলন, স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সম্মেলন প্রভৃতির মাধ্যমে উপযুক্ত আলাপ-আলোচনা, পারস্পরিক সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

(৪) আঞ্চলিক সংগঠন গ'ড়ে তোলা।

(৫) প্রত্যেক আঞ্চলিক এলাকার জন্য উপদেষ্টা পরিষদ গড়ে তোলা।

(৬) কার্যকরী সমিতি এমনভাবে গড়ে তোলা—যেখানে শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব থাকবে।

(৭) একটা আঞ্চলিক তহবিল রক্ষার অছি গঠন করা—যেখানে কেন্দ্রীয় পরিষদ থেকে অর্থসাহায্য আসবে।

(৮) বিভিন্ন ট্রেনিং কলেজগুলিকে একসঙ্গে এমন সংযুক্ত করে ফেলতে হবে—যাতে করে তাঁরা সহজে দলবদ্ধভাবে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারেন।

(৯) উপযুক্ত শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম দিতে হবে।

(১০) স্থানীয়ভাবে শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য তৎপরতা দেখাতে হবে।

(১১) সর্ব ভারতীয় শিক্ষা পরিষদে প্রত্যেক আঞ্চলিক সভা থেকে সভ্য পাঠাতে হবে।

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা মাধ্যমিক শিক্ষার কয়েকটি বিশেষ সমস্যার কথা অবতারণা করেছি এবং সেই সঙ্গে সেই সমস্যাগুলি প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করেছি। মাধ্যমিক শিক্ষার ধারাকে সমুন্নত ক'রে তোলার জন্য বিশেষ বিশেষ উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকলের অবহিত হওয়া অত্যাবশ্যক।

Questions :

1. What are the special problems of Secondary Education ? Discuss in some details.

2. Suggest ways and means for removing difficulties that are experienced in the field of Secondary Education.

References :

1. হরিসাধন গোস্বামী—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন
2. International Team's report
3. The Secondary Education Commission's Report,
4. Dey Commission's Report
5. Sargent's Report

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শিক্ষা ও পরিকল্পনা

(Education and Planning)

প্ল্যানিং কমিশন তাঁদের খসড়া পরিকল্পনার মুখবন্ধে বলেছেন যে, "Planning in a democratic state is a social process in which in some part every citizen should have the opportunity to participate. To set the patterns of future development is a task of such magnitude and significance that it should embody the impact of public opinion and the needs of the community." অর্থাৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে 'পরিকল্পনা' হোলো একটা সামাজিক পদ্ধতি, যাতে প্রত্যেক নাগরিকের অংশ গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে। ভবিষ্যতের উন্নতির পদ্ধতি বা রূপটি নির্ণয় করা এতই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল যে, তা অবশ্যই জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মতের অনুগামী হবে। একটা কথা আছে—"The greatest wealth of a country is not to be found in the bowels of the earth but in the ingenuity and skill of the people." অর্থাৎ একটা দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মাটির তলায় লুকিয়ে নেই, জনগণের ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যেই তার পরিচয়। একটা জাতির প্রকৃত বিকাশ নির্ভর করছে শিক্ষার উপর এবং এইজন্য যে-কোন সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষা অনিবার্যভাবে এক শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করতে পারে। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য রূপায়ণে শিক্ষা একটা বিরাট ভূমিকা গ্রহণ ক'রে থাকে; কেননা এরই ওপর দেশের সামাজিক আবহাওয়া ও মানুষের গুণগত দিকটির বিকাশ নির্ভর করে। শুধুমাত্র বস্তুগত উন্নতিই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হতে পারে না, এজন্য প্রয়োজন হবে মানুষের গুণগত বিকাশ। আর, এজন্য প্রয়োজন হবে ব্যাপক শিক্ষাব্যবস্থার—যা দেশের প্রতি মানুষকে পরিকল্পনার রূপায়ণে সজ্ঞান ও সচেতনভাবে গ'ড়ে তুলবে। এবার আমরা দেখবো কিভাবে আমাদের দেশ স্বাধীনতালাভের পর—বিশেষ করে প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঠিক সুগোপযোগী হয়ে উঠেছে।

ভারতবর্ষে অসংখ্য কমিটি ও কমিশন ইতঃপূর্বে বসেছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ও অন্যান্য কমিটি গঠিত হয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামত দেওয়ার জন্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষার অগ্রগতি ও লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা লওয়া হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৬৯ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার মারফত ৪৪ কোটি টাকা এবং প্রাদেশিক সরকার মারফত ১২৫ কোটি টাকা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৩০৭ কোটি টাকার মধ্যে ৯৫ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার ও ২১২ কোটি টাকা প্রাদেশিক সরকার খরচের জন্য বরাদ্দ করেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে মোট ৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল যে, দেশের জনগণকে তথা নাগরিকগণকে দেশ সংগঠনের বিবিধ কার্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে নিযুক্ত করার জন্য খাদ্যের পরেই শিক্ষার স্থান স্বীকার করা উচিত হবে; কিন্তু উপযুক্ত রসদ না থাকার জন্য ও যন্ত্র না গ'ড়ে তোলার জন্য প্রথম পরিকল্পনায় শিক্ষার দিকটায় ততবেশী নজর পড়েনি। সমগ্র প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দ যা ছিল, সে তুলনায় শিক্ষার জন্য ছিল মাত্র শতকরা ৭ ভাগ। দেশের সামনে নিম্নলিখিত কয়েকটি উচ্চ লক্ষ্য ছিল—

(১) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে অন্তত ৬০ ভাগ ছাত্রদের মধ্যে (যারা ৬—১১ বছর বয়স্ক তাদের জন্য) শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(২) মাধ্যমিক পর্যায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য হোলো অন্তত ১৫ ভাগ ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

(৩) সমাজ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তত ৩০ ভাগ লোককে (১৪—৪০ বছর পর্যন্ত) শিক্ষা-ও ব্যবস্থার আওতায় আনা।

কিন্তু এভাবে সত্যিকার উন্নতি সম্ভব হয়নি। মাত্র ৬—১১ বছর বয়সের ছাত্রদের মধ্যে ৫১% ভাগ শিক্ষাগত সুযোগ লাভ করেছে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সচিব সম্মেলনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষার কতখানি গুরুত্ব হওয়া উচিত এ সম্পর্কে বলেছেন—"It was admitted of all that in the First Five Year Plan education did not get a proper deal"। এজন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১০৮০ কোটি টাকা বরাদ্দের দাবি ওঠে; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তা মাত্র ৩০৭ কোটি টাকা হিসাবে বরাদ্দ হয়। ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও সমগ্র বাজেটের মধ্যে শিক্ষাখাতে

মাত্র ৬'৪% খরচ মঞ্জুর হয়। প্রথম পরিকল্পনার মতো দ্বিতীয় পরিকল্পনায় "সমাজসেবা" খাতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ-পরিকল্পনা, শ্রম, অনগ্রসর জাতির কল্যাণ, সমাজ-কল্যাণ, পুনর্বসতি ইত্যাদি সবকিছু "শিক্ষা" বাজেটের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বুনিয়াদী শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী-করণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ক্রমোন্নতি, টেকনিক্যাল ও বৃত্তিগত শিক্ষা প্রভৃতি উপর অধিকতর জোর দেওয়া হয়, এবং মাধ্যমিক এবং টেকনিক্যাল শিক্ষার উপর বরাদ্দ অনেক বেশি করা হয়, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চেয়েও কম ধরা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল যে ৬—১৪ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ পাবে ৪৯% ভাগ, আর ৬-১১ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে তা হবে ৬৩% ভাগ এবং ১১-১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের উন্নতি হবে ২৩% ভাগ। কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি। ড': শ্রীমালী পার্লামেণ্টে বিতর্কের সময় বলেছেন—"We are far from reaching the target of bringing 63% of the students in the age-group of 6-11 years and 23% of students in the age-group of 11-14 years in schools by the end of the Second Plan." দেশের জনসংখ্যা যে-হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নারী ও পুরুষের নিরক্ষতার গ্লানি যেভাবে এখনো পুঞ্জীভূত রয়েছে, তাতে ক'রে শিক্ষাকে প্রাথমিক ভাগে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের ভাষণ উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনে বলেছেন—"I am not sure if history will judge that the endeavour we have made is commensurate with our capacity" এবং "even after all allowances are made we have to admit that education does not receive in India the first, the second or even the third place in the order of priorities." সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হো'লো এই যে, সংবিধানের ৪৫নং ধারায় 'অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার' যে প্রস্তাব ছিল তাকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করার কোনো পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। এইজন্য ১৯৫৫ সালে পুরীতে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলনে শ্রী বি. জি. খের মন্তব্য করেছিলেন—"There is no clear national policy and no definite objective, no uniformity of any kind in regard to the free and compulsory

education which is to be provided for according to Article 45 of our Constitution. Each state has its own policy or lack of it and the nation drifts along according of the views of the person in charge for the time being." তাই শিক্ষাক্ষেত্রে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এমন হবে, যাতে ক'রে আমরা সারা বিশ্বে এক নতুন বিস্ময়কর জাতিতে পরিণত হ'তে পারি। এড্‌মণ্ড বার্ক বলেছিলেন—"An educated citizentry is a greater defence to a democratic country than a vast standing army." আর এজন্য প্রয়োজন সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার সুযোগ। All India Council for Elementary Education এবং Planning Commission-এর শিক্ষাসংক্রান্ত প্যানেল সংবিধানে নির্দেশিত অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ায় জন্য সময় ঠিক করা হয়েছে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত, যে সময় ৬—১১ বছর পর্যন্ত শিশুরা ঐ শিক্ষার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ সংবিধান রচনার দশ বছরের মধ্যে যে সুযোগ লাভ করা উচিত ব'লে নির্দেশিত হয়েছিল তা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে লাগছে ১৬ বছর। কিন্তু, এই নির্ধারিত সময়েও তা সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। কেননা শিক্ষা খাতেও বাজেটের টাকা কমিয়ে দেওয়ার কথা উঠেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা মিঃ টমলিমসনের বক্তৃতার কথা মনে করতে পারি—যিনি যুক্তরাজ্যে বাজেট সংরক্ষণের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—"The Ministry did not spend but only invest in the future of the nation" আমাদের এটা সবসময় মনে রাখতে হবে যে 'Educat n in the cheap is the falsest of false Economics.'

যে-কোন পরিকল্পনার গোড়ার কথা হো'লো "First thing first"। কিন্তু শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই নীতি সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হচ্ছে না। যখন সার্বজনীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি, যখন শিক্ষকদের সাধারণ জীবনধারণের মান উন্নয়ন একটা প্রকাণ্ড সমস্যা, তখন কি উচিত ছিল না ডঃ দেশমুখের সেই বহুঘোষিত নীতি—"Consolidation rather than expansion'কে মেনে নেওয়া।

শিক্ষা একটা যুগান্তকারী সমস্যা। আমাদের উচিত তার প্রগতিকে বাড়িয়ে তোলা। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাকে সর্বস্তরের মানুষের জন্য সহজলভ্য ক'রে তুলতে হবে। শিক্ষাকে তাই জাতীয় পরিকল্পনায়

যথাযোগ্য আসন দিয়ে শিক্ষার গতিকে বিস্তৃত ক'রে তোলাই হবে যথার্থভাবে আমাদের দেশের পরিকল্পনার শেষ লক্ষ্য। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার "শিক্ষা" সংক্রান্ত অংশে এ কথা বলা হয়েছিল যে, "Education determines the quality of the man-power and the social climate of the community, it develops the spirit of co-operation and the sense of disciplined citizenship among the people, evokes public enthusiasm and builds up local leadership and on all these things depends primarily the success of the plan."

Questions :

1. 'Education in the cheap is the falsest of false economics'.—Critically examine the statement.

2. Discuss the utility of sound educational planning and its desired results.

3. How the educational planning in India takes place in the changed context of the day ?

References .

1. Education in the five-Year Plans
2. Seven Years of Freedom
3. Planning Commission's Draft report.

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

সর্বস্তরের শিক্ষা সমন্বয়

(Co-ordination of Education at Various Levels)

প্রাথমিক পর্যায় থেকে উচ্চস্তরের শিক্ষা পর্যন্ত আমরা যে শিক্ষা-পরিকল্পনার কথা বলি, তা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হ'লে চলবে না। এ কথা মনে রাখতে হবে যে, একটি স্তর অন্য স্তরের শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব মাত্র। প্রত্যেক স্তরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সত্তা আলাদা আলাদা ভাবে স্বীকৃত হলেও এবং প্রত্যেক স্তরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে হ'লেও একথা ভুললে চলবে না যে, এক স্তর অন্য স্তরেরই অনুপূরক। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য হোলো পরিপূর্ণ মানুষ গ'ড়ে তোলা। এই পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি ক'রতে হ'লে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঐক্যপূর্ণ ও সুবিন্যস্ত করে তোলা প্রয়োজন। 'Total Education' নীতি আমাদের গ্রহণ করতে হবে, কেন না আমরা চাই সমস্ত মানুষের সর্বাঙ্গীন, ও পর্যায়ক্রমিক শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ (development)। এ জন্য শিক্ষাবিদেরা বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাপর্যায়ের মধ্যে একটি সমন্বয়সূত্র গ'ড়ে তোলার কথা ব'লে থাকেন।

ভারতের মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন লক্ষ্য করেছিলেন যে, কেন্দ্রে ও প্রদেশে শিক্ষার ১০ থেকে ১৭ বৎসর পর্যন্ত স্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রিদপ্তর ও বিভাগ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা দেখেন যে, শিক্ষাবিভাগ শিক্ষার সাধারণ বিভাগ পরিচালনা করলেও কৃষিদপ্তর, বাণিজ্য ও শিল্প বিভাগ, শ্রমবিভাগ প্রভৃতি বিশেষধরনের শিক্ষার দায়িত্ব পরিচালনা করেন। এর ফলে দেখা গেছে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় ও স্তর নিয়ে যেসব কাজকর্ম হয়, তার মধ্যে কোনো সমন্বয় গ'ড়ে ওঠে না। এজন্য মধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে একটি সংযোজন ক্ষেত্র গ'ড়ে তুলতে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন—"It seems, therefore, necessary that there should be a co-ordinating agency and that problems of a similar nature pertaining to more than one Ministry or Deparnment should be discussed by them thoroughly and a concerted programme of education should be formulated." মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই সুপারিশ করেন যে, কেন্দ্রে ও প্রদেশে এমন

একটি কমিটি গঠিত হওয়া উচিত—যাতে বিভিন্ন শিক্ষার দায়িত্ব পালনে সর্বস্তরের বিভাগীয় কর্তা ও অর্থমন্ত্রী একত্র মিলিত হয়ে শিক্ষার সামগ্রিক কর্মসূচী রূপায়নে যেন অগ্রণী হতে পারেন। এ জাতীয় কমিটিতে শিক্ষামন্ত্রী হবেন সভাপতি এবং ডি. পি. আই. হবেন সম্পাদক। সর্বস্তরের শিক্ষার সঙ্গে সমন্বয়সূত্র গ'ড়ে তোলার জন্য এ জাতীয় 'Policy making body'র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা (Primary and Secondary Education) :

প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার একমাত্র উদ্দেশ্য Three 'R' শিক্ষা দেওয়া নয়। আধুনিক গণতান্ত্রিক জীবনধারা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার প্রতি যে প্রবল আগ্রহ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা উদ্দীপনা দেখাচ্ছে এবং বৃত্তিগত প্রয়োজনে তারা আর সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষায় সন্তুষ্ট নয়। সেজন্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে যে মানসিক প্রস্তুতি গ'ড়ে তোলা দরকার তার উদ্দেশ্য যেন এই হয় যে, এই স্তর থেকে যোগ্য শিক্ষার্থীরা আরো যোগ্যতা আহরণের জন্য মাধ্যমিক স্তরে প্রবেশ লাভ করে। এই উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স ও দক্ষতা অনুযায়ী যোগ্যতার শিক্ষা দিতে হবে। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সামাজিক অভ্যাস, পরিবেশ পরিচিতি, ভাষাজ্ঞান প্রভৃতি নিখুঁত ও স্বচ্ছ হওয়া চাই। নতুবা মাধ্যমিক স্তরের প্রাথমিক ধাপে তারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণে এবং নূতন পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনায় সক্ষম হয়ে উঠ্‌বে না। প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার সঙ্গে তাই মাধ্যমিক শিক্ষার একটা সংযোগসূত্র গ'ড়ে তুলতে হবে। এজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকগণ বিভিন্ন অঞ্চলে একত্রিত হয়ে যদি তাঁদের নিজ নিজ সুবিধা-অসুবিধার কথা পরস্পর আলোচনা করেন, তবে ফল খুব ভালো হয়। এজন্য থানা, মহকুমা, জেলা ও প্রদেশে এবং কেন্দ্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের একটি সংযোজক সমিতি গঠিত হওয়া সমীচীন।

মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাথমিক ও উচ্চতর বুনিয়াদী বা নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার একটি নিখুঁত ঐক্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ'ড়ে তোলা বিশেষ প্রয়োজন। মাধ্যমিক পর্যায়ের স্তর নির্দিষ্ট হয়েছে ১১ থেকে ১৭ বছর পর্যন্ত। বুনিয়াদী শিক্ষার পর্যায় নির্দিষ্ট হয়েছে ৬—১৪ বছর পর্যন্ত। মাধ্যমিক

শিক্ষার কিছু পর্যায় বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে প'ড়ে যাওয়ায় অনেকে মনে ক'রতে পারেন যে, প্রাথমিক ও বুনিয়াদী ব্যবস্থার সঙ্গে মাধ্যমিক ব্যবস্থার সুসঙ্গতি স্থাপন হবে কি ভাবে? কিন্তু আপাত দৃষ্টিতে একটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করা গেলেও আমাদের দেশের বুনিয়াদী ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে কোনো ফাঁক সৃষ্টি হয় নি। জাকির হোসেন কমিটি ও সার্জেণ্ট কমিটি বুনিয়াদী শিক্ষার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তা মাধ্যমিক স্তরকে খানিকটা মেনে নিয়ে। উচ্চবুনিয়াদী পর্যায়টি আসলে মাধ্যমিক শিক্ষার আওতায় গিয়ে পড়ে। যাতে উচ্চবুনিয়াদীর সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার কোনো দ্বন্দ্ব না হয় সেজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব করেন যে, উচ্চবুনিয়াদী, নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ের এবং উচ্চবিদ্যালয়ের নিম্নপর্যায়ের পাঠ্যসূচী যেন এক প্রায় ধরনেরই হয়। আমাদের দেশে উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট নয়। তাই, যে সব বিদ্যালয়ে উচ্চবুনিয়াদী পাঠ্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তাদের উচ্চবিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর বা নিম্ন-মাধ্যমিক—তথা জুনিয়র হাইস্কুলের পাঠ্যসূচীর সঙ্গে মিল রাখা চাই। একদিকে বুনিয়াদী বিদ্যালয় যেমন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে গ'ড়ে উঠবে, তেমনি দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গেও তার সমন্বয় প্রয়োজন। এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকমিশন প্রস্তাব করেছেন যে—

(১) মিডিল বা জুনিয়র সেকেণ্ডারী বা উচ্চবুনিয়াদী পর্যায় হবে তিন বৎসরের—

(২) উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায় হবে চার বৎসরের।

প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ধরনের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী যেন ঐক্যপূর্ণ হয়—যাতে ক'রে এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের পক্ষে কোনো অসুবিধা না হয়। এইভাবে সিনিয়র বেসিক, জুনিয়র হাইস্কুল, উচ্চতর মাধ্যমিকের নিম্নপর্যায় এবং মিডিল স্কুলে একটা ঐক্যপূর্ণ নীতি অনুসৃত হ'লে সংবিধান অনুযায়ী ১৪ বছর পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাসূচী গ্রহণে কোনো অসুবিধা হবে না এবং দেশের সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে একটি ঐক্য গ'ড়ে উঠবে।

মাধ্যমিক ও বৃত্তিগত শিক্ষা (Seco-dary and Vocational Education):

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলার কথা শিক্ষাবিদেরা বলেন। এই পর্যায়ের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতের যোগ্য

নাগরিক ও নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী হ'য়ে গ'ড়ে উঠ্‌বে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গ'ড়ে উঠ্‌তে হবে—যাতে করে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব এইখানেই তারা সমাধা ক'রতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের উৎপাদনাত্মক যোগ্যতা, জাতীয় অর্থ-বৃদ্ধির উপায় এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির কথা ভেবে দেখতে হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষাথাদের এমন শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে—যাতে তারা সুস্পষ্ট চিন্তাধারা ও নূতন ভাবধারা গ্রহণে সক্ষম হয়। এই পর্যায়ের শিক্ষায় তাই শিক্ষার্থীর মনস্তাত্বিক, সামাজিক, ভাবপ্রবণ ও বাস্তব চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের মধ্যে সমাজচেতনা, স্থৈর্যবোধ, শৃঙ্খলা, সহযোগিতার নীতি, সৃষ্টিশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধনের সুযোগ এনে দিতে হবে।

মাধ্যমিক পর্যাযের শিক্ষার্থীদের বৃত্তিগত যোগ্যতাবৃদ্ধি একটি মুখ্য সমস্যা। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধু যে কাজ করবার জন্য একটা নতুন মনোভাব জাগিয়ে দিতে হবে তা নয়, তাদের মধ্য থেকে শ্রমবিমুখতার ভাব দূর করে তাদের সৃষ্টিশীল কর্মে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হবে। এই মনোভাব গ'ড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আরো দেখতে হবে যে শিল্প ও কারিগরী বিদ্যার প্রসারের ক্ষেত্রে এই সব শিক্ষাথারা যে'গ্যতার সঙ্গে কাজে অংশ নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে কি না। আমাদের দেশের পূর্বতন শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত বেশী পুস্তককেন্দ্রিক জ্ঞান আহরণ করতো—যার ফলে তারা বাস্তব অবস্থায় অকেজো হযে পড়তো। সেজন্য নতুন পরিপ্রেক্ষিতে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রত্যেক বিদ্যালযে শিল্প (craft) এবং উৎপাদনাত্মক কর্মের উপর জোর দিয়ে বলেছেন যে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বহুমুখী পাঠ্যসূচী প্রবর্তিত হওযা উচিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কৃষি, শিল্প, কারিগরী, ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রলে তবেই তারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন শেষে বৃত্তিগত পেশায় নিযুক্ত হ'তে পারবে বা উন্নত ধরনের বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন ক'রবে। এই সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করলে তবেই আমরা আশা করতে পারবো যে, যুব শিক্ষার্থীরা মনস্তাত্বিক ও বাস্তব দিক দিয়ে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করতে পারবে এবং জীবনযাত্রার উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

পূর্বে ইণ্টারমিডিয়েট পাশের পর শিক্ষার্থীরা ইঞ্জিনিয়ারিং, চিকিৎসা, কৃষি, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য ভর্তি হ'তে

পারতো। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই সুপারিশ ক'রেছেন যে, যারা যোগ্যতার সঙ্গে উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম ক'রেছে বা উচ্চবিত্তালয় সহ প্রাক্ বিশ্ববিত্তালয় পাঠ্যসূচী সমাপন করেছে তাদের এক বৎসরের প্রাক্-পেশাদারী শিক্ষা দিয়ে এই জাতীয় বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা সমীচীন। উচ্চতর মাধ্যমিক বিত্তালয়ে যেসব শিক্ষাথী যোগ্যতার সঙ্গে বিশেষ বিষয়ে পাশ করেছে তাদের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা শিথিল করা যেতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এই আশা পোষণ করেন যে, উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ের পর অধিকাংশ শিক্ষার্থী বৃত্তিগত শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হবে। এই সব শিক্ষার্থীর জন্য পলিটেকনিক বা কারিগরী বিত্তালয়ে দুই বা ততোধিক বৎসর কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই জাতীয় বিত্তালয়ে রাজ্যসরকার বা সর্বভারতীয় কারিগরী পরিষদ কর্তৃক সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমা দেওয়া হবে। যারা উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে বৃত্তিগত যোগ্যতা অর্জন করে এসেছে তাদের জন্য প্রথম বৎসরের শিক্ষা গ্রহণ শিথিল করা যেতে পারে।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বৃত্তিমুখী ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে পাঠ্যসূচী গ্রহণের প্রস্তাব কাযকরী হচ্ছে আমাদের দেশে। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছে—"The whole modern approach to this question is based on the insight that the intellectual and cultural development of different individulas takes place best through a variety of media, that the book or the study of traditional academic subjects is not the only door to the education of the personality and that, in the case of many—perhaps a majority of the children practical work intelligently organised can unlock their latent energies much more successfully than the traditional subjects which address themselvse only to the mind or, worse still, the memory." এই দিকটির কথা বিবেচনা করে মাধ্যমিক শিক্ষাসূচীতে কতকগুলি core বিষয় নির্দিষ্ট হয়েছে এবং বৃত্তিগত বিষয়গুলী নির্বাচনের সুযোগের ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী পাঠ্যসূচীতে তাই নানাবিষয়ের শ্রেণী-বিভাগ গ'ড়ে তোলা হচ্ছে এবং এর ফলে ভবিষ্যৎ বৃত্তিনির্বাচনের Pre-vocational bias ক্ষেত্র হিসেবে মাধ্যমিক স্তরকে

একটি অন্যতম প্রস্তুতি পর্যায় হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। বৃত্তিগত শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার একটি সমন্বয় তাই প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা (Secondary and Higher Education) ঃ

আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর ১১ থেকে ১৭ বৎসর পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়কে পরবর্তী পর্যায়ের প্রস্তুতি-পর্ব বলে গণ্য না ক'রে তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ক'রে তোলার জন্য শিক্ষাবিদ্‌গণ মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমাদের একথাও মনে রাখতে হবে যে, মাধ্যমিক পর্যায়ের পর অনেক শিক্ষার্থী পড়াশুনা ছেড়ে দিলেও কিংবা বৃত্তিমুখী শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট হলেও উচ্চতর শিক্ষার জন্য কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী যে আকৃষ্ট হচ্ছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার পর যেসব শিক্ষার্থী বৃত্তিগত উচ্চশিক্ষায় প্রবেশ ক'রবে, তাদের সমস্যা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কিন্তু যারা সাধারণ শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে প্রবেশ লাভ ক'রবে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন হবে তাই এখন আমাদের বিবেচনার বিষয়। মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনের মতে আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য উচ্চশিক্ষার সময়কাল দীর্ঘ করা সমীচীন হবে না। কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের সঙ্গে একমত হয়ে প্রস্তাব করেছেন যে, ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায়ের শিক্ষা বাতিল করে দেওয়া সমীচীন। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায় এই স্তর পূরণে সহায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকোর্সকে আরো একবৎসর বাড়িয়ে ত্রৈবার্ষিক স্নাতক শিক্ষার প্রস্তাব কার্যকরী করা হচ্ছে বর্তমানে। বিভিন্ন রাজ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গঠন বিভিন্নরূপ ব'লে এক ঐক্যপূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা যতদিন না গ'ড়ে ওঠে, ততদিন উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে পুরাতন চার বৎসরের ডিগ্রীকোর্স ও ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রীকোর্স পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে। উচ্চশিক্ষার পরিকল্পনাকে তাই এই অবস্থার জন্য কিছুদিন দু'ধরনের ব্যবস্থা বজায় রাখতে হয়েছে। ক্রমে এই ব্যবধান সংকুচিত হয়ে উচ্চশিক্ষায় একটি ঐক্যপূর্ণ ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠবে। যেসব বিদ্যালয়ের উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায় দ্বাদশ শ্রেণী সম্বলিত, তাদের এক বৎসর বিলোপ সাধন করতে হবে এবং যেসব বিদ্যালয় দশম শ্রেণীর তাদের এক বৎসর সংযুক্ত করে ধীরে ধীরে ইণ্টারমিডিয়েট স্তরকে ডিগ্রীর নিম্নপর্যায়ে প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চতর মাধ্যমিকের

একাদশ শ্রেণীর মানভুক্ত করে গ'ড়ে তুলতে হবে। পরিবর্তন চলাকালীন উচ্চতর মাধ্যমিক ও প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর মধ্যে একটা সুসঙ্গতি গ'ড়ে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, এ জাতীয় বিদ্যালয় পুনর্গঠনের উদ্দেশ্য মাধ্যমিক স্তরকে সুসংহত ক'রে তোলা এবং উচ্চ-শিক্ষাকে যথার্থভাবে সংগঠিত করে তোলা। যাতে ক'রে ত্রৈবার্ষিক ডিগ্রীকোর্স পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ সময় একটা ঐক্যপূর্ণ উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বা প্রাক্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ উন্নততর শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠবে। যে সব কলেজে ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স চালু আছে, তাদের এক বৎসর সংযুক্ত করে ত্রৈবার্ষিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। বর্তমান পরিকল্পনায় কলেজীয় শিক্ষাকে তাই এমনভাবে পুনর্গঠিত করা হচ্ছে যেখানে উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা বেরিয়ে এসে ত্রৈবার্ষিক পাঠ্যক্রম গ্রহণের সুবিধা পাবে। এইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের শিক্ষার একটি সমন্বয়সূত্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

Quenstions

1. Discuss how a better Co-ordination of Efforts at various levels of Education can be formed.

2. State clearly the ways and means for evolving better system of Education.

References.

1. The Secondary Education Commission
2. হরিসাধন গোস্বামী—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

দেশবিদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা

(Primary and Secondary Education of different countries)

ইংলণ্ড : ইংলণ্ডের শিক্ষার ইতিহাসে একটি ঘটনার পুনরাবৃত্তি বারংবার দেখা দিয়েছে যে, যখনই কোনো যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিয়েছে তখনই দেশ-নায়করা শিক্ষা আইন প্রবর্তনে উদ্যোগী হয়েছেন। ১৮৭০ সালে ফরাসী-জার্মান যুদ্ধের পটভূমিকায় ইংলণ্ডে ১৮৭০ সালের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হয়। তারপর ১৯০২ সালে বুয়র যুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে পাশ হয় 'শিক্ষা আইন', প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ হয় 'ফিসার অ্যাক্ট (১৯১৮)' এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পাশ হয় ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত 'শিক্ষা আইন (১৯৪৭)'। এই সমস্ত আইনের ফলে ইংলণ্ডের শিক্ষা ব্যবস্থায় এক বিরাট উৎকর্ষ দেখা দিয়াছে।

১৯১৮ সালের ফিসার অ্যাক্টে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, বিদ্যালয়ে বাধ্যতা-মূলক উপস্থিতির বয়স নির্ধারিত হওয়া উচিত পনের বৎসর। কিন্তু এই পরিকল্পনা অর্থের অভাবে চালু না হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ নার্সারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবেন এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উচ্চতর পর্যায়ে ও কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা চালু হবে। যে সব বিদ্যালয়ে ১৪ থেকে ১৮ বৎসরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা শেষ হয়েছে, সেখানে শিক্ষার্থীরা আরো কিছুকাল বাধ্যতামূলকভাবে Day Continuation বিদ্যালয়ে তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখবে। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ নূতন কোনো কর ধার্যে রাজী না হওয়ায় এই প্রস্তাব কার্যকরী হতে পারে নি। এর মধ্য দিয়ে এই ইচ্ছাই অভিব্যক্ত হয় যে, ইংলণ্ডের লোকেরা ১৪ বৎসরের বাধ্যতামূলক শিক্ষায় পরিতৃপ্ত নয়, তারা বাধ্যতামূলক শিক্ষার স্তর ১৮ বৎসর পর্যন্ত করবার জন্য উৎসুক।

১৯২৬ সালে হ্যাডো রিপোর্টে (Hadow Report) এ কথা বলা হয় যে, রাষ্ট্র-পরিচালিত যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, তাতে শিক্ষার্থীরা ১১ থেকে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষালাভের পর সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ে প্রবেশ

লাভ করবে। এই সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিরুচি অনুযায়ী নানা ধরনের শিক্ষা গ্রহণের জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। ফলে ৬ থেকে ১১ বৎসর এবং ১১ থেকে ১৪ বৎসর এই দুই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রুচি ও প্রবণতা অনুযায়ী পাঠ্যসূচী নির্ণয়ের নীতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৯ সাল নাগাদ্ এই প্রস্তাব কার্যকরী হয়। এর ফলে 'মডার্ন' বা 'সিনিয়র' বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের খুব সুযোগসুবিধা হয়ে যায়। ১৯৩৪ সালের শিক্ষা আইন হ্যাডো প্রস্তাবিত Post-Primary বিদ্যালয় অব্যাহত রেখে সেগুলিকে মাধ্যমিক স্তরের মর্যাদা দেন। ১৯৩৮ সালে গঠিত স্পেন্স কমিটি (Spens Committee) প্রস্তাব করেছিলেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় হবে তিন ধরনের —(১) গ্রামার স্কুল (Grammar School) (২) আধুনিক স্কুল (Modern School) (৩) টেকনিক্যাল স্কুল (Technical School)। স্পেন্স কমিটি আরও প্রস্তাব করলেন যে, জুনিয়র টেক্‌নিক্যাল বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে এবং সিনিয়র স্কুলে সেকেণ্ডারী পাঠ্যসূচী অব্যাহত ধারায় চলবে—যাতে বাধ্যতামূলকভাবে ষোল বৎসরের পরেও পরবর্তী শিক্ষার সুযোগ থাকবে। ১৯৪৪ সালের আইনে তা মেনে লওয়ায় ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব সংস্কার সাধিত হয়েছে। ইংলণ্ডের শিক্ষা আইনে যে গণতান্ত্রিক নীতি স্বীকার করা করা হয়, তা হোলো ঐক্যপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের নীতি। এই আইনে শিক্ষামন্ত্রীর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শিক্ষার জাতীয় নীতি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য। শিক্ষামন্ত্রীকে সাহায্য করবার জন্য কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে চারটি বিভাগ খোলা হয়েছে—স্কুল বিভাগ, পরবর্তী শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য বিভাগ, শিক্ষক বিভাগ, সংবাদ ও যোগাযোগ বিভাগ। শিক্ষার ধারাকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও অধিকতর শিক্ষা। এই আইনে শিক্ষা-ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার ধারা স্বীকার করে নেওয়া হয়। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের জন্য ৫ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত যে শিক্ষার কাল এতদিন নির্দিষ্ট ছিল, তা ১৯৪৪ সালের শিক্ষা আইনে বাড়িয়ে ৫ থেকে ১৬ বছর করা হয় এবং তা যথাসময়ে কার্যকরী হয়। ১৯৫০ সালে অধিকতর শিক্ষার পর্যায়ে ১৮ বৎসর পর্যন্ত আংশিক অথচ অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অনেক স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ Grammar-Technical বিদ্যালয়, Grammar-Modern বিদ্যালয় এবং

Technical-Modern বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। ম্যাকনেয়ারের সভাপতিত্বে শিক্ষক সংগ্রহ ও শিক্ষণের জন্য ১৯৪৪ সালে একটি কমিটি নিয়োগ করা হয়। যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে জরুরী শিক্ষক-শিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই জরুরী শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য ব্যয়ভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মারফত রাষ্ট্র গ্রহণ করেন। নরউডের নেতৃত্বে পাঠ্যসূচী ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কমিটি গঠিত হয়, সেই কমিটি মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যসূচীকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন; যেমন—জ্ঞানপ্রবণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী; যন্ত্রবিদ্যার পাঠ্যসূচী এবং আধুনিক ধরনের বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী। শিক্ষার্থীর প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হয়েছে ইংলণ্ডে। পরীক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য নরউড কমিটি অনুসন্ধান করে দেখেন এবং পরীক্ষার কুফল লক্ষ্য করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষার উপর জোর না দিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে School Leaving Examination-এ কয়েকটি মাত্র বিষয়ে বহিঃপরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের কথা হয়েছিল কিন্তু পরে উচ্চতর স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হয়। এইভাবে ইংলণ্ডের শিক্ষা আইন ইংলণ্ডের শিক্ষা-ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের জন্য সচেষ্ট হন।

জার্মানীঃ জার্মানী ৩৬০টি বিচ্ছিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ক্রমে উহা একটি রাজ্য হিসেবে গ'ড়ে উঠে। জার্মানী প্রধানত ছিল কৃষিপ্রধান দেশ এবং ভারতের মতো ধর্মপ্রবণ। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই ছিল জার্মানীর রূপ। এর পর জার্মাণ জাতির মধ্যে যে দার্শনিক ভাবধারা গ'ড়ে ওঠে তার মূল কথা ছিল শৃঙ্খলা, নির্দেশপালন ও কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া। জার্মান জাতি ক্রমশ ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাব দানা বেঁধে ওঠে। জার্মান জাতি গ্যেটে, শিলার প্রভৃতির প্রভাবে যে সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, বিসমার্কের "blood and iron" নীতির প্রভাবে তা অন্যরূপ ধারণ করে। তারা জাতীয় আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য শেষ পর্যন্ত দুইটি বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হ'য়ে পড়ে। অথচ জার্মান জাতির শিক্ষার প্রতি এত আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল যে, তারাই সর্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছিল। চার্চের নিয়ন্ত্রণে প্রাশিয়ায় প্রথম জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠেছিল। জার্মানীর রাজারা এই শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য দায়ী ছিলেন। প্রথম উইলিয়মের চেষ্টায় গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য বিদ্যালয় গ'ড়ে ওঠে এবং এর পরে

১৭১৭ সালে বিদ্যালয় আইন (School Law) পাশ হয়—যার ফলে বাধ্যতামূলক উপস্থিতির ব্যবস্থা হয় এবং তা পালন না করলে জরিমানা হবে নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৭৪০-৮৬ সালে ফ্রেডারিক দি গ্রেট School Code চালু করেন—যার ফলে পরবর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয় বা Folk School-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোডের নির্দেশে ৫—১৩/১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হয়। এই নির্দেশ অমান্য করলে জরিমানা হবে নির্দেশ দেওয়া হয়। তা'ছাড়া যাজকদের হাতে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৭৮৭ সালে বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় বোর্ড স্থাপিত হয়। এর ফলে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়কে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্রীয় অনুমোদন ব্যতীত কোনো বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাবে না বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে চার্চের প্রভাব খর্ব হয়ে যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মান জাতির শিক্ষানীতি সহসা পরিবর্তিত হয়ে যায়। নেপোলিয়নের আক্রমণে জার্মান জাতি পরাভূত হয় ১৮০৬ সালে। এই সংকটকালে জার্মান জাতির নৈতিক বল পুনরুদ্ধারের জন্য ফিক্টে শিক্ষা-ব্যবস্থা সংস্কারের কথা বলেন। হামবোল্ড শিক্ষাক্ষেত্রে কেন্দ্রীকরণ নীতি গ্রহণ করলেন। তিনি মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় বিষয়-তালিকায় স্থান দেন। পেস্টালজীর প্রভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উদারনৈতিক নীতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ১৮৪৮ সালে এই নীতি পরিবর্তিত হয়ে নির্ধারিত হয় যে, শিক্ষা হবে উদ্দেশ্য পূরণের উপায় এবং সেজন্য শিক্ষার মাধ্যমেই সারা দেশকে জাগ্রত ক'রে তুলতে হবে। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষার নীতি পরিবর্তিত হয় এবং পাঠ্যসূচী অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। জার্মানীকে সুদৃঢ় সামরিক জাতিতে পরিণত করার জন্য ভাবধারা গ্রহণ করা হয়। ১৮৭১ সালের সন্ধি ফ্রান্সের পক্ষে অপমানজনক ছিল বটে, কিন্তু জার্মানীর পক্ষে তা' মঙ্গলের হয়। রাজ্যগুলি তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায়, ফলে শিক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে রাষ্ট্রীয় আয়ত্তের চেয়ে রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধের পর জার্মানী ক্রমশ শিল্পপ্রধান হয়ে ওঠে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সমপর্যায়ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়ে। তার ফলে জার্মানীতে দেখা দেয় চরম জাতীয়তাবাদ। এর পথে চার্চের যে বাধা ছিল তা অপসারিত হ'য়ে যায় এবং রাষ্ট্রই প্রভু হ'য়ে পড়ে এবং শিক্ষায় কেন্দ্রীকরণ নীতির প্রাধান্য দেখা দেয়। জার্মানী যেহেতু ফেডারেল রাষ্ট্র

ছিল—তাই ২৬টি রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষানীতি চালু হয়। প্রাশিয়ায় প্রধানত তিন শ্রেণীর মানুষ বাস করতো—রাজা ও ধনী, মধ্যবিত্ত এবং সাধারণ। রাজা ও ধনীদের জন্য মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং সাধারণের জন্য গণশিক্ষা বা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বিদ্যালয় নিম্নলিখিত ভাবে গ'ড়ে ওঠে :

(১) ভক্-স্কুলে (Volk schule) ৬—১৪ বৎসর

(২) মিটল্—স্কুলে (Mittle schule) ১০—১৬

(৩) মাধ্যমিক—(Hoch schule) ৬—৯ বৎসর প্রাথমিক ও ৯—১৮ পর্যন্ত মাধ্যমিক—যে পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য পেশাদারী প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করা যায়।

জার্মান জাতি সর্বপ্রথম অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ করে। এর ফলে ১৯১৩ সালের দিকে মাত্র ১০০০ : ২ জন পুরুষ এবং ১০০০ : ৪ জন নারী অশিক্ষিত ছিল। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য এতই সুনির্দিষ্ট ছিল যে, এ বিষয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের স্থান বিন্দুমাত্র ছিল না। এবং তার ফলে জনগণকে রাষ্ট্রের অনুগত ও আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলা সম্ভব হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুসরণের ব্যবস্থা হয়—পাঠ্য বিষয়ের সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে সীমাবদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত সুনিয়মিত ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। ধর্ম, মাতৃভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, সঙ্গীত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। শিক্ষকদের সকলকেই শিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকের কাজ ছিল দ্বিবিধ (১) শিক্ষক হিসাবে এবং (২) সরকারী কর্মচারী হিসাবে। মিটল স্কুলে বিদ্যালয় হোলো প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্প্রসারিত রূপ। এই বিদ্যালয়গুলি আমাদের দেশের উচ্চ বুনিয়াদী পর্যায়ের বিদ্যালয়ের মতন। এর উদ্দেশ্য মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষার্থীদের নিম্নধরনের পেশার উপযোগী ক'রে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। শিক্ষা সম্প্রসারণের ফলে জার্মানীতে নিম্ন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে চাহিদা দেখা দিয়েছিল তা পূরণ করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এই জাতীয় বিদ্যালয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে খুব জনপ্রিয় হ'তে পারে নি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে এই জাতীয় বিদ্যালয়ের সম্পর্ক কিছু নেই, তবে এই জাতীয় বিদ্যালয়ের চাহিদা বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানীতে পুনরায় দেখা দিয়েছে এবং এগুলি থেকে পরবর্তী বৃত্তিকেন্দ্রিক বিদ্যালয়ে যোগদানের ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলের মতো জার্মানীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি খুবই সংগঠিত; তবে তফাত এই যে, জার্মানীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলের মতো আবাসিক নয়, এগুলি ডে স্কুল। জার্মানীতে তিন ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় দেখা যায়:

(১) জিমনেসিয়াম (Gymnasium)

(২) রিয়েল জিমনেসিয়াম (Real-Gymnasium)

(৩) ওবার-রিয়েল-স্কুলে (Ober-real-schule)

এগুলি ছাড়াও ৬ বৎসরের মাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু আছে; যেমন—

(১) প্রো-জিমনেসিয়াম (Pro-Gymnasium)

(২) রিয়েল-প্রোজিমনেসিয়াম (Real Pro-Gymnasium)

(৩) রিয়েল-স্কুলে (Real schule)।

জিমনেসিয়াম পূর্বে ল্যাটিন বিদ্যালয় ছিল, কিন্তু তাকে জিমনেসিয়ামে পরিবর্তিত করে এমন ভাবে সংগঠিত করা হয় যে, তা জার্মান জাতির বুদ্ধিগত জীবন ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। জিমনেসিয়াম ছিল ক্লাসিকাল জিমনেসিয়াম; এখানে মুখ্যত ল্যাটিন, কিছু গ্রীক, কিছু বিদেশী ভাষা, কিছু বিজ্ঞান ও কিছু অঙ্ক পড়ানো হোতো, কিন্তু জার্মান জাতি দ্রুত শিল্প অভিমুখীন হয়ে গড়ে ওঠার জন্য এই জাতীয় বিদ্যালয় জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হতে পারেনি। ৯ বৎসর পাঠ্যক্রমের রিয়েল-স্কুলে বিদ্যালয়ে ল্যাটিন, আধুনিক ভাষা, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইত্যাদি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হোলো। ওবার-রিয়েল-স্কুলে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, অঙ্ক, আধুনিক ভাষা ও সমাজপাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া হোলো। এগুলি ৯ বৎসর পাঠক্রমের মাধ্যমিক বিদ্যালয়। প্রথমদিকে এই জাতীয় বিদ্যালয়কে স্বীকৃতি দেওয়া হোতো না। ১৮৭১ সাল থেকে এই জাতীয় বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য ৬ বৎসর ব্যাপী প্রো-জিমনেসিয়াম, রিয়েল প্রো-জিমনেসিয়াম ও রিয়েল স্কুলে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। এই ভাবে জার্মান মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে উঠে যে, যে-কোনো বৃত্তির প্রতি অনুরাগী শিক্ষার্থীর পক্ষে কোনো অসুবিধা হোতো না।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'একজাতি, এক বিদ্যালয়' আন্দোলন গড়ে ওঠে। এই আন্দোলনের নাম 'আইনহাইট স্কুলে'। ৬--১২ বৎসর পর্যন্ত একই ধরনের

শিক্ষা এবং তারপর বহুমুখী বিদ্যালয়ের কর্মসূচী গ্রহণের নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৪ বৎসর বয়সের পর শিক্ষার্থীকে সুযোগ দেওয়া হয় তিনি শিক্ষক হবেন বা কি হবেন তা নির্ণয় করে নিতে। ১৯১৮ সালে ফিসার অ্যাক্টে অধিকতর শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যালয় গঠনের নীতির কথা বলা হয়। কিন্তু জার্মানীতে অধিকতর শিক্ষার নীতি (Continuation schools) উনবিংশ শতাব্দীতে চালু হয় এবং ইংলণ্ড জার্মানীর নিকট থেকে এই নীতি গ্রহণ করে। এজন্য জার্মানীতে ১৮৬৯ সালে প্রথম আইন জারী হয়। এই জাতীয় বিদ্যালয় নিছক বৃত্তিমুখী ছিল না, এখানে সংস্কৃতিগত শিক্ষাকেও খুব উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হোতো।

জার্মানীতে ১৯১৯—১৯৩৩ সালে চলে রিপাব্লিক্যা'ন আমল। ১৯১৯ সালে জার্মানী রিপাবলিক হিসাবে ঘোষিত হয়। কিন্তু দলাদলির প্রভাবে এই সময় কোনো সুস্পষ্ট চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায় না। সেজন্য আবার শিক্ষাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভিত্তিভূমি হিসেবে গণ্য করা হয়। ওয়েমার সংবিধানে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতকগুলি নীতি ঘোষণা করা হয়। সকলের জন্য সমান অধিকারের গণতান্ত্রিক নীতি প্রাধান্য লাভ করে। জনগণের নাগরিক অধিকার, ব্যক্তিগত যোগ্যতা এবং নৈতিক মনোবল গ'ড়ে তোলার জন্য চেষ্টা হয়। শিক্ষাব্যবস্থাকে সংগঠিত করা হয় নিম্নলিখিত ভাবে :

(১) ভক-স্কুলে—প্রাথমিক স্তর ৬—১৪ বৎসর অবৈতনিক

(২) ভর স্কুলে—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়

ওয়েমার সংবিধান অনুসারে ভক-স্কুলে (৬—১৪) পর্যায়কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—(১) গ্রাণ্ড স্কুলে (Grand schule) ৬—১০ বৎসর পর্যন্ত এবং (২) ভক-স্কুলে (৬—১৪) পর্যন্ত। বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ক্যাথলিক ও সোস্যালিস্টদের দাবি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা Denominational পর্যায়ের হয়। এর ফলে রিপাবলিক্যান আমলে নিম্নলিখিত ধরনের বিদ্যালয় গড়ে ওঠে :

(১) ডিনোমিনেশ্যানাল বিদ্যালয়,

(২) ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়,

(৩) আন্তঃ-ডিনোমিনেশ্যানাল বিদ্যালয়।

রিপাবলিক্যান আমলে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বস্তরের উপযোগী করে বিস্তৃত করা হয় জার্মানীতে। এর ফলে গ্রাণ্ড-স্কুলেতে এক-একটি শ্রেণী

সংযোজনা করে ১৬ বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগকে সম্প্রসারিত করে তোলা হয়। এই আমলে ৬ বৎসর এবং ৯ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা বজায় করা হয় এবং আরো দুই ধরনের বিদ্যালয় গ'ড়ে ওঠে—

(১) ডিউট্‌ছে ওবার স্কুলে (Deutscho-ober schule) এবং

(২) আফ বাং স্কুলে (Auf bon schule)।

প্রথমগুলি ৯ বৎসরের রাষ্ট্র পরিচালিত এবং আধুনিক পাঠ্যসূচী সম্বলিত বিদ্যালয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর ভিত্তি করে শেষোক্ত বিদ্যালয়গুলি গ'ড়ে ওঠে। এজাতীয় বিদ্যালয়ে রিয়েল-জিমনেসিয়াম বা ওবার রিয়েল স্কুলের মতো পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয় এবং বালক-বালিকাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের উপযুক্ত ক'বে তোলা হয়। এ-জাতীয় বিদ্যালয় ৬ বৎসরের দীর্ঘস্থায়ী হয়। অধিকতর শিক্ষার সুযোগের জন্য যে continuation বিদ্যালয় ছিল, তাকে ১৪—১৮ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত কবে তোলা হয়।

১৯৩৯ সালে রিপাবলিক্যান ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। হিটলারের নেতৃত্বে সুখশান্তি, পূর্ণ কর্মনিয়োগের প্রতিশ্রুতি এবং শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে জার্মানীতে নাৎসী সরকার গ'ড়ে ওঠে। রাষ্ট্র কর্তৃক শিক্ষা-ব্যবস্থা পূর্ণ কেন্দ্রীকরণের নীতি গৃহীত হয়। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানীর শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। ক্লাসিক্যাল জিমনেসিয়াম বা অনুরূপ ধরনের বিদ্যালয় বিলোপ ক'রে দেওয়া হয়। শিক্ষার মাধ্যম রাষ্ট্র কর্তৃক পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং শিক্ষার দিকমাত্রই রাষ্ট্রীয় ভাবধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামগ্রিক রাষ্ট্রের জন্য সামগ্রিক মানুষ গ'ড়ে তোলাই নীতি হিসাবে গৃহীত হয়। এই সময় ৯ বৎসরের ডিউটছে ওভারস্কুলেতে শতকরা ৮৩·৩ ভাগ ছাত্রছাত্রী অধ্যয়ন করে এবং ৬ বৎসরের আফ-বাং স্কুলেতে মাত্র ৫% ভাগ শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষাব্যবস্থায় হিটলারপন্থী যুবকরাই নেতা হিসাবে কাজ করে এবং ৬—১৪ ও ১৪-১৮ বৎসরের শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীখণ্ডিত হয়, এরফলে শিক্ষার ধারা ভেঙেপড়ে। পশ্চিম জার্মানীতে যে শিক্ষাসংস্কার শুরু হয় তা' গণতান্ত্রিক পর্যায়ের এবং নাৎসী-পূর্ব ধারায় শিক্ষাকে পুনর্গঠিত করা হয়। আমেরিকার শিক্ষাদর্শের প্রভাবে পশ্চিম জার্মানীতে গণতান্ত্রিক জীবনধারা গ'ড়ে উঠছে। এখন সেখানে নিম্নলিখিত ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে :

(১) ৯ বৎসরের বিয়েল জিমনেসিয়'ম

(২) ওভার রিয়েল স্কুলে

(৩) জিমনেসিয়'ম

(৪) আফ-বাং স্কুলে

(৫) তিনবৎসরের-অর্থনৈতিক উচ্চ বিদ্যালয় (১৬ বৎসর থেকে)

(৬) কৃষি উচ্চ বিদ্যালয়

(৭) গার্হস্থ্য-শিক্ষার উচ্চবিদ্যালয়

(৮) শিল্প উচ্চবিদ্যালয়।

পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিকেন্দ্রীকরণ নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

আমেরিকা ঃ

আমেরিকার জীবন ও সংস্কৃতি প্রধানত নির্ধারিত হয়েছিল তার ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক ও ফরাসীবিপ্লবের ভাবধারার প্রভাবে। আমেরিকা আবিষ্কারের পর সেখানে নূতন ক'রে যে সমাজ-জীবন গ'ড়ে ওঠে তাতে আমেরিকায় এক নূতন সংস্কৃতি জন্মলাভ করে। কলোনী স্থাপনের পরবর্তী পর্যায়ে আমেরিকার জনগণের মধ্যে কতকগুলি বিশেষত্ব দেখা দেয়, যেমন—(১) ঐক্যপূর্ণ ভাষা (২) জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার (৩) ব্যক্তি স্বাধীনতা (৪) ধর্মীয় সহিষ্ণুতা (৫) ব্যক্তিগত উদ্যম। গণতান্ত্রিক জীবনের চেতনা আমেরিকার সমাজকে এক নূতন দিগদর্শন এনে দেয়। ১৭৮৩ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসানে যখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোলো, তখন আমেরিকায় ফেডারেল ও রাজ্যসরকার এই দুই প্রকারের দ্বৈতশাসন গড়ে ওঠে। সংবিধানে শিক্ষার বিষয়ে কোনো কথার উল্লেখ ছিল না। এই সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধর্মীয় সংস্থা বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সাহায্যে পরিচালিত হোতো। সংবিধানে শিক্ষার কথা সাধারণভাবে 'কল্যাণমূলক কাজেরই' অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৭৯১ সালের সংশোধিত সংবিধানের সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার কথা বলা হয় এবং তাকে ফেডারেল সরকারের বিষয় না করে রাজ্যসরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমেরিকায় এই ভাবে শিক্ষার ব্যাপারটি রাজ্যসরকারের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনায় আসে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই ত্রুটি সংশোধন করে শিক্ষাকে ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণভুক্ত করার প্রস্তাব হয়, কিন্তু রাজ্য সরকারগুলির বিরোধিতায়

তা' ব্যর্থ হ'যে যায়। আমেরিকার শিক্ষায় এইভাবে আমরা কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ নীতির প্রভাব সম্পর্কে একটা পরিচয় পাই।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের চেয়ে আমেরিকার শিক্ষা পরিচালনায় আমরা একটা স্বতন্ত্র রূপ দেখতে পাই। ইউরোপে ও ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় আছে—যার হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে শিক্ষানীতি পরিচালনা করবার। কিন্তু আমেরিকায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সেরকম কিছু ক্ষমতা নেই। বিদ্যালয়গুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত হয়। তবে তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, আমেরিকায় ফেডারেল সরকারের শিক্ষাব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই।

১৭৮৭ সালে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে বলা হয় যে, "Religion, morality and knowledge being necessary to good government and happiness to mankind, schools and means of education shall forever be encouraged" প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাকে রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত করবার জন্য আমেরিকায় ফেডারেল সরকারই দায়ী।

১৮৬০ সাল নাগাদ গৃহযুদ্ধ হওয়ার পর এ কথা তীব্রভাবে অনুভূত হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত রাজ্য সরকারকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসা। এই সময় কৃষিপ্রধান আমেরিকা ক্রমশঃ শিল্পপ্রধান হযে ওঠে এবং সামাজিক পরিবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শিক্ষা-বিভাগ গড়ে তোলার প্রযোজনীয়তা অনুভূত হয়। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, আমেরিকার ফেডারেল সরকার রাজ্য ও স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষাকে কেন্দ্রীকরণ করবার দিকে ঝোঁক দেন, কিন্তু ফেডারেল পর্যায়ে সেই নীতি গ্রহণ করেন নি। গৃহযুদ্ধের পর কেন্দ্রীকরণ নীতির দিকে প্রবল ঝোঁক অনুভূত হ'লেও আইনগত অসুবিধার জন্য ফেডারেল সরকার এগিয়ে আসতে পারেন নি। ১৮৬২ সালে লিঙ্কন 'মরিল অ্যাক্টে' এই কথা ঘোষণা করেন যে, নূতন সামাজিক পরিবর্তনের কথা বিবেচনা ক'রে কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক রাজ্যকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ক'রবার জন্য তিন হাজার একর জমি দান করবেন। আমেরিকায় বর্তমানে ৬৯ টি Land-grant College রয়েছে। আমাদের দেশে কল্যাণী বিদ্যালয় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান। মরিল অ্যাক্টের প্রভাবে ফেডারেল সরকার শিক্ষার বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার জন্য নয়। মরিল অ্যাক্ট পাশ হওয়ার

পর শিক্ষাবিভাগ গ'ড়ে তোলার যে আন্দোলন হয়, তা শেষ পর্যন্ত 'অফিস অফ-এডুকেশন' তৈয়ারিতেই পর্যবসিত হয়। আমেরিকানরা এই বিভাগের স্থায়িত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারেন নি বলে ১৯৫২ সালেও এই 'অফিস অফ এডুকেশনকে' স্বাস্থ্য, কল্যাণ ও শিক্ষাদপ্তরের অধীনে একটি বিভাগ হিসেবে গড়ে তোলা হয় এবং বর্তমানে শিক্ষার দায়িত্ব একজন মন্ত্রী পর্যায়ের সেক্রেটারীর হস্তে থাকলেও শিক্ষাব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এই অফিস অফ এডুকেশনকে 'আমেরিকার শিক্ষার ব্যাপারে নেতৃত্বদানের অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষাসংক্রান্ত প্রগতির তথ্য প্রচার, শিক্ষাসংক্রান্ত গবেষণা, সম্মেলন প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রবার অধিকার দেওয়া হ'য়েছে। ১৯৪৯ সালের টফ্‌ট বিল (Taftbill) অনুসারে ফেডারেল সরকারকে শিক্ষার ব্যাপারে অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয় কিন্তু নিয়ন্ত্রণেব অধিকাব দেওয়া হয়নি।

আমেবিকার শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা চালু হলেও মোটামুটি নিম্নলিখিত ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানীতি দেখতে পাই :

(১) চল্লিশটি রাষ্ট্রে ৬ থেকে ১৬ পর্যন্ত এবং বাকীগুলিতে ৬ থেকে ১৭।১৮ পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) শতকরা ৯০ জন শিক্ষার্থী—যারা ৫—১৭ বৎসরের, তারা শিক্ষার আওতায় এসেছে। সারা পৃথিবীর কোথাও এ বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

(৩) যুবশিক্ষার্থীরা সংখ্যায় যতপরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা গ্রহণ করেছে এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।

আমেরিকায় রাজ্যসরকারই শিক্ষার জন্য মুখ্যত দায়ী। এই রাজ্যসরকার যে ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গ'ড়ে তুলেছেন, তাতে কোনো বৈষম্য নেই এবং সর্বত্র শিক্ষার্থীর চাহিদার প্রতি নজর দেওয়া হয়। ভারতবর্ষেও অনুরূপ ভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। রাজ্যসরকারগুলি বাধ্যতামূলক উপস্থিতি আইন এবং স্থানীয় সংস্থায় আর্থিক সাহায্য থেকে আরম্ভ করে পাঠ্যসূচী নির্ণয় পর্যন্ত সকলকিছু ব্যাপারে নীতি নির্ধারণ করেন। ভারতের মত বিশ্ববিদ্যালয়—শিক্ষকদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন। এই সব দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে শিক্ষাদপ্তর আছে, তবে এদের গঠনপ্রণালী সকল রাজ্যে সমান নয়। প্রাথমিক শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, অন্ধ-মূক-বধিরদের শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতির জন্য রাজ্য সরকারগুলির নিজস্ব বোর্ড

রয়েছে। ভারতেও অনুরূপ ভাবে বিভিন্ন শিক্ষার জন্য বোর্ড গঠনের পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছে। স্থানীয় ভাবে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হ'য়েছে জেলা, শহর, শহরাঞ্চল ও গ্রামের ইউনিটগুলির উপর। স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষ শিক্ষাকর ধার্য করেন, পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করেন, শিক্ষা-পরিকল্পনা মঞ্জুর করেন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখেন। আমেরিকার শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হোলো এই-যে, জনগণের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা রেখে চলা হয় শিক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে। এমনটি ইউরোপে বা অন্য কোথাও আর দেখা যায় না। পৃথিবীতে আমেরিকা হোলো শিক্ষার পরীক্ষাগার রূপে অভিহিত। ইউরোপে নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সাহায্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কিন্তু আমেরিকায় ফেডারেল কর্তৃত্ব কেবল নেতৃত্ব দেয়, আর্থিক সাহায্যের সঙ্গে নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক সেখানে নেই।

আমেরিকার শিক্ষাতন্ত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রভাব নিয়েছে বটে, কিন্তু তা গ'ড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র ধারায়। জার্মানী থেকে নার্সারী ও প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা (৬—১৪ বৎসর), গ্রাজুয়েট স্কুল এবং ইংলণ্ড থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিকল্পনা (ল্যাটিন গ্রামার স্কুল) কলেজীয় পরিকল্পনা, এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু আমেরিকায় Ladder System-এর মাধ্যমে ঐক্যমুখী (Unitary) পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে:

(১) নার্সারী পর্যায়

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয় (৬—,৭—,৮—)

(৩) মাধ্যমিক

(৪) কলেজ

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়

এই ধরনের স্বচ্ছ পরিকল্পনা রাশিয়া এবং ভারতবর্ষেও চালু রয়েছে। আমেরিকার Common school movement যা উনবিংশ শতাব্দীতে দেখা দিয়েছিল, তা' বিংশ শতাব্দীতে সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে। আমেরিকার অধিকাংশ রাজ্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষার কাল নির্দিষ্ট হয়েছিল ৭-১৭, ৬-১৭ পর্যন্ত। বর্তমানে এই কাল নির্দিষ্ট হয়েছে ৬-১৮ পর্যন্ত। আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অতি সুন্দর এবং সেখানে ধর্মনিরপেক্ষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে সব বিদ্যালয়ে তার উপস্থিতির হার শতকরা ৯০ জন।

ডিনোমিনেশ্যাল বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক নয় এবং এজাতীয় বিদ্যালয়ে শতকরা ১০ ভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়। আমেরিকার শিক্ষাপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হোলো এর উদ্দেশ্য সমাজবোধ ও অভ্যাসকে জাগরিত ক'রে তোলা, নিছক জ্ঞানদান করা এ-শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষ্য নয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষানীতি সুস্থির নয়। যাঁরা পুরাতনপন্থী, তাঁরা জ্ঞানের বিষয়বস্তুর উপর জোর দিতে চান। প্রগতিশীল পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিশুর চাহিদা ও দক্ষতার উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। বিদ্যালয়গুলি সমাজ-কেন্দ্রিক ধরনের, শ্রেণীশেষে বা শ্রেণীতে শ্রেণীতে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। এক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে অগ্রসর হয়। উন্নতিসূচক পরীক্ষার সাহায্যে যোগ্যতার পরিমাপ করা হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে Cumulative Record Cards চালু আছে এবং যে সমস্ত শিক্ষার্থী অনগ্রসর তাদের জন্য বিশেষ সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। বর্তমানে আমেরিকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিরাচরিত বিষয়গুলি সঙ্গে আধুনিক বিষয় সংযোজন করে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

১৬২৫ সালের দিকে আমেরিকায় ল্যাটিন গ্রামার বিদ্যালয়ের প্রবর্তন হয়েছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে যুব আন্দোলনের প্রভাবে এই ল্যাটিন গ্রামার বিদ্যালয়ে বাস্তব উপযোগতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবার আন্দোলন হয়। বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নেতৃত্বে প্রাচীন ভাষাকেন্দ্রিক বিদ্যালয় বিলুপ্তির যে আন্দোলন হয়, তা শেষ পর্যন্ত স্তিমিত হয়ে নির্ধারিত হয় যে, পাঠ্যসূচী ক্লাসিক, ক্লাসিক-বিহীন এবং আধুনিক বিষয়াবলী নিয়ে গ'ড়ে উঠবে। ফলে পাঠ্যসূচী স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কলেজীয় শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে গ'ড়ে ওঠে। আমেরিকায় এক ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল কিন্তু পরে শিল্পের ক্রমোন্নতির প্রভাবে কতকগুলি বিশেষ ধরনের হাইস্কুল গ'ড়ে ওঠে; যেমন—Vocational High school, Commercial High school, Trade High school, Agricultural High school প্রভৃতি। একই বিদ্যালয়ে বিশেষ ধরনের শিক্ষা প্রবর্তনের দাবিও দেখা যায়। এর ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয় একই ধরনের Comprehensive বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ইউরোপে কলাবিদ্যা ও অন্যান্য ব্যবহারিক বিদ্যার জন্য নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ে যে পার্থক্য আছে,

আমেরিকায় তা' নেই। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি আমেরিকায় গ'ড়ে উঠেছে প্রাথমিকোত্তর শিলাস্তর হিসেবে এবং এগুলি আবাসিক নয়। এই বিদ্যালয়গুলি অবৈতনিক এবং সকলের জন্যই অবারিত। বর্তমানে ১১-১৭ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষায়তনে ৭৫% ভাগ শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে—যা পৃথিবীতে অপূর্ব ব্যাপার। আমেরিকায় বর্তমানে 'সকলের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষার' দাবি কার্যকরী হচ্ছে। এক-একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীর সংখ্যা ৩০০ পর্যন্ত। বিষয়-নির্বাচনের জন্য অফুরন্ত স্বাধীনতা ও সুযোগ দেওয়া হয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। ৮ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৪ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা আমেরিকায় চালু হয়েছে। ৪ বৎসরের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যাপ্ত নয় ব'লে আমেরিকায় যে আন্দোলন দেখা যায়, তার পরিণতিতে ৩ বৎসরের জুনিয়র হাইস্কুল এবং ৩ বৎসরের সিনিয়র হাইস্কুল প্রবর্তিত হয়। তবে ভারতের মতো নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য, সামাজিক অভ্যাস, পরিশ্রম, অনুবর্তিতা, বৃত্তিগত ঝোঁক প্রভৃতির উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই ৬-৩-৩ ফরমুলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য গড়ে তোলা হয়েছে।

Questions :

1 Discuss the educational systems in different foreign countries at the Primary and Secondary levels.

2. Discuss in the light of educational systems of England, Germany and America the merits and demerits of Indian educational system at the Primary and Secondary stages.

References

1 কে. ডি ঘোষ—আমাদের শিক্ষা।

2 হরিসাধন গোস্বামী—মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন।

3 Hans—Comparative Education.

4. Kandel—Comparative Education.